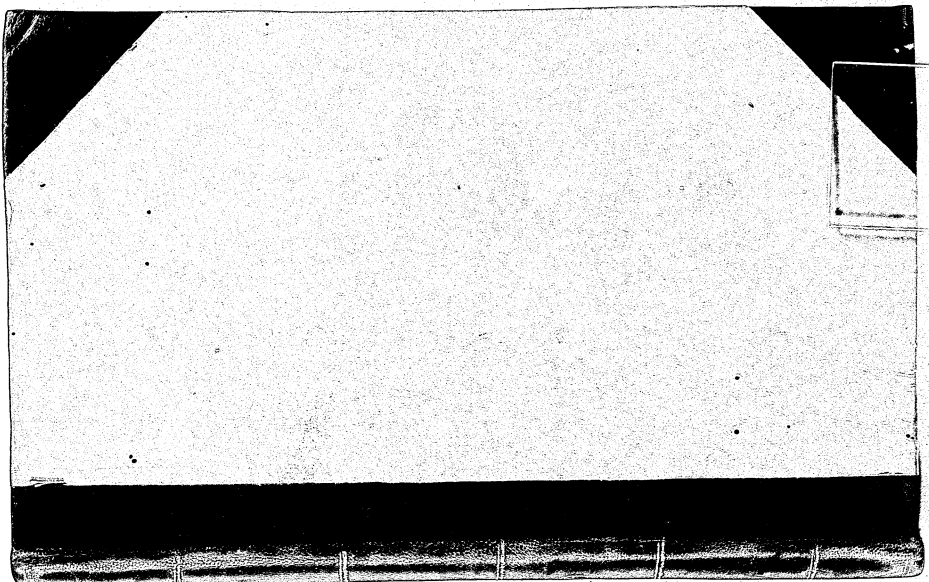

কবিতা

যুগ্মসংখ্যা আশ্বিন-পৌষ ১৩৬৭

সুধীন্দ্রনাথ দত্ত -স্মৃতিসংখ্যা

সুধীন্দ্রনাথের আত্মজীবনী, অপ্রকাশিত
কবিতা, পত্রগুচ্ছ

দুই টাকা

TOWARDS ACHIEVEMENT

In three brief years a wilderness of swamp and paddy fields has been transformed into the giant steelworks at Durgapur. This remarkable achievement has been made possible by ISCON—a consortium of thirteen leading British firms who are responsible together for the construction of the steelworks. When completed, the steelworks will have capacity for one million ingot tons of steel and a wide range of end products for the industrial markets of India.

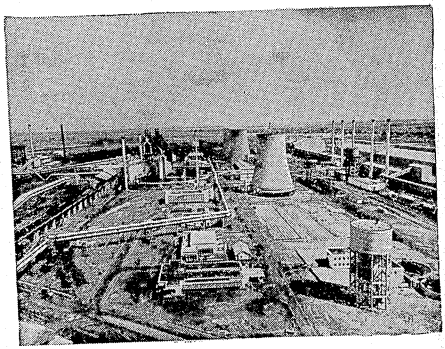

ISCON

INDIAN STEELWORKS CONSTRUCTION CO. LTD.

Davy and United Engineering Company Limited.
Head Wrightson & Company Ltd. Simon-Carves Ltd.
The Wellman Smith Owen Eng. Corp. Ltd.
The Cementation Company Ltd.
British Thomson-Houston Co. Ltd. The English Electric Co. Ltd. The General Electric Co. Limited.
Metropolitan-Vickers Electrical Export Co. Ltd.
Sir William Arrol & Company Ltd.
Cleveland Bridge & Engineering Co. Ltd.
Dorman Long (Bridge & Engineering) Ltd.
Joseph Parks & Son Ltd. Iscon Cable Group
(Siemens Edison Swan Ltd.
and Pirelli General Cable Works Ltd.)

BRITISH COMPANIES WORKING FOR INDIA

নাভানা'র বই

প্রকাশিত হ'লো

শার্ল বোদলেয়ার : তাঁর কবিতা

(Les Fleurs du Mal)

অনুবাদ, ভূমিকা, টীকা, কালপঞ্জি ও জীবনীপঞ্জি :

বুদ্ধদেব বসু

ফরাসী সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কবি কে— এর উত্তরে বোধ হয় এইটুকু বললেই যথেষ্ট যে, এক ইংরেজি ভাষাতেই বোদলেয়ার-এর কোনো-কোনো কবিতার শতাধিক অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে। এবং পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হ'য়ে যে-সই কয়েক লক্ষ বিক্রয় হয়েছে সেই 'ফ্লার দ্যু মাল' কাব্যগ্রন্থই বোদলেয়ার-এর অম্লান কীর্তি। এই অমর গ্রন্থের ছন্দোবদ্ধ অনুবাদ বাংলার হৃদীসমাজকে উপহার দিতে পেরে আমরা গর্ব অনুভব করছি। অনুবাদগুলি বাংলা কবিতা হিসাবে এতদূর উৎকৃষ্ট, এবং ভূমিকা ও অন্যান্য গদ্য আলোচনায় ফরাসী কবির প্রতিভা, দেশ, কাল ও ব্যক্তিত্ব এমনভাবে সৃষ্ট করা হয়েছে যে এ-কথা নিঃসংশয়ে বলা যায়, এই গ্রন্থ প্রণয়ন ক'রে বুদ্ধদেব বসু এক নতুন কীর্তি স্থাপন করলেন। বোদলেয়ার ও তাঁর দুই প্রণয়িনীর কয়েকখানি প্রতিকৃতিও এই গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট হয়েছে।

দাম : আট টাকা

. . . . . .

শীঘ্রই প্রকাশিত হচ্ছে

সুধীন্দ্রনাথ দত্তের কাব্য-সংগ্রহ

অমিয় চক্রবর্তীর নতুন কাব্যগ্রন্থ

ঘরে-ফেরার দিন

. . . . . .

'নাভানা'র কয়েকখানি বিশিষ্ট গ্রন্থ

জীবনানন্দ দাশের শ্রেষ্ঠ কবিতা	...	৫·০০
বুদ্ধদেব বসুর শ্রেষ্ঠ কবিতা	...	৫·০০
শীতের প্রার্থনা : বসন্তের উত্তর ॥ বুদ্ধদেব বসু	...	৩·০০
কঙ্কাবতী ॥ বুদ্ধদেব বসু	...	৩·০০
আধুনিক বাংলা কাব্যপরিচয় ॥ দীপ্তি ত্রিপাঠী	...	৭·৫০

নাভানা

৪৭ গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ, কলকাতা ১৩

Invitation to Poetry

KAVITA 100

international English-language number

A collection of contemporary poems, in English translation, from many Indian and Western languages: Ten languages and seven nations represented.

Poems and translations by

Rabindranath Tagore, Jibanananda Das, Sudhindranath Datta, Amiya Chakravarty, Premendra Mitra, Humayun Kabir, Buddhadeva Bose, Bishnu Dey, Samar Sen, Gopal Bhaumik, Naresh Guha, Umashankar Joshi, G. Sankara Kurup, Maithili Sharan Gupta, Mahadevi Varma, Sochi Raut Roy, Hans Egon Holthusen, Ingeborg Bachmann, Werner Rehfeld, D. J. Enright, Galway Kinnell, Dorothy Norman, Pierre Reverdy, Paul Gilson, Francesco Arcangeli, Rajeshwari Datta, Jyotirmoy Datta, Nikolaus Klein, Lila Ray, Sujit Mukherjee, and many others.

A Note on Modern Bengali Poetry
Jyotirmoy Datta

Available :
KAVITABHAVAN
202 RASHBEHARI AVENUE
CALCUTTA 29

Rs 2/-, 3 sh. 6d. or 75 cts.

কবিতা

সুধীন্দ্রনাথ দত্ত -স্মৃতিসংখ্যা

বর্ষ ২৫, সংখ্যা ১-২, ক্রমিক সংখ্যা ১০৩

যুগ্মসংখ্যা আশ্বিন-পৌষ ১৩৬৭

—

সুধীন্দ্রনাথ দত্তের

আত্মজীবনীর খসড়া, দুটি অপ্রকাশিত কবিতা,
পত্রগুচ্ছ ও শেষ অসমাপ্ত অনুবাদ

—

প্রবন্ধ

জ্যোতির্ময় দত্ত, প্রবীরচন্দ্র বসু মল্লিক, দিব্যেন্দু পালিত,
শিবনারায়ণ রায়, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, অলোকরঞ্জন
দাশগুপ্ত, অমিয় দেব, বুদ্ধদেব বসু

—

জীবনীপঞ্জি

গ্রন্থপঞ্জি (মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় -সংকলিত)

—

সুধীন্দ্রনাথের প্রতিকৃতি, স্বাক্ষর ও পাণ্ডুলিপির প্রতিচিত্র

এই সংখ্যার সম্পাদনায় ও প্রকাশনে আমাদের সাহায্য করেছেন সুধীন্দ্রনাথের অনুজ শ্রী হরীন্দ্রনাথ ও শ্রী শৌরীন্দ্রনাথ দত্ত, ডক্টর হের্নের রেহ্‌ফেল্ড, নাভানা প্রিন্টিং ওআর্কস প্রাইভেট লিমিটেড-এর প্রকাশনী বিভাগ ও শ্রীগোপাল ভৌমিক। এঁদের কাছে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করি। —সম্পাদক

কবিতা

বর্ষ ২১
বর্ষ ২২
বর্ষ ২৩
ও বর্ষ ২৪-এর
সম্পূর্ণ সেট
পাওয়া যাচ্ছে।
বহু মূল্যবান কবিতা
অনুবাদ-কবিতা
ও
প্রবন্ধের সঞ্চয়ন।
প্রতি সংখ্যা ১।০*
প্রতি সেট পাঁচ টাকা
মাশুল স্বতন্ত্র

* 'কবিতা'র শতভম (ইংরেজি) সংখ্যাটির
নগদ মূল্য দু-টাকা

কবিতা

ত্রৈমাসিক পত্র

আশ্বিন, পৌষ, চৈত্র ও আষাঢ়ে প্রকাশিত। * আশ্বিনে বর্ষারম্ভ, বৎসরের প্রথম সংখ্যা থেকে গ্রাহক হ'তে হয়। প্রতিসাধারণসংখ্যা এক টাকা, বার্ষিক চার টাকা, রেজিস্টার্ড ডাকে ছয় টাকা, ভি. পি. স্বতন্ত্র। * ষাণ্মাসিক গ্রাহক করা হয় না। * চিঠিপত্রে গ্রাহক-নম্বরের উল্লেখ আবশ্যিক। * ঠিকানা-পরিবর্তনের খবর দয়া ক'রে সঙ্গে-সঙ্গে জানাবেন, নয়তো অপ্রাপ্ত সংখ্যা পুনরায় পাঠাতে আমরা বাধ্য থাকবো না। অল্প সময়ের জন্য হ'লে স্থানীয় ডাকঘরে ব্যবস্থা করাই বাঞ্ছনীয়। * অমনোনীত রচনা ফেরৎ পেতে হ'লে যথাযোগ্য স্ট্যাম্পসমেত ঠিকানা-লেখা খাম পাঠাতে হয়। প্রেরিত রচনার প্রতিলিপি নিজের কাছে সর্বদা রাখবেন, পাণ্ডুলিপি ডাকে কিংবা দৈবাৎ হারিয়ে গেলে আমরা দায়ী থাকবো না। * সমস্ত চিঠিপত্রাদি পাঠাবার ঠিকানা :

কবিতাভবন
২০২ রাসবিহারী এভিনিউ
কলকাতা ২৯

রবীন্দ্র শতবর্ষপূর্তি গ্রন্থমালা

শতবর্ষ পূর্তি-উপলক্ষে প্রচারিত সুলভ সংস্করণ

গীতাঞ্জলি

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শোভন সুন্দর ক্ষুদ্র আয়তনে, পরিপাটি মুদ্রণে ও অল্প মূল্যে, ১৩৬৭ পৌষে প্রকাশিত হইবে। প্রথম প্রকাশের দিন হইতেই ভক্ত ভাবুক ও রসিক মাত্রের চিরপ্রিয়, এই কাব্যগ্রন্থ বর্তমানে আরও বহুলভাবে প্রচারিত হইয়া সকলকে আনন্দ ও প্রেরণা দিবে আশা করা যায়।

মূল্য ০·৭৫ নয়া পয়সা

রবীন্দ্র শত-পূর্তি বৎসরে
একখানি নূতন সংকলনগ্রন্থে

রবীন্দ্রনাথের প্রায় সকল প্রকার রচনার বিচিত্র নিদর্শন একত্র করিয়া, আগামী উৎসবকে সার্থক সুন্দর ও সম্পূর্ণ করিয়া তুলিতে রবীন্দ্র-প্রতিষ্ঠান বিশ্বভারতীর প্রযত্ন রহিয়াছে। রবীন্দ্র-সাহিত্যের বিপুলতার বিষয় স্মরণ-পূর্বক এই সংকলনগ্রন্থের ত্রুশতা অস্বীকার করা না গেলেও, যাহাতে ইহার সাহায্যে সামগ্রিক রবীন্দ্র-প্রতিভার একটি পরিস্ফুট রেখাচিত্র ফুটিয়া উঠে সে বিষয়ে বিশেষ যত্ন থাকিবে। যথাকালে অন্যান্য বিষয় বিজ্ঞাপিত হইবে।

বিশ্বভারতী
৬/৩ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন। কলিকাতা ৭

সুন্দর কেশগুচ্ছ

বেঙ্গল কেমিক্যালের

কান্থারাইডিন

হেয়ার অয়েল

কেশমূল সতেজ রাখে ও কেশের শ্রীবৃদ্ধি করে

বেঙ্গল কেমিক্যাল

কলিকাতা · বোম্বাই · কানপুর

স্নানে আনন্দ

বেঙ্গল কেমিক্যালের

স্বচ্ছ

গ্লিসারিন সাবান

ইহার মোলায়েম শুভ্র ফেনা আপনার গাত্রত্বককে মসৃণ করিবে

বেঙ্গল কেমিক্যাল

কলিকাতা · বোম্বাই · কানপুর

With the compliments

of

THE IMPERIAL TOBACCO COMPANY
OF INDIA LIMITED

DO YOU PLAN TO GO FOR FURTHER STUDIES IN FRANCE ?
WOULD YOU LIKE TO BECOME A GRADUATE
FROM THE SORBONNE ?

THE ALLIANCE FRANCAISE

offers you an opportunity to learn or brush up your French and organises lectures and courses leading to the

(a) Language Diploma of the Alliance Francaise, Paris
(b) Diploma of Literary Studies of the Alliance Francaise, Paris
(c) Diploma of French Civilisation of the Sorbonne
(d) Diploma of French Studies, Grades I, II, III of the University of Paris.

Please call for full details at our office and avail of our lending library, magazines, films, records, weekly lectures, etc., in our air-conditioned premises.

24, Park Mansions, Park Street, Calcutta-16. Tel : 23-2958

পরশুরাম রচিত
পরশুরামের কবিতা
পরশুরাম বিরচিত বিচিত্র রসের ছোটো-বড়ো অনেকগুলি কবিতার মনোজ্ঞ সংগ্রহ।
দাম—২·০০

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের
বীরেশ্বর বিবেকানন্দ
(প্রথম খণ্ড)
দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হ'ল। দাম—৫·০০

প্রাণতোষ ঘটকের নতুন উপন্যাস
রাজায় রাজায়
রচনাভঙ্গির শিল্পসুষমা ও চিত্রময় পরিবেশ সৃষ্টির অনন্যতায় 'রাজায় রাজায়' বাংলা সাহিত্যে অবিস্মরণীয় উপন্যাস। দাম—৯·০০

অন্নদাশঙ্কর রায়ের নতুন বই
অপ্রমাদ
অন্নদাশঙ্করের আধুনিকতম প্রবন্ধ-সংগ্রহ। উপলব্ধির গভীরতা ও যুক্তিনিষ্ঠ নিরপেক্ষতায় বহু বিচিত্র প্রসঙ্গের মূল্যবান আলোচনা। 'অপ্রমাদ' বিদগ্ধ লেখকের অনবদ্য রচনাশৈলীর উৎকৃষ্ট নিদর্শন।
দাম—৩·০০

বুদ্ধদেব বসুর নতুন বই
একটি জীবন ও কয়েকটি মৃত্যু
দাম—৩·০০

বিজ্ঞান বিচিত্রা
বিজ্ঞানে অনুরাগী ছাত্র-ছাত্রীদের অবশ্য পঠনীয়। দুই শতাধিক চিত্র সম্বলিত।
দাম—২·০০

এম. সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড
১৪ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

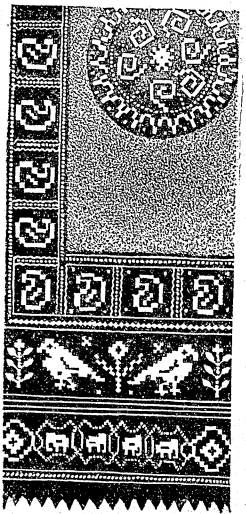

MEDIUM/28/60

অতীত ঐতিহ্যের বাহক

প্রাচীন ভারতের সমৃদ্ধিময় যুগে চারুশিল্পে পরিণত বস্ত্রশিল্প পরবর্তী বিদেশী শাসনে যখন হতগৌরব, তখন স্বাধীনতার দুর্নিবার প্রেরণাই তাকে সেই অতীত-ঐতিহ্যের পুনরুজ্জীবনে আবার অনুপ্রাণিত করে। আত্মনির্ভর স্বদেশে আধুনিকতম বস্ত্র-শিল্প আজ সেই ঐতিহ্যেরই বাহক এবং ব্যাপক যোগাযোগ ব্যবস্থায় অনন্য।

পূ র্ বে র ল ও য়ে

কবিতা সুধীন্দ্রনাথ দত্ত -স্মৃতিসংখ্যা
যুগ্মসংখ্যা আশ্বিন-পৌষ ১৩৬৭ বর্ষ ২৫ সংখ্যা ১-২ ক্রমিক সংখ্যা ১০৩

আত্মজীবনীর খসড়া

সুধীন্দ্রনাথ দত্ত

[১৯৫৭-৫৮ সালে শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবাসকালে সুধীন্দ্রনাথ মার্কিন অধ্যাপক এডওআর্ড শিল্‌স্‌-এর প্ররোচনায় ইংরেজিতে একটি আত্মজীবনী রচনা আরম্ভ করেন। সেই অসমাপ্ত রচনার চতুর্থ, দশম ও একাদশ পরিচ্ছেদ আমরা বাংলা অনুবাদে প্রকাশ করছি।— সম্পাদক।]

৪

ইংরেজি ভাষায় তাঁর [আমার পিতার] দক্ষতা ছিল সে-কালের পক্ষেও অসামান্য, যে-কালে শিক্ষিত ভারতীয় মাত্রই সেই ভাষায় স্বপ্নদর্শনের উচ্চাশা পোষণ করতেন ; এবং যদিও তাঁর সমবয়সীদের মধ্যে কেউ কেউ তাঁর মতোই নিপুণভাবে ইংরেজি বলতে ও লিখতে পারতেন, তবু ইংরেজি সাহিত্যজ্ঞানে তাঁর সমকক্ষ ছিলেন শুধু শ্রেষ্ঠ অধ্যাপকেরা। পক্ষান্তরে তাঁর সাহিত্যবোধ প্রায় তদেকাত্মতায় পৌঁছেছিল। তা ছাড়া, ইংরেজিই একমাত্র ভাষা ছিল না তাঁর অধিকারে, সংস্কৃতকেও তিনি আয়ত্তে এনেছিলেন, এবং তাঁর বিশ্ববিদ্যালয় উত্তরণের স্বল্পকাল পরে প্রকাশিত কালিদাস ও শেকস্‌পীয়র সম্পর্কিত দীর্ঘ প্রবন্ধটিকে বাংলা ভাষায় তুলনামূলক সমালোচনার প্রথম প্রচেষ্টা বলা যেতে পারে। অবশ্য আর কখনো তিনি অমিশ্র সাহিত্য বিষয়ে অনুরাগ বোধ করেননি ; এবং তাঁর যৌবনে গোপনে লিখিত অপ্রকাশিত কবিতাবলী বার্ধক্যে নির্বিচারে প্রকাশিত মেঘদূতের পদ্যানুবাদ অপেক্ষা কোনো অংশেই উৎকৃষ্ট ছিল না। কিন্তু তাঁর কাছে শেকস্‌পীয়র-পাঠ আমার কৈশোরের এক অবিস্মরণীয় অভিজ্ঞতা, এবং তাঁর ব্যাখ্যা শুনে 'দি এন্‌শেণ্ট ম্যারিনার'কে বারো বছর বয়সে কাব্যের যথার্থ নির্যাস ব'লে মনে হয়েছিল আমার। স্বভাবতই, উত্তর-ভিক্টোরীয়দের প্রতি তিনি আমার তুলনায় ছিলেন নিরুত্তাপ ; বার্নার্ড শ-র বিদ্রূপে সায় না দিয়ে বরং শ-কেই বিদ্রূপ করতেন। তবু আজ থেকে অনেক বছর আগেই তিনি আমাকে জপিয়েছিলেন যে ইবসেনের আসন

প্রকৃত বিদ্রোহীদের মধ্যে নয়; 'দি গোস্ট্‌স্' অথবা 'দি ওয়াইল্ড ডাক্'কে তিনি ধ্রুপদী নাটক ব'লে গণ্য করতেন, কারণ তাদের কাহিনী এমন এক ট্র্যাজেডি থেকে উদ্ভূত যা নিয়তির পুতুলখেলায় যবনিকা ওঠার অনেক আগেই সংঘটিত হয়েছে।

তাঁর নিজের অধিকতর অনুরাগ ছিল রোমান্টিক নাটকে, যেখানে মানুষ আপন ভাগ্যের কর্তা; এবং যেহেতু তিনি মনস্থির ক'রে ফেলেছিলেন যে হিন্দু জীবনদর্শনই সর্বোত্তম, তাই এমনকি ব্যক্তিগত ট্র্যাজেডিতে, যা স্পষ্টতই অনুত্তম বিচারবোধ-প্রসূত, বৈশ্বিক তাৎপর্য আরোপ করাকে তিনি হয়তো দেবনিন্দাতুল্য ব'লেই মনে করতেন। কিন্তু এর সঙ্গে খৃষ্টীয় মুক্তেচ্ছাবাদকে এক ক'রে দেখলে চলবে না, কর্মফল ও আদিপাপের কোনো সমীকরণেও আমার পিতা অসম্মত ছিলেন। তিনি শৃঙ্খলহীন, এই অনুভূতির ফলে তাঁর মনে পরমাত্মার সঙ্গে একাত্মবোধ জেগেছিল; এই বিশ্বাসজনিত গর্বই তাঁকে ব্রাহ্মসমাজের প্রতি বিরূপ করে—কেননা ব্রাহ্মের একেশ্বরবাদে এর স্থান নেই—এবং স্বদেশবাসীর মনে এই গর্বই তিনি সঞ্চার করতে চেয়েছিলেন। রামমোহন রায়ের সঙ্গে তাঁর নির্ভুল ব্যবধান এইখানেই; এবং যদিও, রামমোহন যাকে পরিত্যাজ্য ভেবেছিলেন সেই বাইবেল-কথিত সুসমাচারের অলৌকিক পর্ব তাঁর সম্পূর্ণ গ্রহণযোগ্য ব'লে মনে হয়েছিল, তবু প্রতীচীর অন্তর্নিহিত ইহুদী-রোমক নীতিবিস্তার অপকর্ষ বিষয়ে তিনি এতই নিঃসংশয় ছিলেন যে ইংরেজ শাসনকে সমর্থন করতে পারেননি। তাঁর জাতীয়তাবাদী আগ্রহ, যা প্রতীকী আইন-অমান্যের বাস্তবিক উদ্ভাবক না-হ'য়েও ক্ষমাশীল প্রশ্রয়দাতা, সেই কারণেই সম্ভব হয়েছিল; এবং একই কারণে, যখন বিজাতীয় দীনতার পরিগ্রহণের ফলে, মহাত্মা গান্ধীর নিত্যকর্ম হ'য়ে উঠল গূঢ় অনুশোচনা ও বাহ্য আপস, স্বীকারোক্তির পাপক্ষালন ও উপবাসের জবরদস্তি, এবং সর্বশেষে স্বর্গরাজ্যের ছাড়পত্র হিসাবে কৌপীন ও নম্রতা ধারণের সম্প্রচার, তখন পিতৃদেব গান্ধীবাদের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হলেন।

দুর্ভাগ্যের কথা, অধিবিদ্যা ও পদার্থবিদ্যার পরম প্রভেদ সম্ভব শুধু স্কিৎসোফ্রেনিয়া রোগীর পক্ষে; এবং যেহেতু পিতৃদেব নিঃসন্দেহে জানতেন তাঁর নিজের ও স্বদেশের প্রতীচীর কাছে ঋণ কত বিপুল, তাই প্রচুর বুদ্ধির

অপব্যয় করেছিলেন এ-কথার প্রমাণকল্পে যে পাশ্চাত্ত্য চিন্তাধারার সকল প্রধান বিষয়েরই এশিয়ায় পূর্বাভাস দেখা গিয়েছিল, আর বাকি সমস্ত কিছু ধ্বংসাত্মক ও অবান্তর মাত্র। আমার ধারণা, এই অবান্তর মত প্রকাশ পেয়েছিল তাঁর থিয়সফি-চর্চায়, এবং ভারতবর্ষে শিক্ষাবিস্তার, সমাজ-সংস্কার ও রাজনৈতিক মুক্তির সপক্ষে আনি বেসান্ত ও তাঁর শিষ্যবৃন্দের সহায়তা যদি ইতিহাসে মহামূল্য অর্জন ক'রে থাকে, তা হ'লে স্মর্তব্য যে শ্রীমতী বেসান্তের ভক্ত অনুগামীদের মধ্যে আমার পিতৃদেব ছিলেন প্রধান এবং তাঁর প্রাথমিক কারণ এই যে এই প্রতীচীকন্যার মধ্যে তিনি পেয়েছিলেন স্বদেশের প্রজ্ঞায় তাঁর আপন বিশ্বাসের জীবন্ত উদাহরণ। কেননা পিতার মহত্তম আনন্দ ছিল তাঁর বিশ্বাসেচ্ছার স্পর্শযোগ্য সমর্থন আবিষ্কারে; এবং সাধারণত অসন্তোষ-জনক প্রায়োগিক পরীক্ষা অন্তত একবার প্রায় দুর্ঘটনায় পরিণত হয়েছিল। এক প্রবঞ্চক, যে নিজেকে পৌরাণিক পূর্বপুরুষদের তুল্য ব'লে দাবি করত, আগুনের উপর দিয়ে হেঁটে তার গুপ্তশক্তি প্রদর্শন করেছিল; এবং তার মোটা পারিশ্রমিক দ্বিগুণ ক'রে নিয়ে পিতৃদেবকে দিয়ে সেই খেলা পুনঃপ্রদর্শন করাতে সে যেমন রাজি হ'ল, অমনি অগ্নিশিখার পশ্চাদ্ধাবন ক'রে পিতৃদেব শয্যা নিলেন, তারপর ছ-সপ্তাহ ধ'রে গৌণ দহনক্ষতের পরিচর্যা করতে হ'ল।

বলা বাহুল্য, তাঁর অতিবিশ্বাস কিংবা সংশয়শূন্যতা সাধারণত অপেক্ষাকৃত অপ্রবল রূপ ধারণ করত; এবং তাঁর চরিত্রে ইদ্ধাতঙ্কের এতই অভাব ছিল যে এমনকি জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের পর আমাকে স্মরণ রাখতে বলেছিলেন যে ভারতবর্ষে প্রথম আইন-নির্ভর শাসনের প্রবর্তক হিসেবে ইংরেজরা ধিক্কৃত হয়েছে নিজেদেরই বিচারে, আমাদের বিচারে নয়। তত্রাচ, দুই পুরুষের ব্যবধান ছিল পিতৃদেবের সঙ্গে, ধরা যাক, মাইকেল মধুসূদন দত্তের, যিনি, তখন পর্যন্ত বাংলা দেশের শ্রেষ্ঠ কবি হ'য়েও অভৃপ্ত থেকে, কবিপ্রতিভার চূড়ান্তে এসে স্থির করলেন যে ব্যারিস্টার রূপে নূতন জীবন আরম্ভ করবেন, কেননা বিদেশী প্রভুরা তাঁর অন্তরে যে হীনম্মন্যতার জন্ম দিয়েছিল তা প্রশমনের অন্য কোনো উপায় তিনি খুঁজে পাননি; এবং তাঁর মতো ব্যক্তিও যখন ইংরেজি ভাষায় আপন কাব্য রচনার চেয়ে শ্রেয় পথের সন্ধান পেয়েছিলেন, তখন বিদেশী ভেক ধারণের প্রতি পিতৃদেবের আপসহীন

প্রত্যাখ্যান-নীতি ততটাই বোধগম্য যতটা তাঁর ধ্রুব বিশ্বাস যে মাতৃভাষার মাধ্যম ব্যতিরেকে বাঙালীরা তাদের সৃষ্টিসম্ভাবনাকে কখনো সম্পূর্ণরূপে সফল করতে পারবে না। ফলত, আমাদের প্রাচীন সাহিত্যের গুণাবলীর অভিরঞ্জনে তিনি উন্মুখ ছিলেন; এবং শুধু যে রবীন্দ্রনাথের, প্রেরণা যাঁর স্পষ্টতই পাশ্চাত্ত্য, মহত্ত্বস্বীকারে তাঁর দেরি হয়েছিল তাই নয়, নবীনচন্দ্র সেনের মতো শ্লাঘ্যকর অণুকবিদেরও তিনি এই সহজ কারণে অতিপ্রশংসা করতেন যে তাঁদের রচনা, প্রসঙ্গ ও পদ্ধতি উভয়বিচারেই দেশীয় ঐতিহ্যের অন্তর্গত।

হিন্দু দর্শন বিষয়ে লিখতে গেলে অধিকাংশ ভারতীয় যে-ফাঁদ এড়িয়ে চলতে পারেন না, তার হাত থেকেও পিতৃদেব সর্বদা নিস্তার পাননি; এবং এ-কথা তাঁকে আমি ভজাতে পারিনি যে আমাদের প্রাচীন ভাবুকদের যদি বাস্তবিকই ব্র্যাডলি-দর্শনতুল্য কোনো মতবাদের প্রস্তাবনা ব্যতীত অন্য কীর্তি না থাকে, তা হ'লে তার তাৎপর্য অনুমানের জন্যে সেকালের পণ্ডিতদের বিধান অনুসারে সংস্কৃত ব্যাকরণ অধ্যয়ন ক'রে বারো বছর অপব্যয় করা নিশ্চয়ই আক্ষেপের বিষয়। আমার এ-যুক্তি উদ্ভূত কিন্তু তাঁর যুক্তি থেকেই, যদ্দ্বারা তিনি আমাকে সতর্ক ক'রে দিয়েছিলেন যে শঙ্করের কাছে নাস্তি অস্তির প্রাথর্তী, এই মত পোষণ ক'রে নিজেকে আমি হেগেল-পন্থায় অকৃতী ব'লেই প্রমাণ করছি। সে যা-ই হোক, পিতার রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি এডমাণ্ড বার্ক ও জন স্টুয়ার্ট মিলের কাছে কতখানি ঋণী সে-বিষয়ে তাঁর চেতনা যেমন জাগ্রত ছিল তেমনি সহজ ছিল স্বীকারেচ্ছা। যদিও সংশ্লেষণ তাঁকে দুর্নিবারভাবে আকর্ষণ করত, তবু সেই সঙ্গে তিনি ছিলেন বিরাট বিশ্লেষণী প্রতিভার অধিকারী; এবং তথ্যের প্রতি তাঁর গভীর শ্রদ্ধার ফলে তিনি অস্বীকার করতে পারেননি যে পূর্ববর্তী পঞ্চাশ বছরে বিজ্ঞান ও যন্ত্রবিদ্যা ছাড়াও য়োরোপীয় সভ্যতার আরো অনেক উপকারী সূত্র ভারতীয় সংস্কৃতিতে সঞ্চারিত হ'য়ে তার আন্তর সমৃদ্ধি সাধন করেছে। এগুলোকে তিনি স্বরূপতই ভালো ব'লে জানতেন; এবং এই অনিঃশেষিত উৎস থেকে আমাদের আরো উন্নতির সম্ভাবনার পথ খোলা রাখতে তিনি এতই ব্যগ্র ছিলেন যে ১৯২১ সালে গান্ধীর বুদ্ধিবিরোধী 'পাশ্চাত্ত্য'-শিক্ষা-বিদূষণের প্রকাশ্য প্রতিবাদে রবীন্দ্রনাথকেও সঙ্গী করেছিলেন।

১০

যা-ই হোক না কেন, আমার কাকা অমরেন্দ্রর প্রতি তাঁর [আমার মাতার] ছিল এক সপ্রশ্রয় স্নেহ, যা তাঁর আপন ভাই বা সন্তানেরাও কখনো পেয়েছে ব'লে মনে হয় না; অথচ বাড়ির কর্তা ধীরেনজ্যাঠার মতে আমার পিতামহের এই তৃতীয় সন্তানই অদৃশ্য কুলচিহ্ন অনপনেয়রূপে মসীলিপ্ত করেছেন। কারণ অমরেন্দ্রকাকা তাঁর শ্রদ্ধেয় পূর্ব ইতিহাস এতটা বিস্মৃত হলেন যে তিনি পেশাদার নট সাজলেন; এবং তার চেয়েও অমার্জনীয় কথা, তাঁর অধঃপতিত জীবনকে প্রদর্শনীয়রূপে সফল ক'রে সকল নীতিনির্ভর হিসেবে বিপর্যয় ঘটালেন। অবশ্য বাড়ি থেকে তিনি বিতাড়িত হয়েছিলেন; এবং কেবল যে অতি অল্পকালেই তাঁর পৈতৃক দায়ভাগ অন্তর্হিত হ'ল তা-ই নয়, নিজের রঙ্গালয়কে কলকাতায় সর্বোত্তম ক'রে তোলবার সংকল্পে তার সজ্জা ও প্রতিপালনের জন্য অর্থব্যয়েও তিনি কোনো কার্পণ্য করেননি। তাই তাঁর উপার্জন যদিও ছিল সর্বদাই বৃহৎ, ব্যয় বাড়তে লাগল বছরে-বছরে; এবং শীঘ্রই তাঁর জনপ্রিয়তা যখন বিস্ময়কর চূড়ান্তে পৌঁছেছে, আর আয় ক্রমবর্ধিষ্ণু, তখন তাঁর কীর্তি দ্বারা এটুকুমাত্র সাধিত হয়েছিল যে পাওনাদারেরা তাঁকে জেলে পোরেনি। তত্রাচ, তাঁর দীপ্তি চিরকাল যেমন অপর্যাপ্ত ছিল, তাই রইল। এমনকি তাঁর সার্থক প্রতিযোগিতার গতিরোধ করবার মরীয়া প্রচেষ্টায় গিরিশচন্দ্র যখন আপন নাটক অভিনয়ের অনুমতি প্রত্যাহার করলেন, তখন নিজের নাটক নিজেই রচনা ক'রে অমরেন্দ্রনাথ চিরকালের মতো প্রমাণ ক'রে দিলেন যে আধুনিক বাংলা মঞ্চের সর্বজনস্বীকৃত জনক গিরিশচন্দ্র ঘোষ রঙ্গমঞ্চের একাধিপতি নন।

এই সব বিষয়ে ধীরেনজ্যাঠা তাঁর তৃতীয় ভ্রাতার অধঃপতনের আরো প্রমাণ পেলেন; এবং আমার উপস্থিতি বিস্মৃত হ'য়ে তিনি তাঁর প্রাতঃকালীন দর্শনার্থীদের মধ্যে যারা অপেক্ষাকৃত ঘনিষ্ঠ তাদের দেখিয়ে দিতেন, অমরেন্দ্রর এমনকি গিরিশ ঘোষকে ছদ্ম-সম্মানপ্রদর্শনের প্রাথমিক শোভনতাটুকু পর্যন্ত নেই; শ্বশুর হ'লেও গিরিশ ঘোষ তাঁর গুরু, যদিও গুরুর কাছ থেকে তিনি শিখেছিলেন কী ক'রে নিকৃষ্ট বারাঙ্গনাদের সঙ্গে সমান তালে চলতে হয়। তাঁর নির্মম দৃষ্টিভঙ্গির আপাতসমর্থনে জ্যাঠামশাই আরো বলতেন যে নাট্যকলাকে

ঘৃণা করা দূরের কথা, যৌবনে তিনি স্বপল্লীর শৌখিন যাত্রাদলের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন, এবং তাঁর সংগীতপ্রতিভার সহায়তাও পেয়েছিল তারা। কিন্তু সে-সব অবশ্য উক্ত আলাপের প্রায় তিরিশ বছর আগের কথা; এবং ইতিমধ্যে সমকালীন য়োরোপীয় থিয়েটারের আদর্শে নির্মিত পেশাদারী রঙ্গমঞ্চের গরদেশী আকর্ষণ দুর্বার হ'য়ে উঠেছে, তার কারণ—বিশ্বাসের ভান করতেন জ্যাঠামশাই—আগে যে-সব ভূমিকায় নামত সদ্বংশজাত ছেলেরা, এখন তাতে কুলটাদের দেখা যাচ্ছে। ফলত, স্বল্পবুদ্ধি শ্রোতাও বক্তার এই অনুচ্চারিত সিদ্ধান্তটি ধরতে পারতেন যে অমরকাকার পেশাও এক ধরনের গণিকাবৃত্তি; এবং তাঁর ধর্মভীরু আত্মীয়েরা ন্যূনতম যা করতে পারতেন তা হ'ল তাঁকে কুষ্ঠরোগী জ্ঞানে বর্জন করা, বিশেষত অনভিজ্ঞ অল্পবয়স্কদের পক্ষে তাঁর সংস্রব যে মারাত্মক সে-বিষয়ে তাঁদের মনে সন্দেহ ছিল না। দুঃখের বিষয়, আমি তখন ঐ উভয় শ্রেণীরই অন্তর্ভূত ছিলুম।

আবার, সেকালের শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রীদের সঙ্গে অমরকাকার অবাধ প্রণয় তাঁর স্বরার প্রতি আসক্তি অপেক্ষা অনেক কম কলঙ্কের কথা ছিল, যদিও প্রথমটি তাঁর স্ত্রীর প্রত্যক্ষ সম্মানহানি ঘটিয়েছিল, আর দ্বিতীয়টি যে শুধু নটদের সামান্য দোষাবলীর অন্যতম ছিল তা-ই নয়, মাত্রা যতই পৌনঃপুনিক ও প্রচুর হোক না কেন, আমার কাকার বেলা তার স্বল্পতম বাহ্যফলও দেখা যেত না। কিন্তু যদি এই মতপোষণ দুষ্য হয় যে তাঁর 'মাথা শক্ত' ছিল ব'লে এই পাপ বৃদ্ধি পেয়েছিল, তবু একচল্লিশ বছর বয়সে তাঁর মৃত্যুর পরে কোনো সংশয় রইল না যে এর সঙ্গে তাঁর অপরিমাণ কর্মক্ষমতার সম্পর্ক ছিল। ইতিপূর্বে, বোধ হয় মৃত্যুর দশ বছর আগেই, তিনি তাঁর দেহযন্ত্রকে এমনভাবে পীড়ন করেছিলেন যে চিকিৎসকেরা তাঁকে দীর্ঘ স্বাস্থ্যোদ্ধারসাধনায় দূরতম প্রস্রবণ-তটে পাঠিয়ে দিলেন। ভগ্নস্বাস্থ্য আপাতদৃষ্টিতে উদ্ধার ক'রে তিনি যতদিনে ফিরে এলেন, ততদিন আমার পিতামাতা তাঁর স্বাস্থ্যের প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে এত বেশি সাবধানবাণী শুনেছেন যে অমিতাচারীকে ঘরে ফেরানোর প্রস্তাবে বাড়ির সকলকে রাজি করানো মার পক্ষে অনেক সহজ হ'য়ে এসেছে। অল্পকাল পরেই যখন অমরকাকার স্ত্রীর মৃত্যু হ'ল—অগ্রহৃদয়ের জন্যে নয়, অজীর্ণরোগে—তখন তাঁর পরিচর্যার দায়িত্ব নিলেন মা। এতই অনাবৃত

ছিল অমরকাকার স্বভাব যে অনুভূত কৃতজ্ঞতা তিনি লুকিয়ে রাখতে পারতেন না; এবং আমার মা তাতে সাড়া দিতেন, তাঁকে—অধঃপতিত অপদার্থ নয়—বিদ্রোহী ব'লে মেনে নিয়ে।

অস্বাভাবিকমাত্রেই চিরকাল হিন্দুমানসের পক্ষে শ্রদ্ধেয়; অবস্থাবিশেষে এমনকি বিকলাঙ্গতাও দৈবানুগ্রহের প্রকৃষ্ট প্রমাণ ব'লে বিবেচিত হয়, যেমন কিনা অতিরিক্ত অঙ্গবিশিষ্ট গোবৎস তার প্রতিপালককে নিয়মিত ভিক্ষে জোগায়। আর অমরকাকা শুধু যে প্রীতিপ্রদরূপে প্রচলমুক্ত ছিলেন তা-ই নয়, সেই সঙ্গে ছিলেন এতই স্পষ্টত প্রতিভাশালী যে সৃষ্টিশীলতার প্রতি তাঁর সহজাত শ্রদ্ধাবশত আমার পিতার মনে-মনেও সন্দেহ ছিল না যে তাঁর অনুভবকে বুঝতে হ'লে সাধারণ্যে প্রয়োজ্য প্রতিমান অপেক্ষা অন্যবিধ আদর্শের প্রয়োজন। তাই অমরকাকার কাছ থেকে অল্পবয়স্কদের পরিকল্পিত পৃথক্করণ কার্যে পরিণত হ'ল না; এবং যদিও আমার সাধারণ রঙ্গালয়ে গমন সংক্রান্ত নিষেধাজ্ঞা ততদিনেই প্রত্যাহৃত হ'ল যতদিনে আমি বয়ঃসন্ধিকাল বেশ কিছুটা পিছনে ফেলে এসেছি, তবু এমন দিন এল যখন এত লোক থাকতে আমার মা নির্বন্ধসহকারে বললেন যে অন্তত একবার কাকার অভিনয় না-দেখলে আমার শিক্ষা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। সেই উপলক্ষ্যের আবার সন্নিপাত ঘটেছিল অমরকাকার রঙ্গজীবনের সবচেয়ে স্মরণীয় মুহূর্তগুলোর সঙ্গে; এবং যদিও আমি, তাঁর সমসাময়িকদের বিষয়ে প্রত্যক্ষ জ্ঞানের অভাববশত, তাঁর সেই সব ভক্তদের প্রতিধ্বনি করতে দ্বিধা বোধ করি যাঁরা তখন রটিয়েছিলেন যে সে-রাত্রে তিনি তাঁর সব প্রতিদ্বন্দ্বীদের ছাড়িয়ে যান, তবু আমি এই দৃঢ় বিশ্বাস নিয়ে ফিরেছিলুম যে অমরেন্দ্রনাথ একজন মহৎ অভিনেতা। এবং এ-কথাও আমি মানতে পারি না যে এর কারণ শুধু আমার অনভিজ্ঞতা বা তাঁর বিষয়ে আমার কল্পনার কারুকর্ম।

শত্রুরা তাঁর এই তর্কাতীত জনপ্রিয়তার জন্য দায়ী করত তাঁর প্রচার-প্রতিভাকে, অভিনয়দক্ষতাকে নয়; তাঁর বাগাড়ম্বরপ্রিয়তার দৃষ্টান্ত হিসেবে নানা গল্প উদ্ভাবিত হয়েছিল। শোনা যায় যে কোনো একটি সরল, এবং আসলে গল্প, বাক্য তাঁর মুখে তৎক্ষণাৎ অমিত্রাক্ষরে রূপান্তরিত হত। কিন্তু অন্তত আমি যে-রাত্রে তাঁর অভিনয়কলা প্রত্যক্ষ করেছিলুম সেই রাত্রে

সমালোচকেরা প্রায় স্বীকার না-ক'রে পারেননি যে তাঁর বিশাল সাহসের সঙ্গে নিছক বাহাদুরির কোনো সাদৃশ্য নেই ; এবং প্রকৃত সার্থকতার দৃশ্যমান তুলনা সম্ভবপর ক'রে, ইংরেজি ও বাংলার মতো বিসদৃশ দুই ভাষায় একই নাটকের পরস্পর অভিনয়ের অন্য কোনো উদাহরণ আমার জানা নেই। সেই সময়ে এক বিখ্যাত ইংরেজ অভিনেতৃসংঘের কলকাতায় অতুলনীয় সাফল্যের মরশুম শেষ হ'য়ে এসেছিল ; তাদের ভাণ্ডারে সর্বাধিক প্রশংসিত নাটক ছিল সেই 'কুত্র গচ্ছসি'র নাট্যরূপ, যার জন্য কয়েক মাস আগে সিঙ্কেভিচ নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন। কল্পনাতীত স্বল্পকালের মধ্যে নাটকটির বঙ্গানুবাদ শেষ ক'রে, অমরকাকা বিদেশীদের আমন্ত্রণ জানালেন তাঁর রঙ্গমঞ্চে তাদের নাট্যরূপ প্রদর্শন করতে ; এবং পূর্বনির্ধারিত ব্যবস্থানুসারে তাঁর নাটক তাদের পরে অভিনীত হ'ল। কী স্বস্তির সঙ্গেই না আমি লক্ষ্য করলুম, যবনিকাপতনের অনেক আগেই দর্শকবৃন্দ অতিথিদের কথা ভুলে গেছে ; এবং পরে জেনেছিলুম যে সংযম ও রুচির সকল প্রকার পরিচয় দিয়ে এই বিজয় অলৌকিকের সীমায় পৌঁছেছিল, কেননা যথোচিত মহড়ারও সুযোগ মেলেনি।

১১

অধিকাংশ বাঙালিই স্বভাব-অভিনেতা ; এবং এই জাতিগত উত্তরাধিকার ছাড়াও অমরেন্দ্রনাথ ছিলেন কান্তিমান ; তাঁর মুখশ্রী ছিল সুন্দর, এবং কালো চুল ও গুম্ফরাজির প্রতিতুলনায় তাঁর পাকা ধানের মতো গায়ের রঙ আরো উজ্জ্বল দেখাত। কিন্তু তাঁর আয়ত দৃষ্টি, ব্যঞ্জনাময় ভঙ্গিমা, আর সেই উদাত্ত কণ্ঠস্বর—তাঁর অঙ্গের সেই সূক্ষ্মতম অর্থবিকিরণের ক্ষমতা—বহু বর্ষের সাধনার ফলেই তাঁর আয়ত্তে এসেছিল। এবং যদিও তিনি হিন্দু ব'লেই "কুত্র গচ্ছসি" নাটকে খৃষ্টান নায়কের ভূমিকায় তাঁর অভিনয় এমন চমকপ্রদ মনে হয়েছিল, আসলে কিছুই তিনি ভবিতব্যের হাতে ছেড়ে দেননি এবং নিরবচ্ছিন্ন পরিশ্রমের দ্বারা প্রমাণ করেছিলেন যে সৌভাগ্য উত্তম ব্যবস্থাপনারই নামান্তর। যেহেতু তাঁর জীবনই ছিল রঙ্গালয়, তাই নাটক সংক্রান্ত পুঙ্খানুপুঙ্খ তিনি উপেক্ষা করেননি। প্রচারকর্মে তাঁর সূক্ষ্ম মনোযোগ এর

নিদর্শন ; অভিনয়ের নিশ্চিত সাফল্যের জন্যে যে বিজ্ঞাপনপর্যায় তিনি ব্যবহার করতেন, তা দেখলে মার্কিন বিশেষজ্ঞরা পর্যন্ত তারিফ না-ক'রে পারতেন না। বিজ্ঞাপনের মতো তাঁর নাটকও নিষ্কাম শিল্পকর্ম ছিল না ; আগামীকালের অভিনয়সূচি ব'লে দেবার পরমুহূর্তেই নবতম নাটকের শ্রুতিলিখন আরম্ভ ক'রে দিতেন, যাতে আসন্ন মাসে নূতন কোনো পালার নাম বিজ্ঞাপনে ঘোষিত হ'তে পারে। তৎকালীন বাংলা রঙ্গমঞ্চের প্রথা অনুসারে আস্থর্যোদয় অভিনয় হ'ত, অতএব এক-একটি অভিনয়রজনীর জন্য একাধিক নাটক না-হ'লে চলত না। আর, দর্শকসকাশে একই নাটক বারবার উপস্থিত করতে প্রয়োজক লজ্জিত বোধ করতেন।

সারস্বত মহাসিদ্ধির দিক থেকে অনাচারী ব'লে কথিত হোক বা না হোক, অমরেন্দ্রনাথের রচনাবলী এতটাই জনপ্রিয় ছিল যে বাংলা দেশের বৃহত্তম পুস্তকপ্রকাশক সেগুলি সংগ্রহ ক'রে সুলভ সংস্করণ প্রকাশ করেন, এবং দীর্ঘ কয়েক দশক ধ'রে সেগুলির প্রচার বজায় রাখতে বাধ্য হন। শেক্সপীয়রের 'হ্যামলেট' অবলম্বনে লিখিত তাঁর নাটক অন্যান্য অনেকের অনুবাদের চাইতে হয়তো সাহিত্যগুণে নিকৃষ্ট, কিন্তু শুধুমাত্র তাঁর নাটকই বছরের পর বছর উৎসুক দর্শক আকর্ষণে সমর্থ হয়েছিল। সত্য, ঐ নাটকের নাম-ভূমিকায় অমরকাকার আশ্চর্য অভিনয় তাঁর ভাবানুবাদের জনপ্রিয়তার কারণ ; কিন্তু যেহেতু সেকালে দেবদ্বিজে ভক্তি ও গার্হস্থ্য সুখদুঃখ ছাড়া নাটকের তৃতীয় বিষয় ছিল না, 'হ্যামলেট' নির্বাচনেই তাঁর বৈশিষ্ট্যের প্রমাণ পাওয়া যায়। সনাতনী পন্থা বর্জনের অভিপ্রায় আরো স্পষ্ট হ'য়ে উঠল তাঁর সর্বশেষ নাটকটিতে, যার বিষয় ছিল নেপোলিয়নের অন্তিম জীবন ; এবং যদিও মৃত্যুকালে তার প্রাথমিক খসড়ার বেশি এগোয়নি, তবু নাটকীয় ঔচিত্য বিষয়ে তাঁর সহজবোধ নির্ভুল জেনে, এক প্রয়োজক সেটি চড়া দামে তাঁর পুত্রদের কাছ থেকে কিনে নেন। দুর্ভাগ্যবশত, পাণ্ডুলিপিটি হারিয়ে যাওয়ায় ঐ নাটক কোনোদিন মঞ্চস্থ হয়নি। কিন্তু, নিষ্করুণ ব্যঞ্জনা নিয়ে সচেতন পরীক্ষা না-ক'রে থাকলেও, অমরকাকা তাঁর নিজের বৃত্তির ছিদ্রসন্ধানে বিরত হননি ; রঙ্গালয় বিষয়ে তাঁর রচনাসমূহে সমালোচনার অংশ প্রচুর,

সেজন্য একটি পত্রিকা স্থাপন ও সম্পাদনাও করেছিলেন।[১] এই পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর আত্মজৈবনিক উপন্যাসটিতে গণচিত্তরঞ্জক উপাদানের অভাব ছিল না।

তাঁর বুদ্ধিগত কৃতিত্বে বোঝা যায় যে নাট্যসাহিত্যে তো বটেই, অন্যান্য বিষয়েও তিনি বিস্তর পঠনপাঠন করেছিলেন; অথচ এজন্য প্রয়োজনীয় অবসর তিনি কী ভাবে সৃষ্টি ক'রে নিতেন তা কেউ জানে না। তিনি নিশান্তে শুতে যেতেন ব'লে বেলা এগারোটার আগে তাঁর দিন আরম্ভ হ'ত না; আর ততক্ষণে আগন্তুক সহকর্মীর পাঁচমিশেলি ভিড়ে তাঁর বৈঠকখানার ভেঙে পড়ার দশা হ'ত। সেই অপেক্ষমাণ নটগণের মুখের ভাব ব্যঞ্জনাময়, অঙ্গভঙ্গি নৃত্যের মুদ্রাতুল্য, আর কণ্ঠস্বর নানা স্বরগ্রামে বিভক্ত; পরস্পরের উদ্দেশে ঠাট্টা-তামাশা করছেন তাঁরা, বা এমন সব সজীব কাহিনী বলছেন যার গূঢ় অশ্লীলতা উদ্ঘাটনের বৃথা চেষ্টা করত আমার বোধশক্তি। অমরকাকা প্রবেশ করলে নমস্কার বিনিময়ের সময়টুকুর জন্য কলরবে ছেদ পড়ত; কিন্তু তিনি আসন গ্রহণ করার আগেই তাঁর শুভ্র-বস্ত্রাচ্ছাদিত তাকিয়াটি ঘিরে যে-ভাবে আবার কলরব প্রবাহিত হ'ত তাতে জবলপুরের সেই মর্মরস্তূপবেষ্টনকারী ক্ষিপ্র ঘূর্ণাবর্তের ছবি ভেসে উঠত আমার মনে। কিন্তু তাঁর মনোনিবেশ যত গভীরই হোক, ঐ পরিবেশের মধ্যে তিনি তাঁর সচিব-প্রস্তুত কার্যপঞ্জী সমাধা ক'রে উঠতে পারতেন না; রঙ্গালয়ের পরিচালনা সম্পৃক্ত বহু দৈনন্দিন সমস্যা কথাপ্রসঙ্গে উত্থাপিত হ'ত; এবং আমার মাতৃ-প্রেরিত যে-সব দূত ঘন ঘন এসে মনে করিয়ে দিচ্ছিল তিনি তখনো অভুক্ত আছেন, নিতান্ত জরুরি প্রশ্নগুলির সমাধান না-করা পর্যন্ত অমরকাকা তাদের নিবেদনে কর্ণপাত করতেন না। কিন্তু ততক্ষণে বেলা তিনটে বেজে গেছে। নিজেকে সচল রাখার জন্য তিনি যে

১ গিরিশচন্দ্র ঘোষ -সম্পাদিত 'সৌরভ' পত্রিকার অমরেন্দ্রনাথ ছিলেন সহকারী সম্পাদক; পরে তিনি তিনটি পত্রিকা স্থাপন ও সম্পাদনা করেন: 'রঙ্গালয়', 'নাট্যমন্দির' ও 'থিয়েটার'। স্থবীন্দ্রনাথের অনুজ হরীন্দ্রনাথ দত্ত অনুমান করেন যে এখানে 'নাট্যমন্দির' বিষয়ে উল্লেখ করা হচ্ছে।
—সম্পাদক

ইতিমধ্যে প্রচুর পরিমাণে নির্জলা ব্র্যাণ্ডি সেবন করেছেন তাতে অবাক হবার কিছু নেই, কেননা পাঁচটা নাগাদ রঙ্গমঞ্চের প্রকাশ্যে ও নেপথ্যে তাঁর কর্তব্য আরম্ভ হ'য়ে যাবে।

এ-রকম তীব্র চাপ কোনো মানুষই বেশি দিন সহ্য করতে পারে না, অমরকাকার জীবনও ঠিক সে-সময়ে অবসিত হ'ল, যখন অন্য অনেকে মাত্র তাদের সম্ভাবনার সীমা খুঁজে পান। তাঁর অমিতাচারের ফলে শুধু যে তাঁর ব্যক্তিগত সর্বনাশ হ'ল তা-ই নয়, তাঁর পুত্রের[১] ভবিষ্যতের উপরেও নেমে এল অন্ধকার। অমরেন্দ্রনাথের পুত্রকে আমি উল্লেখ করছি শুধু এ-কারণে নয় যে তিনি আমার অভৃতীয় পুরুষ ভ্রাতৃব্য, তাঁর নিজস্ব ব্যক্তি-স্বরূপের জন্যও আমি আজ তাঁকে স্মরণ করছি। ভালোবাসার ও ভালোবাসা অর্জনের ক্ষমতা তাঁর ছিল, কৈশোরে যেমন প্রতিশ্রুতিতে উজ্জ্বল তেমনি প্রৌঢ় বয়সে ব্যর্থতায় তাঁকে করুণ দেখাত। নিজের বিশেষ প্রকৃতির সঙ্গে বোঝাপড়া করার আগেই তিনি পিতার দৃষ্টান্তে মজেছিলেন; এবং পৈতৃক দুর্বলতার এই অনুসরণ অনেক সময় বিশ্বাস্য মনে হ'লেও তাঁর ছিল না সেই বিদ্রোহী চরিত্র, যার জয় নিশ্চিত আর বর্ম সহস্র শিখায় ভাস্বর। মনে-মনে সমাজভীরু হ'য়েও তিনি ব্যবহারে বিপথগামী হয়েছিলেন; অবচেতন আত্মনিগ্রহের ফলে তাঁর বদ অভ্যাসগুলো দূষিত হ'য়ে উঠেছিল। এক রঙ্গালয় পরিচালনার ব্যর্থ প্রয়াসে তিনি তাঁর বিত্তের সবটুকু খুইয়ে ফেলেন, এবং নির্বিচারে ঋণ গ্রহণ ক'রে তিনি তাঁর অসচ্ছলতাকে পরিণত করেন চরম দীনতায়। জীবনব্যাপী প্রেম ও ঘনিষ্ঠতা সত্ত্বেও প্রণয়িনীকে স্ত্রীর মর্যাদা দিতে রাজি হলেন না, কেননা মহিলাটি ছিলেন জনৈক সার্কাসব্যবসায়ীর জারজ কন্যা। এই সব অকৃতার্থতার তাড়নে তাঁর মাদকদ্রব্যে কৈশোর আসক্তি পরিণত হ'ল অহিফেনের দাসত্বে। আশ্চর্য এই যে এতৎসত্ত্বেও তিনি একটি পাঠযোগ্য উপন্যাস রচনা করেন এবং আদম ও ঈভার কাহিনী অবলম্বনে যে-নাটক রচনায় হাত দেন তা যদিও অসমাপ্ত, তার কোনো-কোনো অংশের বাগ্মিতা মনোমুগ্ধকর। পিতার অনুকরণে একবার একটি

১ সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত। ১৯৫০ সালে এঁর মৃত্যু হয়।

পত্রিকাও তিনি প্রকাশ করেন; আমার অক্ষম পদ্যরচনা সেখানেই প্রথম প্রকাশিত হয়।[১]

তাঁর শোচনীয় দুর্বলতার অন্যতম ছিল ধর্ম; যে-সব কুসংস্কার কখনো-কখনো তাঁর অন্ধ বিশ্বাসের বাহন হ'ত তা আর কিছু না হোক অস্বস্তিকর-ভাবে অপ্রত্যাশিত। অপ্রত্যাশিতই বটে;—ক্ষীণ এক ভূকম্পের পর, অতি প্রত্যূষে তাঁকে আমাদের বাড়ির সামনের রাস্তায় শ্মশান দেখে এক সহৃদয় কর্মযাত্রী সাইকেল-চালক তাঁকে স্বভাবতই আহত ভেবে উত্তোলন করেন, কিন্তু তাঁর প্রতিদানে পান অপর্যাপ্ত কটূক্তিবর্ষণ, কেননা আমার ভ্রাতৃব্য তখন ভূকম্পজনিত সম্ভাব্য মৃত্যুর হাত থেকে নিস্তার পেয়ে ইষ্টদেবতার উদ্দেশে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করছিলেন। পরে, যখন আমাকে এই ঘটনাটি বিবৃত করেন, তখনও তাঁর রোষ প্রশমিত হয়নি। কী রকম ম্লেচ্ছ ঐ পথচারী যে এটুকু পর্যন্ত জানে না মানুষ আহত হ'লে কাৎ অথবা চিৎ হ'য়ে প'ড়ে যায়, শুধু প্রণিপাত-রত হিন্দুই উপুড় হ'য়ে পড়ে! আসলে আমার ভ্রাতৃব্যটি ছিলেন ভীরুস্বভাব, প্রকৃতির যে-কোনো চণ্ডমূর্তি তাঁর আতঙ্ক জাগাত; বাতাস একটু বেগে বইলেই ঝড়ের শব্দকে ছাপিয়ে উঠত তাঁর গলা, কেননা এ-রকম সময়ে তিনি তাঁর কন্দরবাসী পূর্বপুরুষের মতোই মন্ত্রোচ্চারণ না-ক'রে পারতেন না। অথচ আমার মা যখন অবৈধ-যৌন সম্বন্ধের চিরাচরিত চিকিৎসারূপে বিবাহ নামক ভেষজের প্রস্তাব করেন তখন এই দুর্বল পুরুষ ভ্রাতৃবধূর পূর্বপ্রকোপ রোষতর্জনের সম্মুখীন হ'য়েও সেই ব্যবস্থায় কিছুতেই রাজি হননি। এখন আমার প্রায়ই মনে হয় যে আমার ভ্রাতৃব্যের তুলনায় যাঁরা নানাভাবে শ্রেয় ব'লে গণ্য, তাঁরা অনুরূপ অবস্থায় তাঁর মতো সাহস ও দার্ঢ্যের পরিচয় দিলে ভালো হ'ত।

অনুবাদ : জ্যোতির্ময় দত্ত ও অমিয় দেব

১ এই পত্রিকার নাম 'নাট্যপ্রতিভা'; এর বিষয়ে শ্রী অরবিন্দ গুহ আমাদের যা জানিয়েছেন তা এই। 'নাট্যপ্রতিভা'র প্রথম সংখ্যায় সুধীন্দ্রনাথ দত্ত স্বাক্ষরিত কোনো কবিতা নেই; তবে টেনিসন থেকে একটি অনুবাদ আছে, অনুবাদকের নাম উল্লিখিত হয়নি, কিন্তু সেটি সুধীন্দ্রনাথের রচনা হ'তে পারে না তা নয়। প্রথম সংখ্যায় দ্বিতীয় সংখ্যার ঘোষণা আছে, কিন্তু দ্বিতীয় সংখ্যা বহু চেষ্টাতেও কোথাও আবিষ্কৃত হয়নি, খুব সম্ভব 'নাট্যপ্রতিভা'র প্রথম সংখ্যাই শেষ সংখ্যা। এমনও হ'তে পারে সুধীন্দ্রনাথের কবিতা ছাপা হবার আগেই পত্রিকা লুপ্ত হ'য়ে যায়।—সম্পাদক

দুটি অপ্রকাশিত কবিতা

সুধীন্দ্রনাথ দত্ত

পুরস্কার

সেদিন জানি না কেন চিত্ত তব উঠেছিল জেগে
জাতিস্মর প্রণয়ের প্রথম আবেগে,
অয়ি মোর স্মিতা প্রেয়সী!
নিশি নিশি রুদ্ধ ঘরে ধূমায়িত প্রদীপের মসী
লাগিল কি সহসা দুঃসহ?
হঠাৎ স্মরণে এল অধরার অনন্ত বিরহ
বসন্তের অন্তিম হিল্লোলে?
কিংবা শুধু উৎসবের উগ্র উতরোলে
মদিরার পরিমাপে ঘটিল প্রমাদ?
বিধিবদ্ধ নিবৃত্তির বাঁধ
অকস্মাৎ চূর্ণ করি, তোমার চোখের তরলতা
ঘোষিল শিরায় মোর সৃজনের আদিম বারতা
নিশীথের কবোষ্ণ আঁধারে।
বারে বারে
নিবিড় চুম্বন বর্ষি মুখে বুকে স্তম্ভিত শরীরে,
বাসনা-পাণ্ডুর করি মোরে,
জাগাইলে প্রজ্বলিত হৃদয়গহ্বরে
আমার অন্তরতম গুহাবাসী উলঙ্গ প্রাণীরে॥

তবু দিনু যেতে
তবু দিনু চ'লে যেতে সমাপ্তির সমীপ লগনে :
হল মনে,
ও-বিশাল নয়ন-কুণ্ডেতে
যে-বিশুদ্ধ যজ্ঞানল নিরুদ্দেশ দেবতার খোঁজে

উঠেছিল নীরবে গরজে,
অকারণে
প্রাথমিক উল্লাস তাহার
হয়েছে অঙ্গার ;
হিতবুদ্ধি অভ্যস্ত বন্ধনে
তুহিন পঙ্গুতা হানে তোমার উন্মন আলিঙ্গনে ;
বিরল চুম্বনে
বিধুর বিরতি-ভিক্ষা নিরুপায় আত্মবলিদান ॥

উৎকণ্ঠিত প্রাণ
আবরিয়া দুঃস্থ যন্ত্রে নিরন্তর নিরানন্দে হাসে,
বলেছিলে উন্মত্ত হতাশে,
"সমৃদ্ধ কুমারীতনু দিলেম তোমার অধিকারে ;
ধ্বংস ভ্রংশ করি তারে,
সন্তপ্ত সাম্রাজ্য তব হোক সেথা প্রতিষ্ঠিত ত্বরা।
দুরাশার মদগর্বে ভরা
ভুবনবিজয়ী মোর দিব্য ভবিষ্যৎ
দেয় যদি ছেড়ে দিক পথ
শান্তি-সুখ-কীর্তি-দ্বেষী ভবিতব্যতারে।
মোর পূর্ণ যৌবনভাণ্ডারে
দিক রুদ্র অনুতাপ আজি হতে সতর্ক পাহারা।"
পাগলিনীপারা
বস্ত্রহীন ত্রস্ত বক্ষে তুলে নিয়ে নত শির মম,
বলেছিলে রুদ্ধ কণ্ঠে, "ক্ষমো, সখা, ক্ষমো।
একেলা তোমারে বাসি ভালো।
জ্বালো জ্বালো
নিষ্প্রভ নয়নে তব পুন সেই অকম্পিত শিখা,
যার পানে

ছুটিবে পতঙ্গসম মৃত্যুর সন্ধানে
আমার নগণ্য ভয় তুচ্ছ লজ্জা ক্ষুদ্র অহমিকা ॥"

তাই দিনু যেতে ;
বিক্ষিপ্ত বসনখানি তাই তুলে অসাড় করেতে,
ঘিরিলাম নিরুপম নগ্নতা তোমার ;
শূন্যতার শোকাবহ ভার
উদ্‌ভ্রান্ত উরসে চাপি করিলাম তাই নিষ্পেষণ
বাসনার কর্কশ গর্জন।
জানি জানি,
জগতে কখনও যদি সে-নিশার বেদনা বাখানি,
লোকে ক'বে উপহাস করি,
নিপুণা নাগরী
করিল নির্দয় খেলা মোর মূঢ় পৌরুষের সনে।
তবু হয় মনে,
সে-বন্ধ্যা বসন্তনিশা ব্যর্থ কভু নয় ;
প্রত্যেক নিমেষে তার খোদা আছে প্রেমের বিজয়।
আসক্তির শেষে
অকিঞ্চন উদাসীর বেশে
পশি যে-চতুর চোর হৃদয়ের উন্মুক্ত তোরণে,
আত্মহারা উৎসবের ক্ষণে
অলখিতে আজন্মের সম্পদ হরিয়া,
রেখে যায় ভাণ্ডার ভরিয়া
সমাপ্ত স্বপ্নের স্মৃতি, মরণের অধিক মরণ,
তাহার আসন্ন আগমন
তোমার অন্তর পথে আমি রোধ করেছিনু, প্রিয়ে,
সামান্য ত্যাগের বাধা দিয়ে।
পুরস্কার মম

পাণ্ডুর অধরপ্রান্তে অনিশ্চিত অনুমিতিসম
কৃতজ্ঞ হাসির নম্র দ্যুতি,
সজল চোখের কোণে অমর স্মৃতির প্রতিশ্রুতি ॥

ক্রাফেন্‌হাউস্ পাউলিনেন্‌ষ্ট্রাফ্‌ট্
ভিসবাডেন ; ১৬ই সেপ্টেম্বর, ১৯২৯

অমৃত

হায় রে কবি, হায় রে উদাস কবি,
নিরুদ্দিষ্ট নামহারাদের কষ্টগোচর ছবি
বন্ধদ্বারের অন্ধকারে খুঁজবি কেবল মেলে ডাগর আঁখি ?
পলাতকার প্রস্তরিত চরণচিহ্নটিরে
কৃপণ প্রাণের বিরল পূজা দিবি কি আজ শুষ্ক ফল্গুতীরে ?

দেখবি না কি
দেখবি না কি চারপাশে তোর আবহমান প্রাণ
পরিচিত লীলায় দীপ্যমান ?
সম্মুখে তোর স্তব্ধ মেঘের অগ্নিগিরি হতে
সরকারী ওই শ্রীহীন ইমারতে
স্বয়ং সূর্য আসছে নেমে সোনায় মোড়া হাজার ঘোড়ার রথে।
রূপের আপদ দূরে রেখে কেরানীদের ক্লান্ত গড্ডলিকা
ওই ছুটেছে আগলঘেরা গোঠের অভিমুখে,
সঙ্করিকা
দলনপাণ্ডু ওষ্ঠাধরে আঁকছে সকৌতুকে
সান্ধ্য অভিযানের গুলাল শশব্যস্ত পথের শান্ত ধারে
লগননিষ্ঠ সে কার অভিসারে।

চলেছে ট্র্যাম, দৌড়েছে বাস, হচ্ছে উধাও মোটরগুলো হেঁকে,
পদচারীর ত্রস্ত শরীর ধূসর ধূলায় ঢেকে।
তুচ্ছ ক'রে নগরখানার তীব্র কোলাহল
সবার নাগাল ছাড়িয়ে উঠে অটল অচঞ্চল,
রাজবাগিচার রিক্ত শিমুলচূড়ে
কোন অতন্দুর বসনপ্রান্ত আটকে হাওয়ায় উড়ে ?
ওরে উদাস কবি,
কেমনে আর নীরব হয়ে র'বি ?
যায় যদি যাক বন্ধুরা তোর একে একে চ'লে ;
দেয় যদি দিক পরানপ্রিয়া বরণমালা অন্য কারও গলে ;
আশা কুহকিনী
ভাঙা বুকের টুকরো নিয়ে খেলে যদি খেলুক ছিনিমিনি,
তবু কি তোর গান
চিরন্তন ওই শোণিমার করবে অপমান ?
আজকে সাঁঝের কান্নাহাসি থামবে যখন আর ফাগুনের সাঁঝে,
ওই যুবতীর প্রগল্‌ভ রূপ পঞ্চভূতের মাঝে
লুপ্ত হবে যেদিন একেবারে,
সেদিনও ফের নবীন কবির দ্বারে
আসবে শিমুল ফাগুনবেলার আগুন বহ্ন ক'রে,
ওরে কবি, এই অমৃতে নে তোর প্রাণের স্থিতির অভাব ভ'রে ॥

১৩ মার্চ, ১৯৩১

'পুরস্কার' ইতিপূর্বে কোথাও ছাপা হয়নি ; এটি 'অর্কেস্ট্রা-পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত। 'অমৃত' 'চিত্রালী' পত্রিকায় ছাপা হয়, কিন্তু এটি কোনো পুস্তকে স্থান পায়নি। —সম্পাদক

পত্রগুচ্ছ

[বুদ্ধদেব বসুকে লিখিত]

সুধীন্দ্রনাথ দত্ত

৪৯সি, হাজরা রোড,
বালিগঞ্জ

প্রিয়বরেষু,

আপনার চিঠির জন্যে আমি কৃতজ্ঞ। ছাপার হরফে যে-ভালো লাগা বা মন্দ লাগা প্রকাশ করা যায়, তা যুক্তির দিক দিয়েই কম বা বেশি নির্দোষ; আন্তরিকতার বিচারে তা চিঠির সঙ্গে পাল্লা দিতে পারে না। তাই ইতিপূর্ব্বে আপনি যখন সমালোচনা-প্রসঙ্গে আমার কোনো বইয়ের প্রশংসা করেছেন, তখন সে-প্রশংসায় আমি অহমিকাবোধের সুযোগ পেয়েছি, বিনয়ের, অর্থাৎ হিউমিলিটির প্রয়োজন দেখিনি। আপনার চিঠি প'ড়ে সে-রকম গর্ব্ব আমার মনে উদয় হলো না, বোধ হলো আমি পুরস্কৃত, আমার লেখা সার্থক। এই মনোভাবের নাম‌ই কৃতজ্ঞতা; এবং কৃতজ্ঞতা যেহেতু সাধারণ মানুষের নিত্য অনুভূতির অন্তর্গত, তাই তার প্রকাশও বাঁধা গতেই সম্ভব। অতএব আমার বলার মামুলী ভঙ্গি দেখে আমার বক্তব্যের যাথার্থ্যে সন্দেহ করবেন না।

"বৈশাখী"-র খবর কামাক্ষীপ্রসাদের[১] কাছে পেয়েছি। তাতে আমার লেখা স্থান পেলে আমারই গৌরব। হাইনের অনুবাদ নিশ্চয়ই পাঠাতে পারবো। কারণ বছর দশেক আগে আমি যখন জার্মান শিখছিলুম, তখন হাইনে সহজ ব'লে তাঁর ত্রিশ-চল্লিশটি কবিতা আমি অনুবাদ করি। কিন্তু অনুবাদগুলো তখনকার কাঁচা বুদ্ধিতেও জুৎসই লাগেনি, এবং সেইজন্যে এত দিন সেগুলোর প্রকাশে মন সায় দেয়নি। আজ মূল রচনা হাতে বা মাথায় নেই ব'লেই সেগুলোর দিকে আবার নজর পড়েছে, যদিও দেখছি যে পুনরনুবাদ করা ছাড়া সেগুলো শোধরানোর আর কোনো উপায় নেই। দুঃখের বিষয় ইতিমধ্যে আমার কলম প্রায় স্থাণু হয়ে এসেছে, জার্মান-জ্ঞানেও বেশ খানিকটা

১ শ্রী কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়: 'মৈনাক' প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থের রচয়িতা, অধুনালুপ্ত 'রংমশালে'র অন্যতর সম্পাদক।

"মরচে পড়েছে"। তবু মার্চ মাসের মাঝামাঝি একাধিক তর্জমা তৈরী হয়ে যাবে নিশ্চয়ই, আপনি তার মধ্যে থেকে যে-কোনোটা বেছে নিতে পারবেন।

'কবিতা'র বিশেষ সংখ্যা সম্বন্ধে এতখানি নিরুক্তি সম্ভব নয়। কারণ আমার কলম সত্যই আজকাল চলে না; তাছাড়া রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে এত বার লিখেছি যে সে-প্রসঙ্গে আজ আর আমার কোনো বক্তব্যই নেই। অবশ্য তাঁর ছবির বিষয়ে আমি কখনো কিছু বলিনি; এবং বোধহয় বিষ্ণুই[১] জানিয়েছিলেন যে আপনার ইচ্ছা আমি ওই সম্বন্ধে লিখি। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ আশি পেরিয়ে রোগশয্যায় শুয়েছেন; তাঁকে দুঃখ দিয়ে লাভ কি? এবং আমি লিখতে পারলে তাঁর ছবির যদিও প্রশংসাই করবো, তবু খাঁটী কথা বলতে গেলে সে-প্রশংসা এমন অকুণ্ঠ শোনাবে না যাতে তিনি খুশী হবেন। অতএব রবীন্দ্রসংখ্যার সূচীতে আমার নাম দেবেন না। তবে আমি আপনাকে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি যে আমি লিখতে চেষ্টা করবো, এবং যদি সফল হই, তাহলে লেখাটা আপনার কাছে পাঠাবো; পছন্দ হলে আপনি সেটা ছাপবেন।

আশা করি আপনি কুশলে আছেন। ইতি ২৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৪১

ভবদীয়
শ্রীসুধীন্দ্রনাথ দত্ত

৬নং হইট,
৬, রাসেল্ স্ট্রীট,
কলিকাতা

প্রিয়বরেষু,

* * *

"সুমিত্রার অপমৃত্যু"[২] খুব ভালো লেগেছে। ইচ্ছা ছিলো নিজে গিয়ে লেখিকাকে আমার কৃতজ্ঞতা জানিয়ে আসবো; কিন্তু কোনো মতেই সময় ক'রে উঠতে পারছি না। অগত্যা আপনার শরণ নিচ্ছি: তাঁকে আমার

১ শ্রী বিষ্ণু দে।
২ শ্রীমতী প্রতিভা বসু প্রণীত গল্পগ্রন্থ

আন্তরিক ধন্যবাদ দেবেন। আমার মনে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই যে তিনি অসামান্য প্রতিভার অধিকারী; তাঁর স্থান বাঙালী কথাসাহিত্যিকদের প্রথম শ্রেণীতে। অদ্ভুত তাঁর লেখার প্রাঞ্জলতা ও প্রসাদগুণ, এত স্বাভাবিক কথোপকথন বাংলা গল্পে উপন্যাসে সুলভ নয়।

দৈনিক পত্রের চাকরি[১] লেখার মহাশত্রু। তাছাড়া অবকাশের অভাব সত্যই শোচনীয়। সুতরাং ভালেরি-প্রসঙ্গে আমার কলম চলবে ব'লে আশা নেই। তাঁর কাব্যসংগ্রহ ও মুখ্য গদ্যরচনা আমার কাছে আছে; কিন্তু তাঁর বিষয়ে কোনো বই আমার নেই, বেশি বোধহয় লেখাও হয়নি।

আশা করি আপনারা ভালো আছেন। পূজার ছুটিতে কোথাও যাচ্ছেন নাকি? ইতি ৭ অক্টোবর ১৯৪৫

ভবদীয়
শ্রীসুধীন্দ্রনাথ দত্ত

৬নং হুইট,
৬ রাসেল্ স্ট্রীট,
কলিকাতা

প্রিয়বরেষু,

রবিবার আপনাকে ধরতে পারিনি ব'লে খারাপ লাগছে। তার উপরে কাল আপনার প্রেরিত লোকটির সঙ্গেও দেখা হলো না। সেজন্যে অপরাধ নেবেন না।

আমার রেডিও বক্তৃতা[২] আপনার ভালো লেগেছে জেনে কতটা উৎসাহিত ও উল্লসিত হয়েছি তা লিখে বোঝানো শক্ত। তাহলেও বক্তৃতাটা মোটেই সুলিখিত নয়। তার সময় ছিলো না; শেষ দিনে রাত তিনটে পর্য্যন্ত জেগে কোনোমতে সেটা শেষ করেছিলুম প্রতিশ্রুতিরক্ষার জন্যে। পাঁচ বছর বাংলা

১ সুধীন্দ্রনাথ তখন 'স্টেটসম্যানে'র সহকারী সম্পাদকের কর্ম করছেন।
২ সদ্যপ্রকাশিত 'গল্পসংকলনে'র সমালোচনা। এটি পরে বিস্তারিত হ'য়ে 'উক্তি ও উপলব্ধি' নামে প্রকাশিত হয়।

লিখিনি; তার আগেও দ্রুত রচনা আমার ক্ষমতার বাইরে ছিলো। কাজেই ওইটুকু অবকাশে প্রকাশযোগ্য লেখার আশা বিড়ম্বনা। কিন্তু ইচ্ছা আছে জিনিসটাকে গুছিয়ে লিখবো। তার পরে প্রবন্ধটা যদি আপনার পছন্দ হয়, তাহলে আপনারই যে কোনো পত্রে প্রকাশ হতে পারে। তবে বৈশাখীর জন্যে ওটাকে লিখে উঠতে পারবো ব'লে মনে হয় না। কারণ ৬ই মার্চ পর্য্যন্ত নিঃশ্বাস ফেলার অবসর নেই, এবং তার পরে ছুটি নেবার সঙ্কল্প করেছি। ছুটির মধ্যে ওটাতে হাত দেওয়াই যুক্তিসঙ্গত। আপনি কি বলেন? ইতিমধ্যে কবিতার অনুলিপি পাঠালুম। সম্ভব হলে একটা প্রুফ কি পেতে পারি?

যত শীঘ্র পারি আপনার ওখানে যাবো। কিন্তু হপ্তাখানেকের মধ্যে হয়তো হয়ে উঠবে না। সেজন্যে ক্ষমা করবেন।

আশা করি আপনাদের কুশল। ইতি ২৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৬

ভবদীয়
শ্রীসুধীন্দ্রনাথ দত্ত

হিমানী
কালিংপং

প্রিয়বরেষু,

লেখাটা[১] এইমাত্র শেষ করলুম; খুবই খারাপ লাগছে। এত আড়ষ্ট লেখা আমিও আগে লিখিনি—তার উপরে অসম্বদ্ধ। ভাববেন না এটা বিনয়, সত্যই কার্য্য প্রবন্ধ। তবু প্রতিশ্রুতিরক্ষার জন্যে পাঠাবো, অনুলিপি শেষ হলেই। কিন্তু আপনি ভালো ক'রে প'ড়ে দেখবেন রচনাটা প্রকাশের যোগ্য কিনা। যদি না ছাপেন, তাহলে আমি খুশীই হবো।

হপ্‌কিন্‌স্ সম্বন্ধে আপনি যে প্রশ্ন তুলেছেন তার জবাব আমি জানি না। অনেক হপ্‌কিন্‌স্-ভক্তকে জিজ্ঞাসা করেছি, কেউই খ্রাং রীথ্‌-এর সন্তোষজনক সংজ্ঞা দিতে পারেননি। আমার নিজের বিশ্বাস ওটা স্বাচ্ছন্দ্যেরই

১ 'উক্তি ও উপলব্ধি', প্রথমে 'বৈশাখী'তে প্রকাশিত, পরে 'তুলায় ও কালপুরুষে'র অন্তর্ভুক্ত হয়।

প্রতিশব্দ—কেননা অক্ষরমাত্রিক পদের পরিবর্তে স্বরাঘাত গুণে পদরচনা তো কোল্‌রিজ্‌ও করেছিলেন, এবং দুটো স্বরাঘাত পাশাপাশি পড়লে এক মাত্রার লোপ, অথবা উচ্চারণের দ্রুতি বাড়িয়ে বহুমাত্রিক পর্ব্বের কালপরিমাণ কমানো ইংরেজী ছন্দের স্বভাবসিদ্ধ। তবে হপ্‌কিন্‌স্ বোধহয় এই ব্যতিক্রমগুলোকে তুলেছিলেন নিয়মের পর্য্যায়ে, এবং তাঁর তালবোধ যেহেতু অসামান্য রকমের জাগ্রত ছিলো, তাই তাঁর স্বৈরাচারে আমাদের কান সায় দেয়।

বাংলায় গদ্য-পদ্যের ব্যবধান আজ পর্য্যন্ত দুস্তর; এবং পর্ব্বের পরিমাপে ও পর্ব্বাঙ্গের অনুক্রমে ব্যত্যয় অসম্ভব। অতএব হপ্‌কিন্‌স্-শোভন স্বাধীনতা বাঙালী ছান্দসিকের অসাধ্য। কিন্তু পরোক্ষে শুনেছি···নাকি হপ্‌কিন্‌স্-এর দৃষ্টান্তেই তাঁর গদ্য-পদ্যের মধ্যবর্ত্তী রচনারীতি আবিষ্কার করেছেন। এ-কথা কত দূর সত্য বলতে পারি না। তবে আমার গতানুগতিক কানে তাঁর ওই জাতীয় লেখা গদ্যের মতো লাগে, যদিও তাতে পদ্যের আমেজ ও মিলের উপস্থিতি গদ্যজাত প্রত্যাশার প্রতিকূল। তবে আমি এ-ব্যাপারে অভিজ্ঞ নই, যাঁরা গ্রাঁ রীথ্‌ম্-এর চর্চ্চা করেছেন, তাঁরা হয়তো আপনার কৌতূহল-নিবারণে সক্ষম হবেন।

এখানে এক রকম কেটে যাচ্ছে। তবে এবারে সূর্য্য আমাদের প্রতি অপেক্ষাকৃত বিমুখ। তাহলেও পাঁচ বছর পরে ছুটি পেয়ে সুখে আছি, আরো বারো তেরো দিন থাকবো।

আশা করি আপনাদের কুশল। প্রতিভা দেবীকে বলবেন যে তাঁর বইখানি সঙ্গে এনেছি; এত দিন প্রবন্ধের উপদ্রবে তাতে হাত দিতে পারিনি; এই বার পড়বো। ইতি ৭ এপ্রিল ১৯৪৬

ভবদীয়
শ্রীসুধীন্দ্রনাথ দত্ত

পুঃ ভালো কথা—প্রবন্ধটার নামকরণে কিসের যেন বাধা রয়েছে। আর কিছু না পেয়ে ওটার নাম দিয়েছি "বুদ্ধদেব বসুর প্রসাদগুণ", কিন্তু প্রসাদগুণের অংশটা বুদ্ধদেব বসুর চেয়ে হয়তো বড়। যদি ছাপেন আরেকটা নাম ভেবে বার করবেন, যদি পারেন।

হিমানী
কালিংগ

প্রিয়বরেষু,

আপনার চিঠি গত কাল সন্ধ্যায় পেলুম। ইতিমধ্যে প্রবন্ধটা পাঠিয়েছি; আশা করি আপনার কাছে পৌঁছেছে। ওটার শিরোনামায় আপনার অনুপস্থিতি অনুচিত, কেননা প্রায় অর্দ্ধেকটা আপনার আলোচনা। "প্রসাদ-গুণ ও বুদ্ধদেব বসু" শোনায় খারাপ; এবং "প্রসাদগুণে বুদ্ধদেব বসু" উপমায় কালিদাসের মতো। ফলে "বুদ্ধদেব বসুর প্রসাদগুণ" ছাড়া আর কিছু খুঁজে পাইনি। সম্পাদক হিসাবে আত্মবিজ্ঞাপন যদি একেবারে বাদ দিতে চান, তাহলে "প্রসাদগুণ ও বস্তুনিষ্ঠা" হয়তো চলতে পারে। কিন্তু নাম বাছার ভার আপনার উপরে; এ নিয়ে আর বাক্যব্যয় করবো না।

হপ্‌কিন্‌স্-এর স্থিতিস্থাপক ছন্দ সম্বন্ধে গত বারে যা লিখেছি তা নিশ্চয়ই সম্পূর্ণ নয়, এমনকি সার কথা কিনা, তাও সন্দেহ। কিন্তু আমার ধারণা একেবারে ভ্রান্ত না হলে, সে-ছন্দের অনুকরণ বাংলায় হয়তো অসম্ভব। কারণ পদের দৈর্ঘ্য বা হ্রস্বতার উপরে ছন্দের প্রকৃতি নির্ভর করে না; পর্ব্বের আকার ও পর্ব্বাঙ্গের বিন্যাসেই ছন্দের বৈচিত্র্য। এই দুই ব্যাপারে বাঙালী কবির স্বাধীনতা নগণ্য। অবশ্য তথাকথিত মাত্রাবৃত্তে সে নেহাৎই হাত-পা বাঁধা; কিন্তু স্বরবৃত্ত বা ছড়ার ছন্দেও পর্ব্ব চতুর্মাত্রিক—কেবল চরণের শেষ পর্ব্বে দুটো অতিরিক্ত মাত্রার প্রয়োগ নিষিদ্ধ নয়, এবং পর পর তিনটে সুস্পষ্ট স্বরাঘাত পড়লে, তিন মাত্রায় পর্ব্ব পূর্ণ হয়। রীতিমতো পয়ারে প্রথম পর্ব্ব আট মাত্রার ও দ্বিতীয় ছয় মাত্রার ব'লে, তাতে রকমারির অবকাশ আপাতত একটু বেশী; কিন্তু তাকে ভাঙতে গেলে, চার মাত্রাই য়ুনিট্ হয়ে পড়ে: তার পরে পদান্তে আধ পর্ব্ব বাড়ানো ছাড়া আর কোনো স্বাধীনতা মেলে না।

ইংরেজীতে এ-রকম বাঁধা-ধরা নিয়ম নেই: গতানুগতিক ছন্দেও They clash / in a flash / —এ-দুই পর্ব্বের ওজন সমান; এবং বোধহয় হপ্‌কিন্‌স্-এর মতে একটা পদে যদি পাঁচটা স্বরাঘাত থাকে, তাহলে চরণটা দশমাত্রিক, কি পনেরোমাত্রিক, কি পাঁচমাত্রিক, তা না গুনেই, তাকে pentametre

বলা বিধেয়। মুক্তচ্ছন্দে নানা জাতীয় পর্ব্বের সমাবেশ, তাছাড়া পদ্য থেকে গদ্যে নেমে আসায় কোনো বাধা নেই। সুতরাং এ-রীতিও বাংলায় অচল; এবং অন্তত আমার কানে তথাকথিত গদ্যচ্ছন্দের ছন্দোগুণ অনাবিষ্কৃত রয়েছে। অগত্যা——র মিলবহুল গদ্য আমাকে পীড়া দেয়; এবং গদ্যকে পদ্যের ঢঙে ছাপার সার্থকতা আমি দেখতে পাই না। কারণ সংস্কৃত কাব্যে গদ্য-পদ্যের বাছ-বিচার নেই; টুর্গেনিভ্-এর Poems in Prose বিনয় সত্ত্বেও আবেগে পরিপূর্ণ।

তবে এ-বিষয়ে আমার মত নিশ্চয়ই প্রামাণ্য নয়; এবং গদ্যচ্ছন্দের কল্যাণে বাংলা গদ্য-পদ্যের ব্যবধান যদি ঘোচে, তাহলে আমি যৎপরোনাস্তি খুশী হবো। ইতিমধ্যে 'মনে', 'মোরে' ইত্যাদি শব্দ, নামধাতু, অসমাপিকা ক্রিয়ার 'য়া' লোপ, মিলের তাগিদে বিভক্তি-বিপর্য্যয় বাঙালী কবির অবশ্যবর্জ্জনীয়, এবং ছন্দঃপতনের ভয়ে ব্যাকরণের অপমান অমার্জ্জনীয়। ইতি ১১ এপ্রিল ১৯৪৬

ভবদীয়
শ্রীসুধীন্দ্রনাথ দত্ত

পুঃ গত চিঠিতে অক্ষর syllable অর্থে ব্যবহার করেছিলুম। সংস্কৃত প্রয়োগ বোধহয় তাই।

হিমানী
কালিংপং

প্রিয়বরেষু,

প্রবন্ধটা আপনার পছন্দ হয়েছে জেনে, সত্যই অত্যন্ত খুশী হলুম। কিন্তু আমার সন্দেহ ঘুচলো না। লেখাটা নিশ্চয়ই আড়ষ্ট; এবং জবাব জানি না ব'লে, অনেক প্রশ্ন এড়িয়ে গেছি। তাছাড়া যে-সব লেখকের নাম নিয়েছি, তাঁদের রচনাবলীর উপরে এক বার চোখ বুলিয়ে নেওয়া উচিত ছিলো; বিশেষ ক'রে আপনার লেখা আবার না পড়ে, আপনার সম্বন্ধে কলমচালনা নেহাৎ অবিবেকীর কাজ।

আপনার তথাকথিত দোষত্রয়-সম্বন্ধে যা বলেছি, তার ভিত্তি আপনার গল্পসংকলনে মোটেই নেই। আসলে ও-কথা না তুললেও চলতো। কিন্তু ত্রুটি না দেখালে, আপনার গুণবর্ণনা পাছে স্তুতিবাদের মতো শোনায়, এই ভয়ে পুরাতন স্মৃতি মন্থন ক'রে ওই বিষ উগরেছি। আপনার গদ্যের "কবিত্বে" আমি চির দিনই মুগ্ধ: আপনার পদ্যের বিরুদ্ধে আমার একটা ছোট নালিশ এই যে তাতে গদ্যের প্রভাব অল্প। যেমন ধরুন "আমাকে" না ব'লে "মোরে", "আমার" না ব'লে "মোর", "তাকে" না ব'লে "তাহারে", "ছিলুম"-এর জায়গায় "ছিনু" ইত্যাদি প্রয়োগে আমার কান সায় দিলেও, আমার বুদ্ধি সায় দেয় না। তবে এই প্রচলিত রীতি ভবিষ্যতেই বর্জ্জনীয়—এই উপায়ে যে কবিতা লেখা হয়েছে, তাকে শোধরাতে গেলে, তা আর কবিতা থাকবে না। সুতরাং আপনার প্রাচীন রচনার সংস্কারে আপনি যে-সংযম দেখিয়েছেন, তার জন্যে আমি কৃতজ্ঞ। কারণ স্বাচ্ছন্দ্যই রসরচনার প্রাণ, এবং প্রাণ-হানিকর সংশোধন অমার্জ্জনীয়।

সে যাই হোক, বর্ত্তমান প্রবন্ধের সম্পর্কে আপনি যা বলছেন, তা আমি সম্পূর্ণ মানি। যে-লেখা সাধারণবোধ্য নয়, তার কোনো সার্থকতা নেই। কিন্তু লিখতে গেলেই আমি একটা প্রচণ্ড বাধা অনুভব করি, এবং সেই বাধা কাটিয়ে উঠতে আমার সমস্ত শক্তি খরচ হয়ে যায়, দুরূহতা অতিক্রম করা আর সাধ্যে কুলায় না। সেইজন্যেই আমি এত কম লিখি, এবং লেখা শেষ ক'রে সাধারণ লেখক যে-আরাম পান, তা আমার কপালে জোটে না। তবু চেষ্টায় আমি বিমুখ নই; এবং ইতিমধ্যে প্রবর্ত্তনা যদি একেবারে না ফুরোয়, তাহলে কোনো এক দিন হয়তো সরল রচনা আমার কলম দিয়েও বেরোবে। তত দিন পর্য্যন্ত আপনি আমার ঈর্ষ্যাভাজন।

এই বার আপনার প্রশ্নের জবাব দিয়ে চিঠি শেষ করি

(১) "ভুক্তভোগী" সমাজের বিশেষণরূপে ব্যবহৃত হয়েছে। আমার বিশ্বাস প্রয়োগটি ব্যাকরণসম্মত। কিন্তু আপনার কানে খারাপ লাগলে, শব্দটা বাদ দিয়ে দেবেন। শুধু সমাজ বললেও অর্থবোধের হানি হবে না। আমার বক্তব্য এই—যে-সমাজে সকলের ভাষা সমান সরল, সে-সমাজ কৃপার যোগ্য, সেখানে স্বাবলম্বীর আদর নেই।

(২) অনারাব্ধ অবশ্যই ভুল। অনারব্ধ ঠিক।

(৩) ময়য়=মৎ+ময়, অর্থাৎ তৎ+ময়-এর উলটো, subjective। "ময়থ" নিপাতনে সিদ্ধ, অর্থাৎ ও-কথাটার ব্যুৎপত্তি নিয়মের ধার ধারে না।

(৪) সজাতি মানে সমজাতি, আর স্বজাতি নিজের জাতি। সুতরাং এখানে সজাতিই প্রশস্ত।

(৫) রবীন্দ্রনাথের নাটক সম্বন্ধে আমি যে-হঠোক্তি ক'রে ফেলেছি, তা মার্জ্জনার অতীত। "রবীন্দ্রনাথের নাটকমাত্রেই" বদলে "রবীন্দ্রনাথের বেশীর ভাগ নাটক" ক'রে দেবেন। "প্রায় নাটকমাত্রেই" চলবে না বোধহয়।

আমরা এখান থেকে সামনের রবিবার, অর্থাৎ ২১ তারিখে রওনা হবো। প্রুফ নিশ্চয়ই তার আগে পাওয়া যাবে না। সুতরাং কলকাতার ঠিকানাতেই পাঠাবেন।

"উক্তি ও উপলব্ধি" নামটা কি চলতে পারে? আর কিছুই মাথায় আসছে না উপস্থিত। ইতি ১৫ এপ্রিল ১৯৪৬

ভবদীয়
শ্রীসুধীন্দ্রনাথ দত্ত

৬ নং হুইট্
৬ রাসেল্ স্ট্রীট
কলিকাতা

প্রিয়বরেষু,

গত কাল সকালে কলকাতা পৌঁছেছি। আসার আগের দিন সন্ধ্যায় দময়ন্তী ও বিদেশিনী হস্তগত হয়েছিলো। কাজেই পাতা উল্টোনো ছাড়া আর কিছুর সময় পাইনি। তবে দময়ন্তীর অনেক কবিতার সঙ্গে আমি ইতিপূর্ব্বেই পরিচিত, যদিও প্রবন্ধটি আগে দেখেছি বলে মনে পড়ছে না। বিদেশিনী আমার কাছে সম্পূর্ণ নূতন; এবং উপর উপর দেখে মনে হলো আমি যাকে গজগুণ বলি, তার বিস্ময়কর প্রাচুর্য্য ওই কবিতাটিতে। অবশ্য কবিতা হিসাবে দময়ন্তীর একাধিক রচনাই রসোত্তীর্ণ; কিন্তু গদ্যের রীতি

সর্ব্বত্র হয়তো নিখুঁত ভাবে রক্ষিত হয়নি। তবে এ-অভিমত পল্লবগ্রাহীর হঠকারিতা; এবং না প'ড়ে সমালোচনার ধৃষ্টতা যদি মার্জ্জনা করেন, তাহলে বলবো যে দময়ন্তীর পরিশিষ্টে বাংলা ছন্দের প্রকৃতি সম্বন্ধে আপনি যে-রায় দিয়েছেন আমি তার সঙ্গে একমত নই। অন্তত পয়ারে যতিবিরহিত তিন অক্ষরে পর্ব্বরচনা আমার বিবেচনায় অসম্ভব; এবং ছড়ার ছন্দেও এর ব্যতিক্রম আমার কানে লাগে। তাছাড়া বাংলা ছন্দের পর্ব্ববিন্যাস অত্যধিক রকমের নিয়মিত—যেমন পয়ারের প্রথম পর্ব্বে চার চার বা তিন তিন দুই চলে, কিন্তু দুই তিন তিন একেবারেই অচল, তাতে ছন্দের প্রকৃতি বদলে যায়; এবং "মাধবী-লতা-বিতানে"-র বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ক'রে রবীন্দ্রনাথকে রাগিয়ে দিয়েছিলুম। ইংরেজি ছন্দে এতটা বাঁধা ধরা নেই; এবং একটা পদে পাঁচটা স্বরাঘাত পড়লে, সমস্ত পদের মাত্রাপরিমাণে দু-এক অক্ষর (অর্থাৎ syllable) কম বেশি হলেও ছন্দটাকে pentametre ব'লেই মনে হয়। কিন্তু এ-বিষয়ে আজ আর বাক্যব্যয় করবো না; কারণ এ-চিঠির উদ্দেশ্য বই দুখানির প্রাপ্তিস্বীকার ও আপনাকে ধন্যবাদজ্ঞাপন। সুতরাং তর্কটা উপস্থিত তোলা রইল, সাক্ষাতে আবার আরম্ভ করা যাবে। ইতিমধ্যে মেনে নিচ্ছি যে আঙ্গিকের প্রতি বেশি দৃষ্টি দিলে রচনার প্রাণহানি এক রকম অনিবার্য্য। কিন্তু আমার যে-সব কবিতা এ পর্য্যন্ত পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়েছে, সেগুলোর "কবিয়ানা" প্রাণশক্তির পরিচায়ক নয়, রীতি-বিচারের অভাবজনিত। সে-সমস্ত কবিতাই ১৯৩২-এর আগে লেখা; তখনো পর্য্যন্ত মোরে ইত্যাদি বাঁচিয়ে চলার প্রয়োজন বোধ করিনি অথবা ক্ষমতা অর্জ্জন করিনি; এবং বই ছাপার সময়ে এ-দিকে যদিও সচেতন হয়েছিলুম, তবু খোল নলচে না বদলে কবিতাগুলোর সংস্কার সম্ভব হয়নি।

যাক সে-কথা। আশা করি আপনার সঙ্গে অবিলম্বে দেখা হবে। যদি অন্য কাজে ব্যস্ত না থাকেন, তাহলে শুক্রবার এখানে চা খেতে আসবেন কি? আমি অফিস থেকে ফিরি সাড়ে পাঁচটা আন্দাজ। ইতি ২৩ এপ্রিল ১৯৪৬

ভবদীয়
শ্রীসুধীন্দ্রনাথ দত্ত

৬ নং হুইট্
৬ রাসেল্ স্ট্রীট্
কলিকাতা

প্রিয়বরেষু,

আপনার চিঠি পেয়ে খুব খুশী হলুম, যদিও পারিবারিক অস্বাস্থ্যের খবর মোটেই ভালো লাগলো না। একটুখানি সময় করতে পারলেই, আপনাদের ওখানে যাবো; কিন্তু সম্প্রতি অত্যন্ত ব্যস্ত আছি। সুতরাং এ পর্য্যন্ত লেখার কথা ভাবতে পারিনি; এবং অচির ভবিষ্যতে ভাবতে পারলেও, ভাবনাকে কাজে আনতে পারবো ব'লে আশা নেই। তবু চেষ্টার ত্রুটি হবে না।

সে-দিন হঠাৎ মনে হলো যে ছড়ার ছন্দ আর পাঁচ মাত্রার ছন্দ এবং মধ্যে মধ্যে, খুব সাবধানে, স্বরাঘাতপ্রধান, হলন্তাক্ষর-বহুল ছয় মাত্রার ছন্দ মিশিয়ে লিখলে হয়তো বা প্রাঁ রীথম্-এর অনুকরণ বাঙালীর পক্ষে সম্ভব। আপনি চেষ্টা ক'রে দেখুন না।

আশা করি এত দিনে রোগের উৎপাত বন্ধ হয়েছে। আপনারা দু জনে এক দিন এখানে এলে অনুগৃহীত হবো। ইতি ৭ জুলাই ১৯৪৬

ভবদীয়
শ্রীসুধীন্দ্রনাথ দত্ত

৬ নং হুইট্
৬ রাসেল্ স্ট্রীট্
কলিকাতা

প্রিয়বরেষু,

"নির্জন স্বাক্ষর" এইমাত্র শেষ হলো। আধ বেলা অফিস্ এবং স্নায়্যোয়তির নানা রকম উৎপাত সত্ত্বেও ২১১ পাতার উপন্যাস যখন এক দিনেই আত্মস্ত পড়ে ফেলেছি, তখন বইখানির সম্মোহিনী শক্তি যে প্রচুর তা বলাই বাহুল্য। সমাপ্তির সংযত কারুণ্য মনকে খুব দোলা দিয়েছে। শুরুও চমৎকার।

মাঝখানের খানিকটা, বিশেষত সোমেনের ডায়ারি, আমার তেমন ভালো লাগলো না। কারণ বোধহয় নায়কের প্রতি আমার "অনুকম্পা"র অভাব। তার আপাত-অসঙ্গতি অবশ্যই ইচ্ছাকৃত এবং চরিত্রস্ফূর্তির জন্যে আবশ্যিক। কিন্তু এক-আধ জায়গায় আরও একটা অসামঞ্জস্য যেন চোখে পড়লো। গয়নার বাক্স নেওয়ার দৃশ্যে সোমেনের মনস্তাত্ত্বিক দ্বৈধ যেমন বিশ্বাস্য, তার আগের পদচারণ তেমন নয়, অন্তত আমার কাছে। কিন্তু এ-রকম খুঁটিনাটির বিচার বইখানির মর্য্যাদালাঘব করতে পারে না। আসল কথা "নির্জন স্বাক্ষর" আমাকে অনেক আনন্দ দিয়েছে। ধন্যবাদ।

আমার অপারেশনের আগে আপনি যে-চিঠি দিয়েছিলেন, তার সম্বন্ধেও দু-একটা কথা এইখানে বলে নিই। "পথে"র ছন্দ অবশ্য প্রবহমাণ, কিন্তু পংক্তিগুলোকে ভেঙে তো পড়তেই হবে। "ওর ধূলিকণায় নিহিত যে-অস্থৈর্য্য" —এই রকম একটা চোদ্দ অক্ষরের লাইন, যার পাঠ—ওর ধূলি। কণায় নিহিত। যে-অস্থৈর্য্য॥ যুক্তাক্ষরে লাইন শেষ করতে অনেকের আপত্তি আছে; সুতরাং "অস্থৈর্য্যে"র স্থানে "অস্থিতি" করে দেবেন। "অনাগত ভবিষ্যতে সন্তানের অশ্বমেধ যাতে না পায় ভৌতিক বাধা"র পাঠ "অনাগত ভবিষ্যতে। সন্তানের অশ্বমেধ যাতে॥ না পায় ভৌতিক বাধা।" "অকস্মাৎ" পরবর্ত্তী পদের সঙ্গে গ্রাহ্য। "শুধু মুখচেনা॥ বান্ধবের। সুলভ সহানুভূতি॥"—দু পংক্তি, প্রথমটা ছয় মাত্রার, দ্বিতীয়টা বারোর। "যেখানে গোষ্পদে" ইত্যাদি—প্রথমে ছয়—যেখানে গোষ্পদে॥ তার পরে চার—কৃষ্ণসার॥ তার পরে চোদ্দ—আপনার প্রতিচ্ছবি। দেখে আর ভাবে॥—এই তিন লাইনের সমষ্টি, এবং "গৌরব জটিল শৃঙ্গে" পরবর্ত্তী পদের অংশ।

আশা করি উল্লিখিত পাঠ আপনার সমর্থন পাবে। ওতে যদি আপনার আপত্তি থাকে, তাহলে আবার সংশোধনের চেষ্টা করবো। সেইজন্যেই লেখাটা ছাপার আগে একটা প্রুফ দেখতে চাই। আমরাও ৪ অক্টোবর দেরাদুন যাচ্ছি, ফিরবো ২৬ তারিখে। ইতিমধ্যে প্রুফ সংশোধনের প্রয়োজন হলে আমাকে পাবেন—

c/o M. N. Roy, Esq.,
13, Mohini Road,
Dehra Dun. U. P.

আপনার শরীর ভালো নেই শুনে খারাপ লাগলো; আশা করি বায়ু-পরিবর্তনে স্বাস্থ্য ফিরে পাবেন। আমি অনেকটা শুধরেছি; কিন্তু ঘা এখনো সম্পূর্ণ শুকোয়নি।

প্রস্তু কেমন লাগলো? দ্বিতীয় ভাগ পড়ায় নিরুৎসাহ দেখে মনে হচ্ছে ভালো লাগেনি। কিন্তু প্রস্তের সঙ্গে সৌহার্দ্যস্থাপন চেষ্টাসাপেক্ষ; মনে আছে প্রথম এক শ পাতা পড়তে তিন বার থেমে গিয়েছিলুম।

ইংলণ্ডের সামাজিক ইতিহাস এখন আপনার কাছে থাক; আমার দরকার নেই।

আপনারা দুজনে আমাদের প্রীতিনমস্কার নেবেন। ইতি ২৮ সেপ্টেম্বর ১৯৫১

ভবদীয়
সুধীন্দ্রনাথ দত্ত

[৪]Damodar Valley Corporation[১]
Anderson House, Alipore
Calcutta-27

প্রিয়বরেষু,

আপনার ৪ তারিখের চিঠি পেয়ে খুবই খুশী হয়েছি। নানান দোষ সত্ত্বেও "যযাতি" আপনার কাছে নেহাৎ মন্দ লাগেনি, এটা আমার পক্ষে গৌরবের কথা। কিন্তু আমার বিশ্বাস বা অবিশ্বাস কবিতাটার উপলক্ষমাত্র—আঠারো-অক্ষর ছন্দের সঙ্গে আমার গদ্য রীতির সময়য়সাধনই ওটার মুখ্য উদ্দেশ্য; এবং সে-সন্ধতি যখন আপনার মতো সহৃদয় বিশেষজ্ঞও সর্বত্র ধরতে পারেননি, তখন প্রয়াস নিশ্চয়ই পণ্ড হয়েছে। তবু চেষ্টার কিছু পরিচয় দিই।

প্রথম স্তবকে আঠারো অক্ষরের পংক্তিকে বিবিধ আকারের পর্বে ভেঙে ছন্দঃস্পন্দন, অথবা রিথম্-এর বৈচিত্র্য আনতে চেয়েছিলুম; এবং দুটো পর পর পর্ব যাতে এক মাপের না হয়, সে-দিকে যেমন লক্ষ্য রেখেছিলুম, তেমনই

১ এই সময়ে সুধীন্দ্রনাথ দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশনে প্রচার-সচিবের কর্ম করছেন।

শ্রাব্য মিত্রাক্ষর যেন লাইনের শেষে এসে পাঠকের দৃষ্টি-আকর্ষণ না করে, সে-বিষয়ে উদাসীন থাকিনি। এ-স্তবকে বিরাম উক্ত অন্তরঙ্গ মিলের সঙ্গে সঙ্গে, এবং অতিপংক্তি পদের পরিমাপ চার থেকে আঠারো মাত্রা পর্যন্ত।

দ্বিতীয় স্তবকে চাক্ষুষ মিত্রাক্ষর যাতে কানে না পৌঁছয়, সে-চেষ্টায় বিরাম পর্ব-পর্বাঙ্গের অনুগামী; এবং সমস্ত স্ট্যাঞ্জার ঝোঁক প্রবাহের দিকে। তাছাড়া মাত্রাচ্ছন্দে রচিত প্রসঙ্গকে আক্ষরিক ছন্দে বসাতে চাইলে, মূলের কতখানি পরিবর্তন আবশ্যক, সে-সন্ধানও এ-স্তবকের অন্তর্গত; এবং তৃতীয় স্তবকের সমস্যা যদিও ছন্দোবদ্ধ অনুবাদের সমস্যা যার সমাধান অমিত্রাক্ষরের কল্যাণে অপেক্ষাকৃত সহজ হয়েছে, তবু এখানেও পর পর পদের মাত্রাভেদ আর পর্ব ও বিরামের ঐক্য বজায় রাখার প্রয়াস আছে।

চতুর্থ স্তবক প্রবহমাণ মিত্রাক্ষরে লেখা; কিন্তু মাঝে মাঝে অর্ধযতির হেরফের করা হয়েছে একটানা সুর এড়িয়ে যাবার জন্যে; এবং শেষ স্ট্যাঞ্জাতে পংক্তি ও পদ যেহেতু সমান মাপের, তাই তাতে মিল প্রধান। তাহলেও সেখানে পর্ববিন্যাসে অল্প-বিস্তর তারতম্য আছে; এবং আশা করি তৎসত্ত্বেও ছন্দের ধ্রুপদী রূপ ক্ষুণ্ণ নয়।

আসলে ছন্দোলিপিতে শৈথিল্য আমার অনভিপ্রেত; এবং আমি যেকালে গদ্য-পদ্যের প্রভেদ ঘোচাতে চাই ভাষার দিক থেকে—উভয় প্রকরণে শব্দ ও বাক্যবন্ধ এক রকম রেখে—তখন গদ্যের নিয়মে "যযাতি" পড়া যাবে না; প্রবহমাণ পদ্যের নিয়মেই প্রথম চার স্তবক পড়তে হবে। কিন্তু সার্থক কবিতা ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে না; এবং কবিতাটা আপনার হাতের কাছেও নেই যে কৈফিয়তের কতখানি তার সম্বন্ধে খাটে তা আপনি মিলিয়ে দেখবেন। অতএব এ-বিষয়ে আর কথা বাড়াবো না।

থার্মিমট্রুকে[১] কোনো লেখা আমি পাঠাইনি। কারণ এলিন হুপর-নাম্নী এক ভদ্রমহিলা আমাকে আগেই এট্‌ল্যান্টিক মন্থলির তরফ থেকে লেখা ও পরামর্শ চেয়ে চিঠি দিয়েছিলেন; এবং সে-পত্রের উত্তরে আপনার ও

১ নিউ ইয়র্ক-বাসী এই সিংহলী সাহিত্যিক সে-সময়ে আধুনিক ভারতীয় কবিতার ইংরেজি অনুবাদ-সংগ্রহে সচেষ্ট ছিলেন। তাঁর সংগৃহীত কিছু রচনা অবশেষে শিকাগোর Poetry পত্রিকার ভারতীয় সংখ্যায় (জানুয়ারি, ১৯৫৯) প্রকাশিত হয়।

আইয়ুবের[১] ঠিকানা আর আমার কবিতার গোটাকতক অনুবাদ তাঁর কাছে পাঠিয়েছি। থাম্বিমট্‌ুর প্রতি আরো কোনো কর্তব্য আছে কিনা বুঝতে পারছি না; হয়তো তাঁকে একখানা চিঠি দেবো, ব্যাপারটা বর্ণনা ক'রে।

দিলীপ গুপ্ত[২] "সংবর্তে"র অনুলিপি নিয়ে গেছেন, ২৫ বৈশাখের আগে বইখানা বার করবেন, অথবা বার করার চেষ্টা করবেন, এই রকম আশ্বাস দিয়ে। দেখা যাক কী হয়।

* * *

আশা করি ভালো আছেন। জুনে আপনার দেখা পাবার আশায় রইলুম।[৩] ইতি ৯ এপ্রিল ১৯৫৩

ভবদীয়
সুধীন্দ্রনাথ দত্ত

*Damodar Valley Corporation
Anderson House, Alipore
Calcutta-27

প্রিয়বরেষু,

আপনার ১৫ এপ্রিলের চিঠি এখনো বিনা উত্তরে পড়ে রয়েছে ব'লে আমি অত্যন্ত লজ্জিত। কিন্তু গত সাত-আট দিন ধ'রে এমনই ভীষণ গরম চলেছে যে কোনো কাজেই মন দিতে পারা যাচ্ছে না, অথচ নানা কর্তব্য জ'মে আছে।

যযাতি-সম্বন্ধে আপনি যা বলেছেন তার চেয়ে বেশী প্রশংসা আমি কখনো পাইনি, এবং অতটা প্রাপ্য কিনা, তাও সন্দেহ। কারণ ও লেখাটার পিছনে আছে মাত্র চার মাসের চেষ্টা, এবং রচনাটার কত দোষ শুধরতে পারিনি, তা আমি জানি। সে যাই হোক, ওর ছন্দ-সম্বন্ধে মুখোমুখি আলোচনা করা যাবে।

১ শ্রী আবু সয়ীদ আইয়ুব।
২ সিগনেট প্রেসের অন্যতর পরিচালক।
৩ পত্রপ্রাপক সে-সময়ে মহীশূরে ছিলেন।

রবীন্দ্রসপ্তাহে আমার সহযোগিতা চাইতে অরুণ সরকার[১] আমার সঙ্গে বার দুয়েক দেখা করেছেন। ঠিক এই সময়ে রবীন্দ্রনাথ-সম্পর্কে কোনো পাঠযোগ্য প্রবন্ধ লেখা আমার দ্বারা হয়ে উঠবে না; কারণ উপস্থিত আরো কিছু কবিতা লেখার বৃথা চেষ্টা করছি। তাই ৮ মের সভায় রবীন্দ্রকাব্য থেকে কিছু পড়ব ব'লে প্রতিশ্রুতি দিয়েছি। ভবিষ্যতে সুযোগ পেলে আপনার জন্যে প্রবন্ধ লেখার চেষ্টা করব।

থাম্বিমট্‌ুকে আপনার লেখা পাঠিয়েছেন জেনে নিশ্চিন্ত হলুম। আমি যে-ভদ্রমহিলাকে এই সম্পর্কে অনুবাদ পাঠিয়েছিলুম, তাঁর কাছ থেকে এখনও প্রাপ্তিস্বীকার পর্যন্ত আসেনি, লাফ্‌লিনের[২] কাছ থেকেও নয়। লেখাগুলো ডাকে হারিয়ে গেল নাকি?

আশা করি কুশলে আছেন। জুন মাসে আপনার সঙ্গে দেখা হবে—এই প্রত্যাশা ক'রে আছি। ইতি ২৪ এপ্রিল ১৯৫৩

ভবদীয়
সুধীন্দ্রনাথ দত্ত

৩ নং হুইট
৩ রাসেল স্ট্রীট্
কলিকাতা ১৬

প্রিয়বরেষু,

আমার বইয়ের দোকান চলে গজেন্দ্রগমনে: তারা পাঠাবার আগেই নাভানার কাছ থেকে "বুদ্ধদেব বসুর শ্রেষ্ঠ কবিতা" এসে পৌছল। সেই অবধি বইখানি নিয়ে কেবলই নাড়াচাড়া করছি: চেনা লেখা প'ড়ে প্রত্যাশিত বিস্ময়ে অভিভূত হচ্ছি; অপরিচিত রচনা জাগাচ্ছে অভূতপূর্ব আনন্দ। কোনো কোনো কবিতার মেজাজ হয়তো আমার সঙ্গে ঠিক মেলে না; এবং সেইজন্যেই আমার পক্ষে বোঝা সহজ আপনার কাব্য কতখানি উৎকৃষ্ট,

১ শ্রী অরুণকুমার সরকার, 'দূরের আকাশ' কাব্যগ্রন্থের প্রণেতা।
২ New Directions প্রকাশনীর স্বত্বাধিকারী James Laughlin।

আপনার সাধারণ সিদ্ধি কী রকম নিঃসংশয়। অর্থাৎ আপনার সৃষ্টি বিশুদ্ধ উপভোগের বস্তু; রবীন্দ্রনাথের মতো আপনিও—বুঝি আপনি একাই—পাঠকীয় অনুকম্পার ধার ধারেন না। মনে পড়ে আপনার একেবারে প্রথম যুগের কোন্ এক পুস্তক-সম্বন্ধে জনৈক বন্ধু আমার মতামত জানতে চাওয়ায় আমি তাঁকে বলেছিলুম যে সমসাময়িক বাংলায় আপনিই বোধহয় একমাত্র সহজ কবি। সেই দিন থেকে আজ পর্যন্ত আমার অধিকাংশ মত টিঁকে নেই; কিন্তু বর্তমান শ্রেষ্ঠ কবিতায় ওই একটা মন্তব্য নূতন ক'রে সমর্থন পেল। গ্রন্থ-কর্তাকে তাই ধন্যবাদ দিচ্ছি; প্রকাশককেও গ্রন্থখানির সর্বাঙ্গসুন্দর কলেবরের জন্যে।

আপনার কুশলকামনা করি: আপনার সার্থক লেখনী যেন আরও অনেক বৎসর ধ'রে স্বচ্ছন্দে চলে। ইতি ১ মে ১৯৫৩

ভবদীয়
সুধীন্দ্রনাথ দত্ত

*Damodar Valley Corporation
Anderson House, Alipore
Calcutta 27

প্রিয়বরেষু,

আপনার চিঠি পেয়ে খুব খুশী হলুম।

প্রেরণা-সম্বন্ধে আমার মতামত একাধিক প্রবন্ধে ইতিপূর্বে লিপিবদ্ধ করেছি, এবং ও-বিষয়ে আমার বর্তমান বক্তব্য 'অর্কেস্ট্রা'র ভূমিকায় রয়েছে। কাজেই ও-প্রসঙ্গে এখানে এইটুকু বলাই যথেষ্ট যে আমাদের আয়ত্তের বাইরে একটা কিছু ঘটে যার ফলে আমরা কবিতা লিখতে প্রবৃত্ত হই; কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সার্থক কবিতার বাকী সমস্তটা ব্যক্তিগত সংকল্পের প্রয়োগসাপেক্ষ, যদিও অনেক কবির বেলা—যেমন রবীন্দ্রনাথ বা আপনি—এই চেষ্টার কালপরিমাণ অল্প। তার কারণ বোধহয় আপনার মতো লেখকের মানসজীবনে কবিতাই সর্বাগ্রগণ্য—অর্থাৎ আপনি বা রবীন্দ্রনাথ অজ্ঞানত

সব সময়েই কাব্যরচনায় ব্যস্ত, এবং সেই জন্যে যখন কাগজ-কলম নিয়ে আপনারা স্পষ্টত লিখতে বসেন, তখন মনে হয় আপনাদের লেখনী যেন তৈরী লেখা লিখে যাচ্ছে।

এই রকমের ঐকান্তিক সাধনাকে প্রেরণা বলা ভাষাব্যবহারে অসতর্কতার পরিচায়ক; এবং সাধারণ পাঠকের কাছে যে-কবিতা স্বচ্ছন্দ লাগে, তা প্রায়ই স্মৃতিশক্তির সাহায্যে লিখিত—অর্থাৎ চর্বিতচর্বণের নিদর্শন, স্বকীয় উপলব্ধির সাক্ষ্য নয়। ওই জাতীয় স্বাচ্ছন্দ্যে আমার আর লোভ নেই, যদিও প্রথম প্রথম ওর অভাব নিজের মধ্যে লক্ষ্য ক'রে আমি খুবই মুষড়ে পড়েছিলুম। সম্প্রতি নিজের লেখা কেবলই নেড়ে চেড়ে বুঝেছি যে যথার্থ রসোত্তীর্ণ লেখা আজও আমার হাত দিয়ে বেরোয়নি। তৎসত্ত্বেও এখন আমার ধিক্কারবোধ খানিকটা কমেছে, কারণ, আর কিছু না হোক, অন্তত গত পনেরো বছর ধরে চেষ্টা করছি যাতে উপলব্ধির নিজস্বে দাঁড়াতে পারি।

থাক সে-কথা। 'সংবর্তে'-র সাজ-সজ্জা সম্বন্ধে আপনার সঙ্গে আমি একমত। কিন্তু বইখানাকে সুদৃশ্য করার জন্যে দিলীপ গুপ্ত মহাশয় কত সময় ব্যয় করেছেন, তা আমি জানি; তাই এ-সম্বন্ধে আমার রুচিকে বেশী প্রশ্রয় দিইনি। তাছাড়া বর্তমান জ্যাকেট আমার দু-একজন রুচিবাগীশ বন্ধুর ভালো লেগেছে দেখে নিজের আপত্তিকে বাড়াতে ভয় পেয়েছি। মলাটে কবিপরিচিতি না থাকলেই আমি স্বস্তিবোধ করতুম। কিন্তু ওখানেও শ্রমবিভাগের কথা ওঠে, এবং আমি শুধু বইখানার বিষয়বস্তুর জন্যেই দায়ী—অন্তত যেখানে পুস্তকপ্রকাশ সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যবসা সেখানে তা-ই নিয়ম।

সাইক্লোনের যে-অনুবাদ[১] আপনি পাণ্ডুলিপিতে দেখেছেন, তা আজও কোথাও বেরোয়নি; কিন্তু আইনত লংম্যানসই নাকি তার স্বত্বাধিকারী। সুতরাং তাঁদের লিখিত অনুমতি নিয়েই লেখাটা ছাপবেন, নচেৎ তাঁরা পরে আপনাকে বেগ দিতে পারেন।

"অর্কেস্ট্রা"র পাণ্ডুলিপি ফিরে পাবার জন্যে এমন কিছু তাড়া নেই।

১ 'নগত' কবিতার 'The Cyclone' শীর্ষক ইংরেজি অনুবাদের কথা বলা হচ্ছে।

আপনার পড়া হয়ে গেলে চিঠি দেবেন, আমি গিয়ে কপি ফিরৎ আনব আর আপনার মতামত শুনে আসব।

আশা করি আপনারা কুশলে আছেন। ইতি ৩ জুলাই '৫৩

ভবদীয়
সুধীন্দ্রনাথ দত্ত

c/o Prof. Edward Shils,
The University of Chicago,
Social Science Research Bldg.,
1126 East 59th Street
Chicago 37. Illinois, U. S. A.

প্রিয়বরেষু,

গত হপ্তায় "মেঘদূত" পেয়েছি। কতখানি ভালো লেগেছে, তা লিখে বোঝানো শক্ত। ছাপা, বাঁধাই, ছবি, কাগজ, সবই সুন্দর; এবং যা পাঠ্য তা আগাগোড়া বিস্ময়কর রকমের উৎকৃষ্ট। বাংলা ভাষায় আপনি আর একটা কীর্তি স্থাপন করলেন। ভূমিকার সঙ্গে আমার মত হয়তো সর্বত্র এক নয়; কিন্তু সে নিয়ে বাক্যব্যয়ের জায়গা এটা নয়। কোনও দিন যদি কলম আবার চলে, তাহলে আমার আপত্তি কোথায় ও কেন, তা বোঝাবার প্রয়াস পাব। ইতিমধ্যে আপনার কবিত্ব ও পাণ্ডিত্যকে অভিনন্দন জানিয়ে রাখছি। প্রথম প্রকাশের পরে গদ্যে ও পদ্যে যে-পরিবর্তন করেছেন—অন্ততঃপক্ষে যেগুলোকে পরিবর্তন ব'লে মনে হলো, সে-সমস্তই সার্থক লাগল।

আপনার বোদলেয়র অনুবাদের ছাপা কত দূর এগোল? আর কি লিখছেন? যাদবপুরের খবর কি?[১] বন্ধুরা কেমন আছেন? জাহাজ থেকে রুমিকে[২] যে-পোস্টকার্ড পাঠিয়েছিলুম তা তার হাতে পৌঁছেছে আশা করি।

১ যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা বলা হচ্ছে; এই প্রবাসের কাল বাদ দিয়ে, ১৯৫৬ থেকে মৃত্যুকাল পর্যন্ত সুধীন্দ্রনাথ সেখানে অধ্যাপনা করেন।
২ শ্রীমতী দময়ন্তী বসু: পত্রপ্রাপকের দ্বিতীয়া কন্যা।

সে ভালো আছে তো? আর অন্যেরা? মিমিদের[১] বাড়িতে অসুখ-বিসুখের পালা এত দিনে নিশ্চয়ই শেষ হয়েছে।

এখানে বিশ্ববিদ্যালয়ের সকলে আমাদের খুব সমাদর করছেন; এবং হয়তো সেই জন্য, কোনও কর্তব্য না থাকা সত্ত্বেও, লেখা-পড়ার সুযোগ এখনও পাচ্ছি না। কিন্তু পনেরো দিন হোটেলে থাকার পরে যে-বাসা জুটেছে, সেটা মোটেই খারাপ নয়। শীতও অপেক্ষাকৃত কম, যদিও মাঝে মাঝে আকাশে বাতাসে হিমের আভাস ইতিমধ্যেই পাওয়া গেছে। বড় দিনের ছুটিতে হয়তো ওয়াশিংটন্ ও ন্যু য়র্ক্ যাওয়া যাবে; কিন্তু এখনও কিছু ঠিক করিনি—ছ-মাস-ব্যাপী ভ্রমণের অবসাদ আজও বোধহয় পুরোপুরি কাটেনি।

চিঠি আর বাড়াব না। সময় পেলে জবাব দেবেন। প্রতিভা দেবীকে আপনার মারফৎ প্রীতিনমস্কার জানাচ্ছি; ছেলে-মেয়েদের আর জ্যোতিকে[২] আমাদের সাদর সম্ভাষণ। ইতি ২৯ নভেম্বর ১৯৫৭

স্নেহার্থী
সুধীন্দ্রনাথ দত্ত

c/o Prof. Edward Shils,
The University of Chicago,
Social Science Research Bldg.
1126 East 59th Street,
Chicago 37. Illinois.

প্রিয়বরেষু,

* * *

আমরা আরও এক বছর বিদেশে থাকছি—এ-গুজব কোথা থেকে ছড়াল? অবশ্য দেশের যে-খবর মধ্যে মধ্যে পাই, তাতে ঘরে ফেরার জন্যে উৎসুক হওয়া শক্ত। কিন্তু ভারত থেকে টাকার রপ্তানি একেবারেই বন্ধ। সুতরাং প্রবাসের মেয়াদ বাড়াই কী ক'রে? অন্ততঃপক্ষে আজ পর্যন্ত এই

১ শ্রীমতী মীনাক্ষী দত্ত: পত্রপ্রাপকের প্রথমা কন্যা।
২ শ্রীজ্যোতির্ময় দত্ত: তরুণ কবি, পত্রপ্রাপকের জামাতা।

ব্যবস্থাই ঠিক আছে যে আগামী ৩০ নভেম্বর জেনোয়া থেকে বাড়ি যাবার জাহাজ ধরব ; অর্থাৎ ডিসেম্বরের মাঝ বরাবর আবার আমাদের উপদ্রব শুরু হবে কলকাতায়[১] ; এবং তখন যদি যাদবপুরে আমার ফেরা দরকার মনে করেন, তবে আমার দিকে কোনও বাধা থাকবে না, বরঞ্চ উৎসাহ আর গর্ব দেখবেন। কারণ আপনাদের সঙ্গে কাজ ক'রে আনন্দ পেয়েছি প্রচুর ; এবং সে-কাজ চালাতে পারলে আর কারও উপকার না হোক, আমার অনেক উপকার হবে।

শিকাগোর পালা ফুরিয়ে আসছে। হ্যু য়র্ক্ থেকে আমাদের জাহাজ ছাড়বে ২৬ জুলাই। কিন্তু জুনের তৃতীয় হপ্তা পর্যন্ত একটা সম্মেলনে উপস্থিত থাকতে হবে সেই অঞ্চলে। তাই এক রকম স্থির করেছি যে মে মাসের শেষে এখান থেকে সংসার গুটাব ; এবং ইচ্ছা আছে যে আঁথেরের পাঁচ হপ্তা কাটাব ঘুরে বেড়িয়ে। তবে ইতিমধ্যেই এখানকার আবহাওয়া ফাল্গুন মাসের কলকাতাকে মনে পড়িয়ে দিচ্ছে ; এবং তাত সওয়া আর আমার সাধ্যে কুলায় না। তাহলেও ভালোই আছি ; এবং গত মাস দেড়েক কাজও করেছি বেশ খানিকটা—শিল্‌স্-এর[২] প্ররোচনায় ইংরেজীতে আত্মজীবনী লেখার চেষ্টায়।

আশা করি আপনারা সকলে কুশলে আছেন। আপনার স্ত্রী, পুত্র ও কন্যাদের আর জ্যোতিকে আমার সাদর সম্ভাষণ জানাবেন। ছাত্রদের খবর কী? পরীক্ষার জন্যে তারা তৈরী তো? নরেশ[৩] ও তাঁর পরিবারবর্গ কেমন আছেন? আইয়ুব ও অম্লানের কাগজ[৪] আপনার পছন্দ হয়েছে? ইতি ১৯ এপ্রিল ১৯৫৮

স্নেহার্থী
সুধীন্দ্র

১ বস্তুত, সুধীন্দ্রনাথ প্রবাস থেকে ফেরেন ১৯৫৯, সেপ্টেম্বর মাসের শেষভাগে।
২ শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক Edward Shils।
৩ শ্রী নরেশ গুহ, 'দুরন্ত দুপুর' কাব্যগ্রন্থের প্রণেতা।
৪ শ্রী আবু সয়ীদ আইয়ুব ও শ্রী অম্লান দত্ত -সম্পাদিত ইংরেজি ত্রৈমাসিক, 'Quest'।

বাংলা কবিতা ও সুধীন্দ্রনাথ দত্ত

জ্যোতির্ময় দত্ত

ক্ষীণকায় না হোক, এক নিস্তেজ সাহিত্য। গদ্যের তখনো সৃষ্টি হয়নি। একদিকে পয়ার চোদ্দ মাত্রার শেকলে বাঁধা, অন্যদিকে মাত্রাবৃত্তের গড়ন অনির্দিষ্ট। অনুবাদ? অনুবাদ নয়, সংস্কৃত সাহিত্যের বিশ্বচেতনা বাংলা ভাবানুবাদের মধ্যে প্রাদেশিক খণ্ডরূপ ধারণ করেছিলো। আছে বটে প্রাত্যহিক জীবনের এক উজ্জ্বল মুকুর—কবিকঙ্কণের চণ্ডীমঙ্গল। কিন্তু হাজার বছরের সাহিত্যসৃষ্টির এই কি যথেষ্ট ফল? আর বৈষ্ণব কবিতা? ভবিষ্যৎ গৌরবের সেই প্রথম উদ্ভাস? সত্য বটে, বৈষ্ণব কবিগণ যতগুলি ভালো কবিতা লিখেছিলেন, রবীন্দ্রপূর্ব অর্ধ-সহস্র বছরে অন্যান্য বাঙালী কবিরা সমবেতভাবে ততগুলি উত্তম কবিতা রচনা করেননি। কিন্তু বৈষ্ণব কবিতার রীতি ও বিষয়ে বৈচিত্র্যের অভাব ছিলো ; এবং যেমন শুধুমাত্র সন্দেশ দিয়ে ভোজ হয় না, তেমনি শুধুমাত্র গীতিকবিতা এবং অতিরঞ্জিত জীবনচরিতের সমষ্টিকে সাবালক সাহিত্য বলা সম্ভব নয়।

এই ভাষায়, এই দরিদ্র বাংলাভাষায়, এক শতকের মধ্যে যে-বিপ্লব সাধিত হ'লো তার তুলনীয় ঘটনা বিশ্বসাহিত্যে বিরল। একটি বিপ্লব নয়, বিপ্লবের পর বিপ্লব, পরিবর্তনের তরঙ্গের পর তরঙ্গ বাংলা সাহিত্যের রূপ কয়েক দশকের মধ্যে একেবারে বদলে দিলো। এই বিপ্লবী শতকের আদি কবি মধুসূদনকে আমরা বোদলেয়ারের সমকালীন ব'লে কল্পনা করতে পারি না ; তাঁর সনেটে যে-মনের প্রকাশ, তা সারে বা ওয়াটের সমধর্মী। রবীন্দ্রনাথ আমাদের সাহিত্যে যে-বিপুল পরিবর্তন এনেছিলেন তার অন্যতম ফল এই যে পররর্তী কবিরা অনায়াসে বিশ শতকে প্রবেশ করলেন ; আমাদের বিশ শতক আর য়োরোপের বিশ শতকের মধ্যে কোনো কালগত ব্যবধান রইলো না। জীবনানন্দ, অথবা বুদ্ধদেব বসু, অথবা বিষ্ণু দে, সকল অর্থেই ইয়েটস, কিংবা ব্রিঙ্কে, কিংবা পোল এলুয়ারের সমসাময়িক। অর্থাৎ, এই একশো বছরে বাংলা কবিতা পাঁচশো বছরের পথ অতিক্রম করলো, এবং এক-এক পুরুষের অভিজ্ঞতা এক-এক দশকের মধ্যে আত্মস্থ করতে হ'লো বাঙালী কবিকে।

যে-সকল বিপ্লবের দ্বারা আমাদের সাহিত্যের এই রূপান্তর সাধিত হ'লো তার একটির নায়ক সুধীন্দ্রনাথ দত্ত। এই বিপ্লবের এমনকি নামকরণ এখনো হয়নি এবং, আজও সেই বিপ্লবের প্রতিধ্বনি আমাদের সাহিত্যে অনুরণিত হচ্ছে ব'লে, তার ফলাফল ঠিক এই মুহূর্তে অনির্ণেয়। তাছাড়া, আরো কয়েকটি বিপ্লব একই সঙ্গে সংঘটিত হয়েছিলো। এদের একটির সঙ্গে অন্যটি এমনভাবে জড়িত হ'য়ে গেছে, এবং এই যৌথ আন্দোলন চারদিকে এমনই সাড়া তুলেছিলো যে আজও আমরা শুধু বিস্মিতই হ'তে পারি, বিশ্লেষণ করতে পারি না। অল্প ভাষায় যে-সকল পরিবর্তন পর-পর ঘটে, আমাদের ভাগ্যে তা সাধিত হয়েছিলো একযোগে। এত দ্রুত এই সকল পরিবর্তন, এবং এমন বিচিত্র—এমনকি পরস্পরবিরোধী—এদের ফল যে আজকের পাঠক রবীন্দ্রোত্তর কবিদের মধ্যে কোনো সামান্য লক্ষণ আবিষ্কার করতে গিয়ে দিশেহারা হন। "ক্লাসিসিস্ট" সুধীন্দ্রনাথ ও "মিষ্টিক" জীবনানন্দ, "জনসমুদ্রের কবি" বিষ্ণু দে এবং "গজদন্তমিনারবাসী" বুদ্ধদেব বসু, আন্তিক অমিয় চক্রবর্তী ও সংশয়ী সমর সেন—আধুনিকতা-নামক একটিমাত্র বৃক্ষে যেন একই সঙ্গে সর্ব প্রকারের ও সর্ব ঋতুর ফল ফলেছিলো। সামান্য লক্ষণ? সামান্য লক্ষণ তো দূরের কথা, সেই আলোড়নের ধুলোয় বাতাস এমন আচ্ছন্ন ছিলো যে এঁদের মধ্যে স্পষ্টতম সম্পর্কগুলিও আবিষ্কার করা এতকাল সম্ভব হয়নি।

ধীরে-ধীরে বাতাস শান্ত হচ্ছে; দূরে স'রে যাচ্ছে সেই আশ্চর্য যুগ; মৃত্যু, এবং মৃত্যুর চেয়েও নিষ্ঠুর বন্ধ্যত্ব, এবং বন্ধ্যত্বের চেয়েও শোকাবহ, রাষ্ট্রের হিম পৃষ্ঠপোষকতা আর সমাজের বিবেকনাশক স্বীকৃতি, একে-একে গ্রহণ করছে সেই সব উজ্জ্বল পুরুষদের, যাঁরা বাংলা সাহিত্যকে এমন এক চূড়ায় টেনে নিয়ে গিয়েছিলেন যেখান থেকে, অনেকের মতে, আর নাকি উপরে ওঠা যায় না, সম্ভব নাকি শুধু অধঃপাত। যেমন দীর্ঘ ছয় মাস বৃষ্টির পর, শরতের প্রথম রাত্রে হঠাৎ নির্মল আকাশের দিকে তাকিয়ে আমরা বৈশাখের পুরোনো নক্ষত্রের অধিকাংশকে আর খুঁজে পাই না, আজ আমাদের সাহিত্যলোকে একের পর এক আসন শুধু শূন্য হচ্ছে। গত কয়েক বছর এক দীর্ঘ শোকযাত্রার মতো মনে হয় আমার, যে-শোকযাত্রার আরম্ভ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ও তারপর জীবনানন্দের মৃত্যুতে—যে-জীবনানন্দ আমার, এবং আমার মতো

আরো অনেক তরুণের চোখে শুধুমাত্র বিশ শতকের একজন শ্রেষ্ঠ বাঙালী কবি নন, যিনি আমাদের হৃদয়ের সখা, এবং কবিতার গুরু, হায়, যে-গুরুকে আমি চোখে দেখিনি কোনোদিন—এবং যে শোকযাত্রার পরিণতি—সুধীন্দ্রনাথের মৃত্যু।

সৌভাগ্যক্রমে, সুধীন্দ্রনাথের দেবতুল্য ক্ষণ আমি দেখেছি। আমার পরিচিত এক দর্শনশাস্ত্রে পারদর্শী মহিলা—যাঁর মনে কাব্যিকতার লেশমাত্র নেই, আর যিনি অলৌকিক তো দূরের কথা, যা-কিছু অপ্রত্যক্ষ তার অস্তিত্ব সম্পর্কে কূট প্রশ্ন তোলেন—বালিকাবয়সে রবীন্দ্রনাথকে দেখে 'রাজা' ব'লে চীৎকার ক'রে উঠেছিলেন। এবং, বহু বর্ষ পরে, প্রমথ চৌধুরীকে ঘরে ঢুকতে দেখে, ছুটে গিয়ে তিনি তাঁর পিতাকে জানান যে সেই "রাজা"—অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথ—এসেছেন। প্রমথ চৌধুরীর পরনে সেই বিশ্ববিখ্যাত জোব্বা ছিলো না, ছিলো না আলম্বিত কেশ বা শুভ্র শ্মশ্রুদাম, কোনো প্রত্যক্ষ কারণেই তাঁকে রবীন্দ্রনাথ ব'লে ভুল করা সম্ভব ছিলো না, কিন্তু সেই বালিকার অন্তরিন্দ্রিয়—যা তখন পর্যন্ত দার্শনিক কুটিলতায় চাপা পড়েনি—ঐ দুই ভিন্নরূপ মানুষের মধ্যে আবিষ্কার করেছিলো তাঁদের সাধারণ লক্ষণ—শরীরের প্রতি ভঙ্গিতে প্রতিভার আভা। বর্তমান প্রাবন্ধিকেরও সুধীন্দ্রনাথকে প্রথম বার দেখে—এত আপাতিক বৈসাদৃশ্য সত্ত্বেও—বারে-বারে রবীন্দ্রনাথের কথা মনে পড়েছিলো। আমার এমন মনে হওয়ার একটাই কারণ ভাবতে পারি: যা-কিছু দৈব প্রভায় উজ্জ্বল, শক্তির অনায়াস লীলায় স্ফুরিত, অর্থাৎ যা-কিছুর মধ্যে আপোলোত্ব বা ইন্দ্রত্বের আভাস আছে—বাঙালীজাতির চিত্তে তার প্রতীক রবীন্দ্রনাথ। এবং সুধীন্দ্রনাথকে প্রথম দেখে চোখে লাগতো আলোকের ঝলক, রোমরাজির উপর ব'য়ে যেতো স্বাস্থ্যের বাতাস, হৃদয়ে অনুভূত হ'তো অক্লেশ প্রতিভার অনুকম্পন। রবীন্দ্রনাথের মতো তিনিও ছিলেন দৈবাঢ্যকুল্যে অভিষিক্ত; যদিও তাঁর কাব্যে তিনি তাঁর ইন্দ্রত্বকে পরিহারক্করেছিলেন। এবং, যদিও কোনো-কোনো বিরল মুহূর্তে অন্য কোনো দেবতার কালো ছায়া তাঁর মুখের উপর পতিত হ'তে দেখেছি, অধিকাংশ সময় আপোলোর স্বর্ণচ্ছটা তাঁকে ঘিরে থাকতো। জীবনানন্দের যে-একটি ছবি আমি দেখেছি তা এক বিস্মিত এবং ধ্যানস্থ প্রেমিকের, যিনি এই

জগৎরূপ নিষ্টুরা ও মোহিনী প্রেমিকার দিকে অপলক নেত্রে তাকিয়ে আছেন। হাসি নয়, বিহ্বলতার আভাস তাঁর অধরে। আর, সুধীন্দ্রনাথের প্রত্যেকটি ছবিতে ধরা পড়েছে এক ইন্দ্রকান্ত সুখী পুরুষ ; অধিকাংশ ছবিতেই তাঁর মুখ হাস্যময়, যেন তাঁর উচ্চ আসন থেকে মানুষ নামক এক মর্কটশাবকের দেবানুকারী ক্রীড়াকলাপ দেখে তিনি কৌতুক অনুভব করছেন।

অবশ্য, মানুষ কিংবা পৃথিবী সম্পর্কে তাঁর গোপন ধারণা যা-ই হোক, অপর মানুষের পক্ষে তাঁর সঙ্গ ছিলো পরম প্রীতিকর। এমন অনেক সন্ধ্যা গেছে—তার অনুরূপ কোনো সন্ধ্যা আর আসবে না!—যখন তাঁর সঙ্গের জন্য অহিফেনসেবীর মতো অলঙ্ঘনীয় আকর্ষণ অনুভব করেছি। অন্তত প্রকাশ্যে, তিনি ছিলেন সদাহাস্যময়, এবং তাঁর হাসি এমন সংক্রামক ছিলো যে কৃষ্ণপক্ষের চন্দ্রের মতো মলিন মুখও ঐ সূর্যের পরিমণ্ডলে প্রবেশ করা মাত্র উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠতো। রবীন্দ্রনাথের একমাত্র দৌহিত্রের মৃত্যুসংবাদ যে-দিন পৌঁছলো, সে-রাত্রে তিনি এক পূর্ব-নিমন্ত্রিত বিদেশী আতিথিকে ভোজ-সভায় সঙ্গদান করেন, কিন্তু মুহূর্তের জন্যেও ভদ্রলোকটি সন্দেহ করতে পারেননি যে সেদিনই রবীন্দ্রনাথের জীবনে কী নিদারুণ বিপর্যয় ঘ'টে গেছে। সুধীন্দ্রনাথের উচ্চতান সুখকেও, সুখ নয়, সুসভ্য সংযম ব'লে মনে করি। তিনি যদিও জানতেন যে প্রলয় আসন্ন তবুও ডুবন্ত জাহাজের অধ্যক্ষের মতো স্থিরচিত্তে প্রত্যেকটি আচার-অনুষ্ঠান পালন করাটাকে, উচিত না হোক, সুরুচি ব'লে মনে করতেন। বধ্যভূমিতে সংযম ও বীরত্বের প্রয়োজন ফুরিয়ে যায় না ; বরং একমাত্র ফাঁসির মঞ্চেই দণ্ডিত ব্যক্তির হাসি অর্থপূর্ণ। কবি সুধীন্দ্রনাথ তো বটেই, মানুষ সুধীন্দ্রনাথও যে-ব্রহ্মাণ্ডকে অর্থহীন ভেবেছিলেন, তার সঙ্গে কোনো সন্ধিস্থাপন তিনি করেননি। তাঁর সামাজিকতা, তাঁর অবিদ্রোহ, তা-ই এই হৃদয়-ও-নিয়মহীন জগতের বিরুদ্ধে প্রচণ্ডতম বিদ্রোহ—প্রচণ্ডতম, কারণ এর মধ্যে মৃত ঈশ্বরের উদ্দেশে প্রার্থনা নেই, ক্রন্দন নেই, আছে শুধু এই জগতের অসীমতার সঙ্গে প্রতিযোগিতার উপযোগী সাহস। প্রকৃতির কোথাও কোনো ভব্যতার বালাই নেই ; বাঘ যখন হরিণীকে আক্রমণ করে তখন সে বলে না আমায় আপনি ক্ষমা করুন ; শুধু মানুষ কৃত্রিম আচারের মধ্য দিয়ে স্বভাবকে বুদ্ধির বশবর্তী করেছে। জগতে সব-কিছু আসলে বিশৃঙ্খল ; বন্ধন আছে,

কিন্তু অর্থ নেই, বরফ গ'লে জল হয় কারো সুচিন্তিত উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে ব'লে নয়, বরফ তার প্রকৃতি অতিক্রম করতে পারে না ব'লে। প্রথানির্দিষ্ট, সুশৃঙ্খল, ছন্দোবদ্ধ, মিলযুক্ত, অবিদ্রোহী কবিতা জগতের বিপরীত, কেননা কবিতায় নিয়ম উদ্দেশ্যময়। জগতের সব-কিছুই যে আকস্মিক, যেন তারই প্রত্যুত্তরে সুধীন্দ্রনাথ তাঁর জীবনের সব-কিছুই সুচিন্তিতভাবে নির্মাণ করেছিলেন।

মানুষের রচনাশক্তিকে তিনি কি অতিরিক্ত মূল্য দিয়েছিলেন? সত্যই জগৎ যদি অর্থহীন হয়, তবে মানুষ কী ভাবে জগৎকে অর্থদান করতে পারে? আর যদিই বা সে পারে, তাহ'লে কি এই প্রমাণ হয় না যে জগৎ অর্থপূর্ণ কারণ মানুষ জগতেরই অংশ? সুধীন্দ্রনাথের কাব্য সম্পর্কে এই সকল কূট প্রশ্ন আবু সয়ীদ আইয়ুব উত্থাপন করেছেন। আশ্চর্য এই যে সুধীন্দ্রনাথের কবিতা পাঠকালে এই সকল প্রশ্ন—যা মানতেই হবে প্রণিধানযোগ্য—আমাদের বিন্দুমাত্র চিন্তিত করে না। যে-বিপুল সংগঠনপ্রতিভা 'অর্কেস্ট্রা'র মতো কবিতাকে সংহত করতে পারে তা ঐশ্বরিক ব'লে মনে হয়। হ্যাঁ, আমরা বলতে বাধ্য হই, এই ক্ষমতার দ্বারা সবই সম্ভব, এমনকি জগৎ-নামক হিম শবে প্রাণদানও সম্ভব।

সুধীন্দ্রনাথের গঠনপ্রতিভা সামান্য এক ভোজসভাকেও এক শিল্পকর্মে পরিণত করতে পারতো ; যেমন সকারণে পংক্তির পর পংক্তি কবিতায় গ্রথিত করতেন তেমনি সুকৌশলে তিনি অতিথিদের পংক্তিনির্দেশ ক'রে দিতেন ; বিরোধী চিত্রকল্পের মতো ভিন্ন চরিত্রের ব্যক্তিদের একত্র করতেন ; এবং কথার লতন্তে নিবন্ত হ'লে তাকে উস্কে দিতেন—কবিতায় এক বিস্ময়কর মিলের মতো—এমন কোনো অপ্রত্যাশিত কথা ব'লে, উপস্থিত ব্যক্তিরা সসম্বরে যার প্রতিবাদ না-ক'রে পারতেন না, কিন্তু শেষ পর্যন্ত যাকে যথাযথ ব'লে স্বীকার করতে বাধ্য হতেন। এবং যে-সাহিত্যিক বিপ্লবের তিনি নায়কত্ব করেন তার গতিও একান্তভাবে তাঁরই দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়েছিলো। "পরিচয়"-সম্পাদক সুধীন্দ্রনাথ বিভিন্ন সূত্রে প্রাপ্ত রচনাকে শুধু একত্র করতেন না, আসলে তিনিই ছিলেন রচয়িতা, অপর লেখকেরা এই স্থপতির হাতে মাল-মশলা জুগিয়ে দিয়েছিলেন মাত্র। "কল্লোল" ও "পরিচয়"-এর মধ্যে যে-বৈষম্য বুদ্ধদেব বসু লক্ষ্য করেছেন তারই প্রতিধ্বনি ক'রে বলা যায় "কল্লোল"

ছিলো তার লেখকবর্গের বাহনমাত্র, আর "পরিচয়" তার লেখকগোষ্ঠীকে সৃষ্টি করেছিলো। "কল্লোলে"র সম্পাদক ছিলেন আত্মবিলোপকারী সাহিত্যসেবী, এমন এক সিঁড়ি, যাকে পিষ্ট না-ক'রে উপরে ওঠা যায় না—অপরিহার্য, কিন্তু তার নিজস্ব কোনো মূল্য নেই। অন্য দিকে "পরিচয়ে"র সম্পাদক ছিলেন বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ অহংবাদী, এবং তিনি সাহিত্যসেবী শুধু নন, তিনি সাহিত্যিক, তিনি স্রষ্টা।

সুধীন্দ্রনাথ-সম্পাদিত "পরিচয়"-পর্যায় প্রমাণ করে যে তিনি বাংলাদেশের ভাগ্যের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করেছিলেন। তিনি মুখে বলতেন যে বঙ্গোপ-সাগরের গর্ভ থেকে উৎপন্ন এই শ্যামল মৃত্তিকাখণ্ডটিকে যদি আবার সমুদ্র গ্রহণ করে তবে তিনি বিশেষ বিচলিত হবেন না। যেমন তীব্র আবেগবান প্রেমিক প্রেমিকার প্রণয়পিপাসায় আর্ত হ'য়ে একযোগে তার মৃত্যু ও দীর্ঘায়ু প্রার্থনা করে, তেমনি সুধীন্দ্রনাথ তাঁর দেশবাসীকে এতটাই ভালোবেসে-ছিলেন যে আমাদের বর্তমান অধঃপাতের চাইতে লুপ্তিই শ্রেয় ব'লে তাঁর মনে হয়েছিলো। তিনি নিজেকে যতই জীবনবিরাগী ব'লে প্রমাণ করার চেষ্টা করুন না কেন, তাঁর চেষ্টার তীব্রতাই বুঝিয়ে দেয় যে তিনি নিস্পৃহ নন, একক মুক্তি কাম্য নয় তাঁর। সংসারকে মায়া জেনেও আচার্য শঙ্কর যেমন আত্ম-গোপন করেননি, মায়াপাশবদ্ধ কিন্তু প্রিয় সংসারীর জন্য প্রচারকার্যরূপ মায়ায় নিজেকে নিমজ্জিত করেছিলেন, সুধীন্দ্রনাথও নিজেকে শূন্যবাদীরূপে প্রচার করেছিলেন বটে কিন্তু বাঙালী পাঠককে নেহাৎ শূন্যমাত্র বলে ভাবেননি, তার চিত্তের উন্নতির জন্য পত্রিকার সম্পাদনায় ব্রতী হয়েছিলেন। মালার্মে যে-ধরনের কবিতা লিখতেন তার অনেকগুলিই অবোধ্য ব'লে তাকে হয়তো নিষ্কাম কর্ম বলা যেতে পারে, কিন্তু একটি পত্রিকা—বিশেষত "পরিচয়ে"র মতো গদ্যবহুল পত্রিকা—প্রচারের অস্ত্রবিশেষ, লোকচিত্তে প্রভাববিস্তার তার মুখ্য উদ্দেশ্য। দেশহিতের সংজ্ঞার্থ অনেক; কিন্তু যদি মননকে অনুপ্রাণিত ও রুচিকে সংশোধিত করা নিতান্ত নিষ্প্রয়োজনীয় না হয়, তবে স্বীকার করতেই হবে গৌড়কুলবিদ্বেষী ব'লে যিনি নিজেকে চিত্রিত করেছিলেন তিনি আসলে ছিলেন নৈষ্ঠিক বঙ্গপ্রেমী ও দেশহিতৈষী—কারণ "পরিচয়ে"র মতো পত্রিকা বাংলাদেশে আগে ছিলো না, পরেও হয়নি—যাঁর

তুলনায় জীবনানন্দ—যিনি আমাদের দুর্ভাগ্যবশত "রূপসী বাংলা"র কবিরূপে চিহ্নিত হচ্ছেন—তাঁকে মনে হয় হিমালয়বাসী সন্ন্যাসীর মতো আত্মকেন্দ্রিক ও স্বমুক্তিকামী।

এবং শুধু বাংলাদেশ নয়, সারা চরাচরের প্রতি সুধীন্দ্রনাথের বিরাগ আসলে তাঁর প্রেমেরই নিদর্শন। মালার্মের এই শিষ্য, অযোগ্য ব'লে নয়, মহৎ ব'লেই গুরুমার্গে গমন করেননি। যে-সুস্পষ্ট কয়েকটি লক্ষণ মালার্মে-পন্থীদের চিহ্নিত করে, তার একটিও সুধীন্দ্রনাথের কাব্যে উপস্থিত নেই। সুধীন্দ্রনাথ এই জগৎসম্পর্কেই কবিতা লিখেছিলেন, কবিতা সম্পর্কে নয়। আর, আত্মসর্বস্ব ধ্বনিমাত্র নয় তাঁর কবিতার ভাষা, তা জগতের প্রতি আমাদের মনোযোগ-সঞ্চালনকারী প্রতীক। ভাবের যথাযথ প্রকাশকেই তিনি শব্দচয়নের উদ্দেশ্য ব'লে ভেবেছিলেন; অর্থরূপ সূক্ষ্ম লক্ষ্যকে তাঁর শব্দগুলি নিপুণভাবে ভেদ করে, তাকে কুয়াশায় পরিণত করে না। এবং—হায়, মালার্মে-ভক্তগণকে নিরাশ করতে আমি বাধ্য হচ্ছি—সুধীন্দ্রনাথের কবিতার প্রধান, প্রায় একমাত্র, বিষয় প্রেম; না, ঈডিপসীয় গূঢ়ৈষণা নয়, প্রেমের মুখোশধারী কোনো কৃষ্ণ অপদেবতার তত্ত্ব নয়, তাঁর কবিতার বিষয় হচ্ছে সেই অতিপরিচিত অনুভূতি, যার নাম প্রেম!

ঐ বাক্যের শেষে বিস্ময়বোধক চিহ্ন দেখে কোনো পাঠক অবাক হবেন না নিশ্চয়। আধুনিক কবিগণ মদনভস্মে জগতের সব-কিছু ঢেকে দিয়েছেন; মানব-মানবীর কল্লোলিত ও জীবনদাত্রী প্রেমস্রোতকে শব্দ ও তত্ত্বের কচুরি-পানার তলায় আত্মগোপন করতে বাধ্য করেছেন; আর, এক দিকে মানুষকে যেমন তাঁরা প্রেমের অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছেন, তেমনি অন্য দিকে সকল প্রাণীর মধ্যে আবিষ্কার করেছেন যৌন গূঢ়ৈষা, সকল অচেতন বস্তুর মধ্যে যোনিমূলের প্রতীক। ইয়েটস ছাড়া অন্য কোনো আধুনিক য়োরোপীয়ের কবিতায় প্রেম নেই, আছে কাম—তাও প্রচ্ছন্নভাবে, ছদ্মবেশে। আর সুধীন্দ্রনাথের কবিতায় প্রেমের প্রকাশ অলজ্জ; এমনকি এও বলা যায় যে তাঁর কবিতায় প্রেমিকেরা আবেগকম্পে "প্রকাশ" করে না, তীব্র আবেগে দীর্ণ হ'য়ে তারা আর্তনাদ ক'রে ওঠে। "যার ওদিকে অনিশ্চয় আর এদিকে বেদনাপ্রভব কল্পনা"—সেই প্রতীক ব্যবহার করা তো দূরের কথা, এমনকি চিত্রকল্প ও মধুর

ধ্বনিকে মনে হয় তাদের আবেগের নগ্নতাকে গোপন করার অলংকার, তাদের মনের কথা ঢাকার আচ্ছাদন। প্রেমের চরম মুহূর্তে কোনো কাব্য-কৌশলই সহ্য হয় না তাদের, তখন তারা দ্ব্যর্থতাহীন, খাঁটি, দেশজ বাংলায়—অর্থাৎ তাদের প্রাণের ভাষায়—চীৎকার ক'রে ওঠে, ছিঁড়ে ফেলে চিত্রকল্পের ভারি পর্দা, পাঠকের সামনে উন্মোচিত করে তাদের নগ্ন ও স্পন্দমান আত্মস্তিম হৃদয়।

মালার্মে-কল্পিত কামগ্রস্ত ফনের সঙ্গে "সংবর্তে"র প্রেমিকের প্রতিতুলনা করার প্রলোভন সামলাতে পারছি না। দুজনেই নিজেদের প্রেমাস্পদের বিরহে কাতর, দিবাস্বপ্ন ছাড়া তাদের গত্যন্তর নেই। "সংবর্তে"র নায়িকা "রেখারিক্ত ভাবচ্ছবি, অবচ্ছিন্ন স্মৃতির উদ্ভাসে লাক্ষণিক"; আর মালার্মের অপ্সরীদ্বয় তো স্বপ্নমাত্র। মালার্মের কবিতার অন্তিম পংক্তিতে অপ্সরীরা মৃত্যুর অনিশ্চিত ও অন্ধকার প্রদেশে প্রত্যাবর্তন করে :

যমলা, বিদায়!
আমাকে সে-ছায়া ডাকে তোমাদের লুপ্তি যে-দিধায়॥

"সংবর্তে"র শেষে একই "প্রতর্ক"ময় রাত্রি নেমে আসে; মুহূর্তের জন্য সন্দেহ জাগে যে এই নারীও কেবল দিবাস্বপ্ন কিনা :

মৃত স্পেন, ত্রিয়মাণ চীন,
কবন্ধ ফরাসীদেশ। সে এখনো বেঁচে আছে কিনা
তা শুদ্ধ জানি না।

কিন্তু পলকে সে-সন্দেহ ভেঙে যায়। হায়! ফনের অপ্সরীগণের মতো এই নারীও কেন কল্পনার পুতুলমাত্র হলেন না, প্রশ্ন করেন আর্ত পাঠক। যিনি এমন চিহ্নহীনভাবে দূরে স'রে গেছেন তিনি শুধু ছায়া হ'লেই বরং ভালো ছিলো। কিন্তু যাঁর স্মৃতিমাত্র দিয়ে এই সংসারী ও সংশয়ী, বিদগ্ধ এবং উত্তরচল্লিশ প্রেমিক জগৎব্যাপী সংবর্তের মধ্যে স্নিগ্ধ এক নিশ্চিন্ততার দ্বীপ রচনা ক'রে নিতে পারেন, সেই নারী এককালে শুধু জীবিত ছিলেন না, জীবনদাত্রীও ছিলেন। তাঁর ঐ জলন্ত বাস্তবতাই শেষ পংক্তিকে পরিণত করে আর্তনাদে।

আর মালার্মের অপ্সরীদের জন্ম ফনের কল্পনায়। তাদের লুপ্তির পরেও

অবশিষ্ট থাকে সেই কল্পনা, এবং যেমন প্রাণহীনতাও প্রাণের কারণ হয়, গলিত শব ভক্ষণ ক'রে পুষ্ট হয় কীট, তেমনি শিল্পজ অপ্সরীদের শূন্য স্থানে গজিয়ে ওঠে নতুন প্রেতেরা, ঐ কুমারীদ্বয়ের অভাবে ফনের উদ্ভাবনশক্তি ক্ষয়িত না-হ'য়ে বরং বৃদ্ধি পায়। হঠাৎ আমরা আবিষ্কার করি যে এই চতুর দেবপশু—প্রেম নয়, প্রেম-প্রেম খেলা খেলছিলেন। কোনো নারী যা পারেন না, এই শিল্পীটি তা-ই পারেন—তাঁর চিদাকাশে একটু বাতাস উঠলেই রং বদলায়, আর তাঁর কামনা তৎক্ষণাৎ নতুন রঙের আরেকটি পুতুল গড়ে। এই অর্থহীন জগৎ অকারণে সারাক্ষণ নানা তরঙ্গ বিকিরণ করছে; ভাগ্যিস এই শিল্পীপ্রবর ছিলেন, তাই এই তরঙ্গগুলি কাজে লাগলো, অর্থ পেলো, কারণ জড়ত্বের এই সব শিহরণকে সংযুক্ত ও রূপান্তরিত ক'রে শিল্পীশ্রেষ্ঠ ফন কখনো অপ্সরী, কখনো দেবী ভেনাসকে নিজের ইচ্ছা চরিতার্থ করার জন্য রচনা ক'রে নেন। ঐ ফন স্বাধীন চৈতন্যের প্রতীক; "সংবর্তে"র নায়ক আর্ত হৃদয়ের। মালার্মে সারা জগৎকে কবিতার উপকরণ ব'লে ধারণা করেছেন; এই নিঃস্বতা থেকে যেহেতু কাব্যের মুক্তো তুলে আনা যায় সেহেতু এই শূন্যতা তাঁর পক্ষে বিজয়গর্বের কারণ, কিন্তু সুধীন্দ্রনাথের কাছে বিলাপের। সুধীন্দ্রনাথ স্বয়ং মালার্মের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক নির্দেশ ক'রে গেছেন দুই অবিস্মরণীয় পংক্তিতে। তাঁর স্বপ্নভঙ্গের পর ফন পরিতৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেলে বলে,

প্রতর্ক, প্রাক্তন রাত্রি, সান্দ্রপ্রায়।

আর সুধীন্দ্রনাথের এক নায়ক, কোনো নারী সুধাভাণ্ড হাতে নিয়ে আর আসবে না জেনে, বিলাপ করে,

সমাপ্ত সংরক্ত রাত্রি, চূর্ণমুষ্টি ধূলিধূসরিত॥

মালার্মের কবিতা বর্ণহীন, সুধীন্দ্রনাথের কবিতা হার্দ্য ও সংরক্ত। ঈশ্বর নেই? জগৎ স্বপ্নমাত্র? এ-কথাটা মালার্মের বুদ্ধিকে সুড়সুড়ি দেয় বটে কিন্তু তাঁকে চিন্তাকুল করে না। আর, সুধীন্দ্রনাথকে তা শুধু ভাবিতই করে না, বিদীর্ণ করে। তিনি নিজেকে জগতের ভাগ্যের সঙ্গে এমনভাবে যুক্ত করেছিলেন যে হিটলার ও স্টালিনকে উপেক্ষা করা তাঁর পক্ষে সম্ভব

হয়নি, পারেননি তিনি অন্যায়ের জয়যাত্রায় অবিচলিত থাকতে; এবং তাই এক নারীর স্মৃতি, সামান্য এক মানবকন্যার স্মৃতি দিয়ে ঈশ্বরের শূন্য-স্থান পূরণের চেষ্টা করেছিলেন।

কিন্তু নারীটিকে দেবীতে পরিণত করেননি। বাংলা কবিতার ইতিহাসে এটি একটি স্মরণীয় ঘটনা। আমাদের প্রেমের কবিতার আবিষ্কারক বৈষ্ণব কবিগণ মানবীকে দেখেছিলেন দেবীরূপে। তাঁদের প্রতি ভাগ্য ছিলেন প্রসন্ন, কারণ আমাদের ইতিহাসের ঠিক ঐ মুহূর্তটিতে দেবতা তীব্রভাবে মানুষ হ'য়ে উঠেছিলেন। রাধাকৃষ্ণের চরিত্রে মানুষের চিরকালের পিপাসা নরনরূপ ধারণ করলো; গত যুগের দেবতারা হয় স্পষ্টতই অতিমানবিক, নয়তো—যেমন কালী বা গৌরী—মানুষের কোনো-একটি বিশেষ বাসনা বা বেদনার পরম রূপক; কিন্তু কৃষ্ণ—কর্মী, শিল্পী ও প্রেমিক; পরম শিশু, দুরন্ত কিশোর, উদ্দাম প্রেমিক ও সফল রাজা—মানুষের সকল ইচ্ছার সন্নিপাতে গড়া একমাত্র পূর্ণ মানুষ। রাধাকৃষ্ণকে এমন একটি ব্রাকার সঙ্গে তুলনা করা চলে যার মসৃণ নীলকান্ত ত্বক ঐশ্বরিক বটে, কিন্তু যার অন্তরে আছে মানবিক রক্তমাংসের আকৃতি। আর, বৈষ্ণব কবিতায় দেবী যদি মানবীরূপ ধারণ ক'রে থাকেন, রবীন্দ্রনাথ মানবীকে দেবীতে পরিণত করলেন। যৌবনে, অল্প কয়েক বৎসরের জন্য, রবীন্দ্রনাথের কাব্যে নারী ধরা দিলেন—ঠিক আমাদের পরিচিত কোনো মহিলা তিনি নন, কিন্তু স্পষ্টতই তিনি মানবকন্যা। "মানসী" কাব্যগ্রন্থের শেষে, ধীরে-ধীরে, রহস্যের কুয়াশা ছড়িয়ে পড়লো, অস্পষ্ট হ'য়ে উঠলো তাঁর কাব্যবর্ণিত স্থান, কাল হ'লো অতীত কিংবা অনন্ত, পাত্রপাত্রী লোকোত্তর। তাঁর মানসী দেবীগণ এমন রহস্যে আবৃত যে তাঁদের পরিচয় সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হওয়া যায় না—প্রকৃতি দেবী? কাব্যলক্ষ্মী? সাধারণ নারী?—কিন্তু এটা লক্ষ্য করা যায় যে তাঁদের দেহের যে-একটি অংশের উল্লেখ রবীন্দ্রনাথ করেন, তা হ'লো তাঁদের চোখ—মানুষের দেহের মধ্যে যা সবচেয়ে দিব্য। রবীন্দ্রনাথের এই দেবীগণ শীতল এবং অচঞ্চল; তাঁদের চরণে আত্মসমর্পণ করতেই হয়, কিন্তু কখনোই উদ্দেশ্য বিষয়ে নিশ্চিন্ত হওয়া যায় না; এঁরা প্রেতিনী-যোগিনী নন বটে, কিন্তু কে জানে এঁরা মানুষের শুভকামী কিনা; অর্থাৎ, এঁরা বোদলেয়ারের জগতের অধিবাসী না-হ'লেও, কীটস এঁদের অস্পষ্ট ছায়া

দেখেছিলেন। অবশ্য, রবীন্দ্রনাথের এই দেবীগণের তুল্য কিছু বিশ্বসাহিত্যে নেই, কেননা কীটস যদিও পৌত্তলিক হবার চেষ্টা করেছিলেন, তিনি রক্তে-রক্তে ছিলেন খৃষ্টান; আর রবীন্দ্রনাথের ইচ্ছার বিরুদ্ধে ভারতবর্ষের আবহমান পৌত্তলিকতা তাঁর কল্পনাকে আচ্ছন্ন করেছিলো। এই দেবীগণ চিরকাল কল্পনা ও বাস্তবের সন্ধিস্থানে বাস করবেন, কারণ বিশ্বের সকল কুয়াশা, সকল রহস্য—অদৃশ্য, স্বচ্ছ, স্পর্শাতীত যা-কিছু—পুঞ্জিত হ'য়ে ঐ শুভ্র ও হিম মূর্তিদের রচনা করেছে, যে-জলকণা বাতাসে মিশে ছিলো তাকে দেহ দিয়েছে। ক্রমে তাঁর কবিতায় আর-এক নারী জন্ম নিলো, যে ঐ মনোমোহিনীর বিপরীত—সে ব্যথিত, কম্পিত, লজ্জাভারে অবনত, সে কবি স্বয়ং। এবং তার জন্মমুহূর্তে মানসসুন্দরী জীবনদেবতায় পরিণত হলেন; "ভ্রষ্ট লগ্ন" কবিতায় যে-নারীর কণ্ঠ প্রথম শোনা গেলো, দীর্ঘ আট বছর ধ'রে তাকে আত্মগোপন করতে কবি বাধ্য করলেন, কিন্তু "খেয়া"র তাকে আর সংযত রাখা গেলো না, সেই দেবপ্রেমে উন্মাদিনী স্বীকার করলো যে সে ঈশ্বরেরই প্রেমে পড়েছে। মানব-মানবীর প্রেম রবীন্দ্রনাথ যে-এর পর একেবারেই চিত্রিত করেননি তা অবশ্য নয়; কিন্তু প্রবীণ কবি যে কয়েকটি কবিতায় নারীর প্রতি পুরুষের আকর্ষণ বর্ণনা করেছেন তার ভঙ্গি হয় চপল—যেন প্রণয় নামক ব্যাপারটায় তিনি আর বিশ্বাস করেন না—অথবা তত্ত্ব ও ভাবালুতার রসায়নে নারীর অস্থিমাংস উবে গিয়ে নাম কিংবা স্মৃতিটুকু শুধু প'ড়ে থাকে।

এ-কালের ভদ্রমহিলাকে প্রথম কবিতায় স্থান দিলেন আধুনিক কবিরা; কবিতার মানচিত্রে বিদিশার পাশে নাটোরের নাম ক্ষোদিত হ'লো। কিন্তু বনলতা সেন নামেই শুধু আধুনিক, আসলে তিনি সর্বকালের। সকল নদীর অন্তে তাঁর অধিষ্ঠান; সকল মানুষ নাবিকের মতো সমুদ্রে-সমুদ্রে ভ্রমণ ক'রে শেষে তাঁর চোখের নীড়ে প্রত্যাবর্তন করে। জীবনানন্দের নায়িকারা দেহকে উষ্ণ করে না, বরং উষ্ণ হৃদয়কে শীতল করে। জীবনানন্দ যদিও "অশ্লীলতা"র জন্য কর্মচ্যুত হন, তাঁর কবিতার কোথাও, যতদূর মনে পড়ছে, চুম্বন শব্দটি ব্যবহার করেননি। এই শব্দটিকে পরিহার করার কারণ নিশ্চয় তাঁর ব্রাহ্মিকতা নয়, তার কারণ তাঁর মানসকন্যাদের চরিত্র। কল্পনার ছায়াদের তো আর চুম্বন কিংবা আলিঙ্গন করা যায় না!

সুধীন্দ্রনাথের কাব্যকন্যারা মানুষ; মানুষ শুধু নন, তাঁরা এ-যুগের; এবং এ-যুগের শুধু নন, তাঁরা এক বিশেষ সামাজিক পরিবেশে লালিত। তাঁদের জিবের ডগায়—হয়তো—বিদেশী ভাষা, হাতের আগায়—নিশ্চয়ই—টেলিফোন। এঁরা কেউ-কেউ বিদেশিনী, এবং সকলেই বহুপ্রণয়ে অভিজ্ঞ। কেউই কিশোরী বা অপাপবিদ্ধা নন। এবং নায়কেরা বিগতযৌবন, গলকম্বলের ভাঁজে হারিয়ে গেছে তাঁদের চিবুক, ক্ষীণকেশ ও স্বেদশ। অর্থাৎ, সেই সব উপেক্ষিত মানুষ যাঁরা প্রেম নামক নাটকে শুধু আশীর্বাদ ও সম্প্রদানের জন্য প্রবেশ করতেন, তাঁরা রক্তমাংসের দেহ নিয়ে সুধীন্দ্র-কাব্যের মুখ্য ভূমিকায় অবতীর্ণ হলেন।

সুধীন্দ্রনাথের কাব্যে প্রেম স্পষ্টতই মানবিক আত্মজৈবনিক। কোনো-কোনো কবিতা শুধু তীব্রতা নয়, পুঙ্খানুপুঙ্খের বর্ণনার জন্যও একেবারে বাস্তব ও জীবন্ত হ'য়ে ওঠে। চণ্ডীদাসের পদাবলী কোনো-এক রজককন্যার উদ্দেশে রচিত; কিন্তু ভারতীয়মনের দোষ কিংবা গুণই এই যে তা ঐতিহাসিক ঘটনাকেও পুরাণে পরিণত করে, এবং ঐ বৈষ্ণব কবিও তাঁর কাব্য থেকে স্থানীয় ও তাৎকালিক সমস্ত-কিছুর চিহ্ন এমনভাবে বিলুপ্ত করেছেন যে সেই মানবকন্যা—যিনি হয়তো ঐ রোমাঞ্চকর কবিতাগুলির মূল কারণ—বেঁচে আছেন শুধু লোককল্পনায়। পশ্চিমী সাহিত্যে ঠিক এর বিপরীতটি ঘটে; ব্যক্তি ও ইতিহাস কখনো-কখনো কবিতার ছদ্মবেশ ধারণ করলেও অনন্তকালের সঙ্গে মিশে যায় না; এবং, টিশিয়ানের দ্বারা অঙ্কিত ব্যক্তিবিশেষের প্রতিকৃতির মতো, এমন কবিতাও রোরোগে রচিত হয়েছে যাকে কবি ও কবিতার নায়কের (বা নায়িকার) যৌথ সৃষ্টি ব'লে অভিহিত করা সম্ভব। সুধীন্দ্রনাথ ভারতীয় কবি; তিনিও তাঁর জীবনের ঘটনাকে পুরাণের মুখোশ পরিয়েছিলেন; কিন্তু একমাত্র তাঁরই কবিতায় এমন অনেক সংকেত আছে যা থেকে বোঝা যায় তাঁর জগতে এমন অনেক-কিছু ঘ'টে গেছে যার দীর্ঘায়িত প্রতিচ্ছায়ায় তাঁর কবিতা অনুস্যূত।

উপরন্তু লক্ষণীয় যে এই মালার্মে-ভক্ত বাঙালী কবির রচনায় কৃক্তির ও গোষ্ঠীর জীবন এক হ'য়ে গেছে। ঐতিহাসিক তথ্যে এতদূর পর্যন্ত সমৃদ্ধ কবিতা অন্য কোনো বাঙালী কবি রচনা করেননি। সুধীন্দ্রনাথের কবিতায়

মানুষের অন্তর্জীবন ও সামাজিক অভিজ্ঞতা অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত হ'য়ে গেছে; এবং তিনি রাষ্ট্রিক দুর্যোগকে ব্যক্তিগত ট্র্যাজেডিতে পরিণত করতে সমর্থ হয়েছেন। তাঁর কোনো-কোনো কবিতার প্রধান উপকরণ এমন ঘটনা যা সারা বিশ্বকে স্পর্শ করে, কিন্তু যাতে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার তীব্রতা নেই, যা খবরের কাগজের অধিকাংশটা জুড়ে থাকে কিন্তু আমাদের স্বপ্নে স্থান পায় না, যার সম্পর্কে বক্তৃতা দেওয়া চলে কিন্তু কখনো যা নিয়ে ফিসফিস ক'রে আমরা কথা বলি না। সুধীন্দ্রনাথ নীরস রাজনীতিকে কোমল ও সুপাচ্য করলেন তাকে প্রেমের রসে জারিত ক'রে; তাঁর কবিতারূপ উপাদেয় ব্যঞ্জনে রাজনৈতিক উপাদান আছে প্রচুর, কিন্তু তার লবণ বা লাবণ্য নারী ভিন্ন আর-কিছু নয়। তিনি আবিষ্কার করলেন রাজনীতিতে নীতি নেই, ইতিহাসে নেই নিয়ম, হৃদয় নেই জগতের; এই শূন্যতার মধ্যে নারীই পুরুষের একমাত্র সহচর। হ'তে পারে যে প্রেম অমর নয় এবং বিচ্ছেদ অনিবার্য। কিন্তু কিছুক্ষণের জন্য অন্তত নারী ও পুরুষ পরস্পরের শূন্য হৃদয় ভ'রে দিতে পারে।

তোমার প্রাণের গরতে পরতে
যে-অনাম তৃষা গুমরি কাঁদে
অনুকম্পায়ী জীববীণা মোর
ঝঙ্কৃত আজ সে অনুনাদে।…
নিত্য আলার কলুষকালিমা
আনি; তাই হিয়া দরদে কাঁদে। (প্রতিদান)

হেন কালে
অমৃতের প্রতিশ্রুতি নিয়ে,
তুমি এলে অনাহূত প্রেতস্তব্ধ গৃহে;
চির মোহ-ময়
তুচ্ছ প্রয়োজনহীন বাক্য-কতিপয়
চুম্বনের অবকাশে মৃদু স্বরে উচ্চারণ করি
দিলে ভরি
নিরিক্ত অন্তরে মোর আকাঙ্ক্ষার সহজ বিস্ময়।…
তব ঘুক্ত প্রেমের উপরে

নিশ্চিন্তে নির্ভর পেল অনঘর মুহূর্তের তরে
তুলনামাত্রত বিশ্ব প্রলয়ের পথে। (পুনর্শ্চ)

সুধীন্দ্রনাথের আদি ও শেষ কবিতার মধ্যে যে-বিপুল ব্যবধান লক্ষিত হয় নারী তার অন্যতম কারণ। আদি রচনাগুলিতে নারীই মঞ্চের সবটুকু জুড়ে থাকে; এবং শেষ রচনায় তার স্মৃতিটুকু পর্যন্ত মুছে গেছে, জগতের অর্থহীনতাই কবিতার একমাত্র বিষয়। প্রথম দিকের কবিতার কৌশল কাঁচা, ভাবনাও হয়তো নতুন নয়। শেষ কবিতাগুলি রচনাগুণে শ্রেষ্ঠ এবং ভাবনাগুণে গভীর। কিন্তু প্রথম দিকের কবিতাগুলিতে যদি আর্দ্রতার আধিক্য থাকে, তবু সরসতার গুণে তাদের জয় অবধারিত। "সংবর্ত"-পরবর্তী কবিতার কলাকৌশলের তাত্ত্বিক না-করা অসম্ভব, কিন্তু চিত্রকল্প তেমন আর সজীব নেই; এবং ঐ শূন্যতাকে মেনে নেওয়ার মধ্যে যে বীরত্ব আছে তাকে আমরা শ্রদ্ধা করি, কিন্তু তার সঙ্গে একাত্মবোধ করতে পারি না। এই সুনির্মিত কবিতাগুলি এক জ্ঞানী ও নিঃসঙ্গ নীতিবোধের আবাস; তাই হয়তো তাদের পাষাণাচ্ছাদিত অঙ্গনে কল্পনার কোমল শিশুরা কলরব করে না, কোনো চপল, নীতিজ্ঞানহীন প্রজাপতি এখানে আসে না ব'লে স্ফটিকের সুন্দর বাগান নিস্পন্দ। প্রথম দিকের রচনা মধুর ও ঘন; আর তাঁর শেষ রচনায় তাঁর জগৎ নাস্তিময় ও কঠিন। "সংবর্ত"-কবিতায় এই দুই বিপরীত পরস্পরের অভাব পূরণ করেছে, টিনের খাপে ফুলপির মতো জগতের শূন্য আধার ভ'রে দিয়েছে নারী। এই কবিতাটি সকল অর্থেই তাই সুধীন্দ্র-কাব্যমালার মধ্যমণি।

জীবনানন্দের কবিতায় সর্বকালের নারী নিতান্ত আধুনিক বেশবাস ধারণ করে, আর সুধীন্দ্রনাথ এমনকি আধুনিক বিদেশিনীকে কালিদাসের অলংকারে সাজান। এছাড়া হয়তো অন্য উপায় ছিলো না এই দুই কবির। মুখ যার শ্রাবস্তীর কারুকার্য আর চুল যার বিদিশার নিশা তাকে বিশ্বাস ক'রে তোলা কঠিন, নিকট করা প্রায় অসম্ভব। এই অসম্ভবকে জীবনানন্দ সম্ভব করলেন কোলরিজের মতো কল্পনাকে বাস্তবের মুখোশ পরিয়ে, চিরকালকে বর্তমানের কৌটোয় ভ'রে ফেলে। বিদিশার পর নাটোর? অন্যত্র এই দুটি নামের সংযোগ, নাটোরবাসীদের কাছে ছাড়া, কার না মনে হবে হাস্যকর? অথচ

এই দুঃসাহসী কবি বিদিশাকে নাটোরের সঙ্গে এমনভাবে পরিণীত করেছেন যে এখন আমরা স্থির করতে পারি না এই সংযোগের ফলে কে অধিক সম্মানিত হ'লো। এটুকু স্পষ্ট যে বর্তমান নাটোরের সঙ্গে ঘর্ষণে মৃত বিদিশা আমাদের কল্পনায় উত্তপ্ত হ'য়ে উঠেছে, হ'য়ে উঠেছে ঘনিষ্ঠ, এবং সেহেতু মর্মস্পর্শী। জীবনানন্দের অধিকাংশ শব্দ দেশজ ও যুক্তাক্ষরবিরল, অর্থাৎ তা আমাদের হৃদয়নামক অশিক্ষিত ও সরল শিশুটির আপন ভাষা। আর তাঁর চিত্রকল্প কোনো স্বেদমলগন্ধময় প্রাণীর মতোই জীবন্ত। যাকে প্রতীক ব'লে জানলে আমরা নিরুৎসাহ বোধ করতাম, এখন তার শরীরের দ্বারা আকৃষ্টই শুধু হই না তার মধ্যে অল্প কিছুর দ্যুতি দেখে পুলকিত হই।

আর অতি ঘনিষ্ঠকে কাব্যের উপযোগী দূরত্ব দান করলেন সুধীন্দ্রনাথ। সংস্কৃত ভাষা থেকে অসংখ্য শব্দ এবং নানা দেশের সাহিত্য থেকে অনেক কৌশল তিনি শিক্ষা করলেন; স্বেদগন্ধ প্রসাধনের তলায় চাপা পড়লো। কবিতা থেকে যে-রস রোমান্টিকেরা বিতাড়িত করেছিলেন, সুধীন্দ্রনাথের কবিতায় আবার তা সঞ্চালিত হ'লো—ব্যঙ্গ ও বক্রোক্তিকে তিনি গম্ভীরতম কবিতায় স্থান দিলেন। কাব্যে বহুকাল বিষাদ ছিলো সম্রাট, এতদিন পরে সভাসদ কবি দরবারে ফিরে এলো। কালিদাস ও ফরাসী আঠারো শতকের কবিদের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা শুধু মৌখিক ছিলো না, তাঁদের তথ্যাশ্রয়িতা ও পৌরুষ সুধীন্দ্রনাথের কবিতায়ও বর্তমান। রোমান্টিক কবিদের নায়িকাদের আকার কৃশ ও বর্ণ পাণ্ডুর; তাঁদের শরীর কুয়াশার মতো আবছায়া। সুধীন্দ্রনাথ কালিদাসের যক্ষের মতো পরিণতবয়স্ক, এবং ইন্দ্রিয়নির্ভর। তিনি প্রসাধন ও অলংকার ভালোবাসেন, কিন্তু তিনি কোনো প্রথম প্রেমবিগলিত বালক নন, তাঁর প্রেমিকা স্বেদ ও রোমরাজিহীন কোনো স্বপ্নপ্রায় নারী নন। "শাশ্বতী" কবিতার কোনো-কোনো পংক্তিতে সংস্কৃত সাহিত্যের যে-প্রতিধ্বনি শোনা যায় তা প্রক্ষিপ্ত নয়, তা তাঁর কবিতার অবিচ্ছেদ্য অংশ।

কিন্তু তেমনি অবিচ্ছেদ্য তাঁর রোমান্টিক পংক্তিগুলি। "শাশ্বতী"র শেষ স্তবকে প্রকৃতি মানবহৃদয়ের সংবেদী মুকুর হ'য়ে উঠলো; বিরহী রামচন্দ্র যেমন অরণ্যের সর্বত্র সীতার চিহ্ন দেখেছিলেন, এই প্রেমিকও তেমনি তাঁর প্রিয়ার ছায়া দেখেন প্রকৃতির মধ্যে। কিন্তু প্রথম স্তবকে প্রকৃতি কবির মনে

বিচ্ছেদের বোধই জাগিয়ে তোলে ; বাইরের জগতে কোনো অভাব নেই, প্রকৃতির মিলনোৎসবে সকলেরই প্রবেশাধিকার আছে কিন্তু কবির নেই, কারণ শুধু তাঁরই হৃদয় সেই অন্য উৎসবের স্মৃতি ভুলতে পারেনি। প্রকৃতির দ্বারা পরিবেষ্টিত কবি জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন ; এই ধারণাটি কালিদাসে নেই, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কবিতায় বর্তমান, আর, ইংরেজি কাব্যে ডিউক অর্সিনোর আগে কেউ এই কবিতার অর্থে "উদাস" ছিল না।

"মিলনোৎসবে সেও তো পড়েনি বাকি ;
নবান্নে তার আসন রয়েছে পাতা ;
পশ্চাতে চায় আমারই উদাস আঁখি
একবেণী হিয়া ছাড়ে না মলিন কাঁথা।"

* * *

আধুনিক কবির যে-ছবি বোদলেয়ার, মালার্মে ও ভালেরি রচনা করেছেন সুধীন্দ্রনাথের সঙ্গে তার কিছুই মেলে না। ভগ্নপক্ষ আলবাট্রস ও ইকারুস, তুষারহ্রদে বন্দী শ্বেত হংস এবং স্বচ্ছায়াবন্দী নার্সিসুস—এরা সকলেই নিষ্ক্রিয়তার ও চৈতন্যের ভারে পঙ্গু আত্মার প্রতীক। আর সুধীন্দ্রনাথ সাধনার ও সিদ্ধির প্রতিভূ, তিনি প্রতীক বীরত্বের। তাঁর কাছে প্রতীত হয়েছিলো যে এই কোটি-কোটি কণিকায় বিভক্ত জগৎ এবং সেই জগতের কয়েকটি ভগ্নাংশ সম্পর্কে মানুষের জ্ঞান, এবং সেই জ্ঞানের দ্বারা ভগ্ন মানুষের হৃদয়কে আর কর্মের দ্বারা জোড়া দেওয়া যাবে না। রাজনীতির অশুভ ফল লক্ষ্য ক'রে পিতার সমাজহিতৈষণাকে তাঁর নিজের পক্ষে বরণীয় ব'লে মনে হ'লো না। ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠ বিশ্বামিত্রের মতো তাই অস্ত্র ত্যাগ ক'রে তিনি আশ্রয় নিলেন মন্ত্রের, জয় করলেন কাব্যদেবীকে, রচনা করলেন রবীন্দ্রনাথ ও আধুনিকতার অন্তর্বর্তী এক স্বর্গ। তাঁর উদ্দেশ্য ছিলো ত্রিলোকজয়ী—বিজ্ঞান, দর্শন ও শিল্পকলার পরিণয় ঘটানো। যদি এ থেকে প্রথম দুটিকে আহুতি দিতে তিনি রাজি হতেন, তাহ'লে তিনি মালার্মে-ভক্তদের কাছে মেধিকতর আধুনিক ব'লে গণ্য হতে পারতেন বটে, কিন্তু তাতে তাঁর বীরত্বের হানি হ'তো। তিনি যে আধুনিক কবিতার গুণগ্রাহী হ'য়েও সর্বলক্ষণসম্পন্ন

"আধুনিক কবি" হননি, সে কি তাঁর বিফলতা ? এটা সেই সব অজীর্ণরোগীর প্রশ্ন, যাঁরা ভোজসভায় শুধু দধির অন্বেষণ করেন, যাঁদের "আধুনিক কবিতা" নামক অতিশোধিত খাদ্য ছাড়া অন্য কিছু হজম হয় না। হাইনে কেন গেওর্গে হলেন না ? গ্যেটে কেন ডুইনো এলিজিস লেখেননি ? পূর্বেকার কবিতার কেন আকার বৃহৎ, কেন বুদ্ধির আঁশ থেকে বিশুদ্ধ কবিতাকে নিংড়ে নেওয়া হয়নি ? কেন মহাভারত অত বিশাল ও বিচিত্র ? কেন তা মালার্মের কবিতার মতো ছোট্ট একশিশি বর্ণহীন বিশুদ্ধ কোহল কিংবা উনগারেত্তির কবিতার মতো খাদ্যপ্রাণে ভরা তিলবৎ একটি বটিকা নয় ? এ-সকল প্রশ্ন যাঁদের বিব্রত করে তাঁরা যদি এক কিংবা দুই শতক পরে আবার এ-জগতে ফিরে আসতে, পারেন তবে দেখবেন যে আজ যা সহজ ও কথ্য ব'লে মনে হচ্ছে, তখন তা সুধীন্দ্রনাথের সংস্কৃতবহুল ভাষার চাইতে অনেক দূর ও দুর্বোধ্য হ'য়ে গেছে, আর বর্তমান "আধুনিকতা"র আদর্শকে প্রাচীন ও বিলুপ্ত মতবাদ বিবেচনা ক'রে গবেষকরা দুষ্পাঠ্য সব পুস্তক লিখছেন। খুব দূরের কথা সেটা ? কিন্তু সুধীন্দ্রনাথের কবিতার বিচারের পক্ষে দু-চার দশক বা দু-এক শতক বেশি কিছু নয়।

আমাদের দাদা

প্রবীরচন্দ্র বসু মল্লিক

মানুষের ঘরের এবং বাইরের পরিচয়ের মধ্যে সাদৃশ্য ও সামঞ্জস্য থাকলেও দুইটি দুই স্তরের ব্যাপার। বাইরের জগতের কাছে সুধীন্দ্রনাথের পরিচয় এই যে তিনি কবি, সাহিত্যিক ও মনীষী, কিন্তু ঘরের লোকের মনে তিনি বেঁচে থাকবেন তাঁর দৈনন্দিন জীবনের ঘটনাপরম্পরা এবং নিতান্ত ব্যক্তিগত সম্পর্ক ও সংস্পর্শের স্মৃতিতে। পরিবারে সুধীন্দ্রনাথের পূর্বজ ও উত্তরপুরুষের কথা বাদ দিয়ে এখানে তাঁর সমপর্যায়ী ভ্রাতাভগিনীদের বক্তব্য বলা হচ্ছে। সুধীন্দ্রনাথ ছিলেন আমাদের অতি প্রিয়, স্নেহপ্রবণ, শ্রদ্ধাস্পদ অগ্রজ। আমাদের দাদা তিনি, এবং ছেলেবেলা থেকেই আমরা অধিকাংশ তাঁকে একজন আদর্শ ব্যক্তি ব'লে জেনেছিলুম। উচ্ছ্বাস তাঁর স্বভাবে ছিলো না, কিন্তু তাঁর স্নেহের ও ভাবের গভীরতা আমাদের কাছে স্বতঃস্ফূর্ত ছিলো। তাঁর স্নেহের নিবিড় স্পর্শ আমরা সকলেই পেয়েছি, যদিও তা কখনোও উচ্ছলভাবে আত্মপ্রকাশ করেনি। কখনো তাঁকে ধৈর্য হারাতে বা ব্যাকুল হ'তে দেখিনি আমরা, বরং তাঁর চরিত্রে এমন একটি ভারসাম্য ও সংযম ছিলো যে তিনি সর্বদাই আমাদের ভরসার স্থল ছিলেন। দাদার সুরুচি, শৌখিনতা ও বিচারবুদ্ধিতে আমাদের এমন আস্থা ছিলো যে কোনো বিষয়ে তাঁর অনুমোদন পেলে বিনা দ্বিধায় আমরা সেটিকে সর্বসমক্ষে প্রচার করেছি, অবজ্ঞার বা নিন্দার সম্ভাবনাকে বাইরে রেখে। অথচ তিনি যাকে বলে, 'গম্ভীর' ছিলেন না, একটি প্রাণস্পন্দিত সরস পরিবেশ ঘিরে থাকতো তাঁকে, কথাবার্তায় ঝিলিক দিতো বুদ্ধির সঙ্গে কৌতুক, তাঁর জীবনীশক্তি মনে হ'তো অক্লান্ত। দাদা যখনই আমাদের কাছে এসেছেন মনে হয়েছে যেন তিনি সঙ্গে ক'রে এনেছেন সজীবতা, আনন্দ ও দীপ্তি; হাসি ছাড়া তাঁকে কখনো দেখিনি, কোনোরকম মলিনতাকে তাঁর সঙ্গে যুক্ত করা যেতো না। তাঁর ব্যবহারে সৌজন্য, সংস্কৃতি ও সরলতা অপূর্বভাবে অন্বিত ছিলো; এমন শিষ্টাচারী ও স্বভাব-অভিজাত মানুষ আমাদের আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধবের মধ্যে আর ছিলো না।

দাদার মতো দৃঢ়চরিত্র ও প্রগাঢ় ব্যক্তিত্বও আমরা কম দেখেছি। ন্যায়-বিচারে ও কর্তব্যপরায়ণতায় তিনি এত খাঁটি ছিলেন যে জানত তিনি যে কোনো অন্যায় করতে পারেন তা আমাদের ধারণাতীত ছিলো। তিনি যাদের হাতে রূঢ়তম আঘাত পেয়েছেন তাদের প্রতিও তাঁর কর্তব্য সম্পাদনে এতটুকু ত্রুটি করেননি। সেই সঙ্গে তিনি সংকল্পে ছিলেন অনন্যমনা, যে-সিদ্ধান্ত তাঁর উচিত মনে হ'তো তা গ্রহণ ক'রে তা থেকে আর চ্যুত হতেন না। বুদ্ধির এই তীক্ষ্ণতা ও বিচারের এই স্থিরতার জন্য তাঁর মতামত দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হ'তো এবং তদনুযায়ী কর্মধারা অনুসরণ করতে কিছুমাত্র দ্বিধা করতেন না।

এখানে মনে পড়ছে বি. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর সুধীন্দ্রনাথ যখন ইংরেজি সাহিত্যে এম. এ. পড়ার জন্য কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন, তখন একবার স্বনামখ্যাত অধ্যাপক প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ সুধীন্দ্রনাথকে চসার পাঠ ক'রে ক্লাসে শোনাতে বলেন। এম. এ. ক্লাসের ছাত্রকে স্কুলের ছেলের পাঠাভ্যাস করতে বলা সুধীন্দ্রনাথের পক্ষে রুচিকর হয়নি, কিন্তু অধ্যাপকের আদেশ পালন করেছিলেন। দ্বিতীয় দিন যখন এর পুনরাবৃত্তি হ'লো তখন তিনি আবার অধ্যাপকের কথা মেনে নিলেন বটে, কিন্তু আদেশপালনে নিজের বিতৃষ্ণা সম্বন্ধে কোনো সন্দেহের কোনো অবকাশ রাখলেন না। তৃতীয় দিনে তাঁর ধৈর্যের সীমা অতিক্রান্ত হ'লো এবং পুনর্বার চসারের কাব্য উচ্চৈঃস্বরে পাঠ করতে অক্ষমতা জানাবার ফলে ক্রুদ্ধ অধ্যাপক কর্তৃক ক্লাশ থেকে বহিষ্কৃত হলেন। উপাচার্য আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের এজলাসে তাঁর তলব হ'লো। তিরস্কৃত হ'য়ে অবাধ্যতার অপরাধ স্বীকার ক'রে অধ্যাপকের কাছে ক্ষমা-প্রার্থনায় রাজি হলেন বটে, কিন্তু উপাচার্যকে অনুরোধ জানালেন যেন এম. এ. ক্লাশের ছাত্রকে আর 'রীডিং' পড়তে বলা না হয়। বলা বাহুল্য, অধ্যাপকের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করতে উপাচার্য রাজি হলেন না; সুধীন্দ্রনাথ অধ্যাপকের কাছে ক্ষমা চাইলেন, কিন্তু সঙ্গে-সঙ্গেই বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে তাঁর সংস্রব ছিন্ন হ'লো।*

* এই ঘটনাটি আমি সুধীন্দ্রনাথের মুখে ইষৎ অন্য রকম শুনেছিলাম; তিনি বলেন শেক্সপীয়রের কোনো অংশের ব্যাখ্যা নিয়ে অধ্যাপকের সঙ্গে তাঁর মতভেদ ঘটে। অবশ্য ঘটনাটির উপলক্ষ যা-ই হোক, তাতে তাৎপর্যের ব্যতিক্রম হয় না। —সম্পাদক

সুধীন্দ্রনাথের বিংশ শতাব্দীর মন কালাতিক্রান্ত প্রথাবদ্ধ জীবনধারাকে মেনে নিতে পারেনি। তাঁদের বাড়ির ধারা ছিলো প্রাচীনপন্থী, কিন্তু মাতুলালয়ে আভিজাত্যের সঙ্গে পাশ্চাত্য আধুনিকতার সমন্বয় ঘটেছিলো। সেইজন্য সুধীন্দ্রনাথ তাঁর মাতুলালয়ের প্রতি আকৃষ্ট হন এবং আধুনিকতার প্রভাব আমাদের সব ভাইবোনেদের মধ্যে তাঁকেই সবচেয়ে গভীরভাবে স্পর্শ করে। বর্তমান যুগের অনেকের মতোই যুক্তিবাদী মনোবৃত্তি নিয়ে আমরা আমাদের সামাজিক জীবনের অনেক সংস্কারকেই অসার ব'লে বুঝেছি, কিন্তু একমাত্র দাদাই তাঁর মনীষা ও চরিত্রবলে সেগুলিকে অস্বীকার করতে পেরেছিলেন। তিনি হয়তো অনেক সময় প্রচলিত প্রথা মানেননি, আমাদের চিরাভ্যস্ত সংস্কারকে উপেক্ষা করেছেন, এবং তাতে আমাদের মন সহজে সায় না-দিলেও তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা আমাদের তিলপরিমাণও কমেনি। কিছুটা অস্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করেছি, কিন্তু দাদার সম্বন্ধে নিন্দার ভাব অসম্ভব ছিলো, কেননা তাঁর চরিত্রের সঙ্গে সেই সব আচরণের সামঞ্জস্য দেখতে পেয়েছি। যখন নিরপেক্ষভাবে চিন্তা ক'রে দেখেছি তখন তাঁর ব্যক্তিত্বের, আত্মবিশ্বাসের এবং চরিত্রবলের প্রগাঢ়তায় বিস্মিত হ'তে হয়েছে। শূন্যগর্ভ আচার অনুষ্ঠানকে তিনি বর্জন ক'রে চলতেন বিনা আড়ম্বরে, বিনা প্রয়াসে, অতি সহজ ও সাবলীলভাবে। তাঁকে দেখে আমাদের এ-কথাই মনে হয়েছে যে জীবনে যা কিছু অর্থময় সে-বিষয়ে তাঁর উপলব্ধি এত গভীর যে অন্তঃসারশূন্য লোকাচারকে উপেক্ষা ক'রে চলতে তাঁর কোনো প্রচেষ্টারও প্রয়োজন হয়নি। সেগুলো তাঁর কাছে ছিলো এতই অকিঞ্চিৎকর যে সমারোহ ক'রে তাদের অস্বীকার করাও তাঁর পক্ষে নিতান্ত বাহুল্য হ'তো। মহৎ ও উত্তমের বিষয়ে তাঁর মূল্যবোধ ছিলো বিশুদ্ধ—কোনও খাদ সেখানে মেশাতেন না, যা সত্য ব'লে অনুভব না-করতেন তার আচরণ তাঁর পক্ষে অসম্ভব ছিলো। সেইজন্যই তাঁর পিতামাতার মৃত্যুর পর সুধীন্দ্রনাথ অশৌচপালনের বিধি মানেননি, অথচ পিতামাতার প্রতি তাঁর গভীর ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ নেই। তিনি ভাবতেই পারেননি যে এইসব বাহ্যিক শোকপালনের প্রথা মেনে তিনি তাঁর পুত্রত্বকে বা তাঁর শ্রদ্ধাপ্রীতিকে কোনোই মর্যাদা দিতে পারবেন। আমরা যারা তাঁকে কাছ থেকে দেখে তাঁর অন্তর

বুঝেছি, আমাদের এ-কথা উপলব্ধি করতে অসুবিধে হয়নি যে এই চরম সম্বন্ধ বিষয়ে তিনি নিজেকে ফাঁকি দিতে পারতেন না। জীবনের গূঢ়তম অবস্থাগুলিতে তাঁর মূল্যবোধের এই বিশুদ্ধতা বার-বার আমাদের মুগ্ধ করেছে।

সুধীন্দ্রনাথের স্বভাবের মাধুর্য প্রকাশ পেতো তাঁর প্রাণখোলা হাসিতে। তাঁর সঙ্গ ছিলো আনন্দের নিকেতন ; তাঁর কথা মনে হ'লেই সর্বপ্রথম তাঁর সহাস্য মুখচ্ছবি চোখের সামনে ভেসে ওঠে। কবি ও সাহিত্যিক ছিলেন ব'লে তাঁর প্রাত্যহিক জীবনে কোনো শৈথিল্য বা বিশৃঙ্খলাকে প্রশ্রয় দেননি। তিনি অতি পরিচ্ছন্ন ও সুব্যবস্থিতভাবে বসবাস পছন্দ করতেন। সংসারের খুঁটিনাটি ব্যাপারে উৎসাহও ছিলো, হিসাবও ছিলো। মনের, ব্যবহারের বা অশনব্যসনের ব্যাপারে কোনো দিক দিয়েই তিনি বেহিসাবি ছিলেন না। অন্যদিকে তেমনি উদারতা, অনুকম্পা ও দাক্ষিণ্যও তাঁর স্বভাবের বৈশিষ্ট্য ছিলো। তিনি তাঁর জীবনধারাকে আলাদা ক'রে গ'ড়ে নিয়েছিলেন, কিন্তু আমাদের কাছ থেকে তিনি কখনো দূরে স'রে যাননি। আমাদের পারিবারিক ব্যাপারে সব সময়েই অংশ নিয়েছেন, আমাদের ব্যক্তিগত বিপদে-আপদে তাঁকে কাছে পেয়েছি। আপাতদৃষ্টিতে তাঁকে সম্পূর্ণ পাশ্চাত্যভাবাপন্ন মনে হ'তো, কিন্তু অন্তরে তিনি ভারতীয় আদর্শে অনুপ্রাণিত ছিলেন, তাঁর পাশ্চাত্য অভিজ্ঞতার দ্বারা আরো পুষ্ট ক'রে তুলেছিলেন তাঁর ভারতীয় মানসতাকে।

আমরা আজ জগৎকে বলবো আপনারা হারিয়েছেন একজন প্রতিভাবান কবি ও অসামান্য পণ্ডিত, আর আমরা হারিয়েছি আমাদের জীবনের সহচর, আমাদের আনন্দের ও স্নেহের উৎস, আমাদের অতি প্রিয়জন।

আমাদের মাষ্টারমশাই সুধীন্দ্রনাথ

দিব্যেন্দু পালিত

সেই সিঁড়িগুলো নেমেছি খুব সন্তর্পণে, বিষাদের নেশায় আচ্ছন্ন। আমার পাশে আরো কেউ-কেউ ছিল ; আগে পিছে অন্যেরা। এখনো পায়ে অনেক জোর, ইচ্ছে করলে দু' মাইল পথ অনায়াসে হাঁটা চলে। নামছি, আর ভাবছি : কেওড়াতলা শ্মশানের এই বিরাট প্রশস্ত ঘরে ক' মিনিট আগে পর্যন্তও তো ঠাসাঠাসি ভিড় ছিল ; হঠাৎ তা ভেঙে ছত্রখান হয়ে ছড়িয়ে পড়ল কেন!

ধীরে এসেছি বাইরে। মাঠের ঘাসে ভাঙা, ক্লান্ত, অবিন্যস্ত মানুষগুলো খুব কাছাকাছি খুব দূর হয়ে ব'সে রয়েছে। কেউ কোনো কথা বলছে না, কেউ কারো মুখ দেখছে না। শুধু দু' একজনের নীরব ঠোঁটে সিগারেট জলছে ব'লে বোঝা যাচ্ছে ওরা বেঁচে আছে। কিন্তু, এর পর ?

আকাশে তাকালুম একবার। বিকেল শেষ হয়ে এল, আমাদের দিন। আর একটু পরে রাত নামবে।

হঠাৎ কে কথা বলল, 'হাত-টাতগুলো ধুয়ে ফেল। বেশি দেরি কোরো না।'

'কেন ?'

কথা বলল না। নিঃশব্দে আমার হাতের দিকে অঙ্গুলিনির্দেশ করল।

আমার হাতে তখনও সেটা ছিল। সেই গাঢ়, কালো, পাংশু-হয়ে-আসা রক্তাক্ত তোয়ালেটা ; একটা নয়, দুটো। সেই তোয়ালেগুলো—রাসেল স্ট্রীটের বাড়ি থেকে যেগুলো আমরা সঙ্গে এনেছি। আঙুলের ডগায় এখনো শুকনো রক্তের দাগ।

হঠাৎ মনে পড়ল সব। এই দু' তিন ঘণ্টা সময় একটা নেশার ঘোরে কেটেছে। কিন্তু এখন, এই এতক্ষণে কাঁধের পেশী টনটন ক'রে উঠল ; মনে হ'ল হাঁটুর জোড় খুলে গেছে, আর দাঁড়াতে পারছি না।

ওপাশের একটা খালি বেঞ্চিতে গিয়ে বসেছি। যাঁরা এসেছিলেন, এক-এক ক'রে ফিরে যাচ্ছেন ; যাঁরা আছেন, তাঁরাও ফিরবেন। আমরা সবাই

ফিরে যাব। কিন্তু, কেওড়াতলার এই শ্মশানে এমন একজনকে রেখে গেলুম, যিনি আর কোনোদিন ফিরবেন না ; কোনোদিন, কোনো এক মুহূর্তের জন্যও যাঁকে আমরা চোখে দেখব না, কাছে পাব না ; আর শুনব না সেই ধীরোদাত্ত, গাঢ়, মধুর কণ্ঠস্বর, যে-কণ্ঠের হাসি শুনলে মনে হয় 'আছি' ; ভাবতে ভালো লাগে 'বেঁচে আছি'।

এখনো আমরা বেঁচে আছি, তিনি নেই। 'নেই' কথাটা কী ভয়ানক। নিঃশব্দে আসে, শিরা-স্নায়ুগুলোকে অবশ ক'রে দেয় ; যেন কত গভীর দহে হাত-পা সেঁধিয়ে যাচ্ছে ; ভাবা যায় না, স্বপ্নেও ভাবা যায় না, এমন।

ভাবতে পারি না, তিনি নেই। সেই বিরাট অস্তিত্ব, প্রচণ্ডভাবে বাঁচার আদর্শ, উনষাট বছর বয়সেও পঁচিশের যুবার উদ্যম ; সেই দেবতার মতো হাসি ;—অসম্ভব ; কী ক'রে ভাবব!

সকালের বেতার খবর দিল মনস্বী কবি সুধীন্দ্রনাথ দত্ত পরলোকে। সে-খবর ছড়াল মুখে মুখে, জনে-জনে জানল : সুধীন্দ্রনাথ পরলোকে। এই শতাব্দীর সমান-বয়সী কবি ; বাংলা সাহিত্যের আরো এক জ্যোতিষ্ক খ'সে পড়ল। যে যেখানে ছিলেন, যেমনভাবে ছিলেন—কবির প্রতি শেষ শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য রাসেল স্ট্রীটের পথে ছুটলেন।

আমি পারিনি, আমরা পারিনি অত তাড়াতাড়ি মনস্থির করতে। আমরা, যাঁরা তাঁর ছাত্র ছিলুম, তাঁর জীবনের সর্বশেষ অধ্যায়ে যারা তাঁর নিবিড় সান্নিধ্যের ছায়ায় ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখেছি। যারা ভেবেছি : আমাদের এই এতকালের পর্যটন সব ভুল পথে ; আমরা ভুল পড়েছি, ভুল শিখেছি ; এত-দিনে সেই ভুল সংশোধনের সুযোগ পেয়েছি ; এর পর আমরা নতুন ক'রে হাঁটব। আমরা, যারা তাঁকে শুধুই কবি হিসেবে, প্রতিভা হিসেবে পাইনি ; পেয়েছি শিক্ষাগুরু হিসেবে, একসঙ্গে স্রষ্টা এবং সৃষ্টিকে! ভাবতে পারি না।

মৃত্যু অনেক দেখেছি ; কিন্তু এ-মৃত্যু অনন্য ; এমনভাবে কেউ ছুঁয়ে যান না। আমাদের সব স্বপ্ন ভেঙে গেল।

সেই সব দিনগুলি মনে পড়ে। প্রথমে ভয় করত ; তাঁর সামনে মুখ তুলে কথা বলতে সাহস হ'ত না। কিন্তু, দু' তিন দিনেই বুঝেছি : ভুল ; যেমন অসাধারণ তাঁর ব্যক্তিত্ব, তেমনি সহৃদয় তাঁর ব্যবহার। ভাবতে ভালো

লেগেছে, এই আমাদের আশ্রয়; তাঁর কথায়, ব্যবহারে, গাম্ভীর্যে, হাসিতে আমরা আশ্বাস পেয়েছিলুম;—যতই ভুল হোক, ক্ষমা আছে; ঝড় জল যতই আসুক, এই মহীরুহ আমাদের আড়াল দেবে। ভাবতে পারি না, সে-সব দিন আর আসবে না।

ব'সে-ব'সে দিন গুনতুম, কবে বুধবার আসবে, কবে আসবে শনিবার। সুধীনবাবুর ক্লাশ। আমরা অনেক আগেই দোতলার বারান্দায় জড়ো হয়েছি; ঘণ্টা পড়ল। কোনোদিন দেরি হ'ত না; দেয়ালের বাঁকে তাঁর ঋজু, দীর্ঘ শরীরটা দুলে উঠত। তাঁর হাঁটার ধরনেও বৈশিষ্ট্য, অন্য কারোর সঙ্গে মেলে না; পায়ের তলায় মাটি যেন কাঁপে। আর মুখে সেই অম্লান হাসি; সেই 'গুড মর্নিং' সম্বোধন।

কোথা দিয়ে সময় কেটে যেত। ক্লাশে ঢুকেছেন; আসন নিয়েছেন; কখন বলতে শুরু করেছেন, 'আই হ্যাভ বীন টকিং এবাউট আওয়ার গ্রেট ফ্রেণ্ড লাইব্‌নিৎস্…'। সেই কণ্ঠ আমাদের মনের মধ্যে বি'ধেছে, শুনতে-শুনতে তন্ময় হয়ে গেছি, শুধু তাঁর জ্যোতির্ময় মুখের দিকে তাকিয়ে থেকেছি। শুরু হয়েছে এলিয়টের 'ফোর কোয়ার্টেট্‌স্'। সে এক অভিজ্ঞতা! বান্‌ট্‌ নর্টনের ব্যাখ্যা করতে-করতে কখন তিনি দর্শনের রাজ্যে পৌঁছে গেছেন, সেখান থেকে গীতায়, উপনিষদে; আমরা শুনে গেছি নিঃশব্দে, শুধু শ্রোতার মতো নয়, দর্শকেরও মতো। তারপর নিজেই এক সময় থেমেছেন; হেসে উঠেছেন উচ্চকণ্ঠে 'আই টক টু মাচ অফ ননসেন্স! হোয়াই ডোণ্ট ইউ স্টপ মী অ্যাণ্ড সে, স্যার, প্লীজ ডোণ্ট টক ননসেন্স!' তাঁর হাসিতে শিশুর সহজ আনন্দ; আমাদের চোখে মুগ্ধতা। ভুলতে পারব না তাঁর কণ্ঠে মার্লার্মে আর ভেরলেন, এলিয়ট আর ইয়েটসের আবৃত্তি; ভুলব না তাঁর সংস্কৃত শ্লোকোচ্চারণ।

রবীন্দ্রনাথকে পেয়ে আমরা উৎসাহে উদ্দাম হয়ে উঠেছিলুম। ঘাড় গুঁজে পড়েছি, তর্ক করেছি অনেক। উনি হেসেছেন, 'ইয়েস, ইউ আর রাইট।' অক্ষর ধ'রে-ধ'রে লিখতে শিখিয়েছেন, লেখা শুধরে দিয়েছেন। দেখেছি, প্রতিটি শব্দের প্রতি তাঁর কী অসীম মমতা। 'ইয়েস' কথাটা তাঁর জীবনের বড়ো সত্য ছিল, কখনো 'নো' বলতে শুনিনি।

৯ই এপ্রিল তিনি শেষ ক্লাশ নিলেন। ক্লাশ শেষ হবার পর, বেরোবার আগে একবার থেমে দাঁড়ালেন, দেখলেন সবাইকে। তারপর হেসে বললেন, 'আচ্ছা, আবার দেখা হবে। ছুটির পরে।'

গ্রীষ্মের ছুটি প'ড়ে গেল। বাড়িতে গেছি মাঝে-মাঝে। শেষ দেখা হ'ল ১৯শে জুন, রবিবার, সকালে।

ছয় নম্বর রাসেল স্ট্রীট। সিঁড়ি দিয়ে তেতলায় উঠে গেলুম। কলিং বেল টিপতে বেয়ারা এসে দরজা খুলে বলল, 'সাহাব বারান্দামে।'

মাঝের বড়ো ঘর পেরিয়ে বারান্দায় পা দেবার আগে একবার থেমে দাঁড়িয়েছি। বারান্দার সোফায় ব'সে রয়েছেন মাষ্টারমশাই; গায়ে ঢোলা চীনে আলখাল্লা, দু' আঙুলের ফাঁকে জলন্ত টার্কিস 'মুরাদ' অন্যমনস্ক পুড়ছে; দক্ষিণের উন্মুক্ত মেঘলা আকাশের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ।

ডাকতে বড়ো সংকোচ হচ্ছিল। এ-দৃশ্য চেয়ে দেখবার মতো। কিন্তু হঠাৎ তাঁরই চোখে পড়ল; গম্ভীর মুখ হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। বললেন, 'আরে, এসো, এসো। কতক্ষণ দাঁড়িয়ে রয়েছ?'

বললুম, 'না, এইমাত্র।'

সামনের সোফাটা দেখিয়ে বললেন, 'বোসো। ফার্নিচার রং করছে; ঘরদোর বড়ো অগোছালো।'

বসতে-বসতে বললুম, 'ভালো আছেন?'

'খুব ভালো,' শব্দ ক'রে হাসলেন: 'খুব ভালো আছি।'

তখন সকাল দশটা। বাড়িতে তিনি একা। তাঁর স্ত্রী, রাজেশ্বরী দেবী, দক্ষিণ কলকাতার এক সংগীতানুষ্ঠানে যোগ দিতে গেছেন। রেডিওতে 'রিলে' করছে; কয়েক মিনিট পরে উঠে গিয়ে রেডিওটা খুলে দিয়ে এলেন।

গানের দিকে কান পেতে রয়েছেন, আর, কথা বলছেন।

কথায়-কথায় সাহিত্যের প্রসঙ্গ এল। নিজের লেখা সম্বন্ধে আগাগোড়াই তিনি নীরব। আমাদের হাতে তাঁর প্রবন্ধের বই দেখলে চেঁচিয়ে উঠতেন, হাসতে-হাসতে বলতেন, 'প্লীজ ডোণ্ট আস্ক মী এনি কোয়েশ্চেন্স। আই ডোণ্ট নো হোয়াট আই হ্যাভ রিট্‌ন্। রিয়েলি!'

বললুম, 'স্যর, লিখছেন না কেন?'

'লিখছি না মানে!' নতুন সিগারেট ধরিয়ে বললেন, 'এই তো সেদিন সাগর "দেশে" একটা লেখা ছাপল। জুলাইয়ের "কোয়েস্ট"-এ বেরুচ্ছে একটা প্রবন্ধ। আর বুদ্ধদেবের "কবিতা"য় কত অনুবাদ করলুম। অবশ্য তাতে বেশি অসুবিধে হয়নি। আমার স্ত্রী অনুবাদ ক'রে রেখেছিলেন, আমি শুধু সেগুলোকে ছন্দে বেঁধেছি। এত লেখা আমি কবে লিখেছি!'

বললেন, ' "প্রবাসী" একটা লেখা চেয়েছে। লিখব।'

'আর সেই মেমোয়ার, অটোবায়োগ্রাফি অফ এ বেঙ্গলি পোয়েট?'

হেসে উঠলেন: 'ওটা প'ড়ে রয়েছে। শেষ পর্যন্ত হবে কিনা বলতে পারি না। তোমাদের কম্‌প্যারেটিভ লিট্‌রেচার আর যাদবপুর আমাকে একেবারে অস্থির ক'রে রেখেছে, তবে···।' একটু থেমে, হেসে বললেন, 'আই অ্যাম থিঙ্কিং অব স্টার্টিং অন ইট এগেন। সামনের বছর তোমাদের পড়ার অনেকটা ক'রে রেখেছি।'

ঝিরঝিরে বৃষ্টি শুরু হল। বললেন, 'কী গরম দেখেছ! বীস্ট্‌লি! পাখার হাওয়া ছাড়া এক মুহূর্ত থাকা যায় না!'

বইয়ের কথা উঠল। 'অর্কেস্ট্রা' অনেকদিন ছাপা নেই; 'প্রতিধ্বনি', 'সংবর্ত'-ও বোধহয় নেই। বললেন, 'আবার খোঁজ নিতে হয় বইগুলোর।'

'আপনার শ্রেষ্ঠ কবিতা বেরোয়নি এখনো?'

'শ্রেষ্ঠ-টেষ্ঠ বুঝিনে। কালেকটেড পোয়েম্‌স্ গোছের একটা কিছু হ'তে পারে। আমাকে দু' একজন বলেছিল; কিন্তু বিক্রি না-হ'লে শুধু-শুধু পাঠক আর প্রকাশকের ওপর জুলুম করা হয়।'

'তা কেন।' বললুম, 'আজকাল কবিতার বই ভালো বিক্রি হয়।'

'কেন হয়, তা অবশ্য জানিনে।' তাঁর মুখে হাসি ছড়াল।

একটা নয়, অনেক কথা। তাঁর নিজের কথা; আমাদের পড়াশুনোর কথা। আর তো ক'দিন, কলেজ খুলে এল। সেদিন যেন বড়ো বেশি সহজ হয়ে পড়েছিলেন, প্রায় অন্তরঙ্গ। দু' ঘণ্টা কি আরো কিছু বেশি সময় ছিলুম, সারাক্ষণ কথা বলেছেন।

বেলা হ'ল। বললুম, 'আজ চলি, স্যর।'

হঠাৎ অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলেন। চকিত হয়ে বললেন, 'যাবে! আচ্ছা, আবার এসো।'

উঠে দাঁড়িয়ে বললুম, 'আসব, স্যর। হর্‌স্ সম্বন্ধে প্রশ্ন রয়েছে কতগুলো, একটু আলোচনার দরকার।'

বললেন, 'নিশ্চয়। বুধবার এসো না, এই এগারোটা নাগাদ?'

বুধবার একটু কাজ ছিল। বললুম, 'চেষ্টা করব। তা না হ'লে···'

'বেশ তো, রবিবার?'

বললুম, 'আসব।'

সিঁড়ির মুখ পর্যন্ত এগিয়ে দিতে এলেন। কী মনে হ'ল, আবার জিজ্ঞেস করলুম, 'আপনার শরীর বেশ ভালো আছে তো, স্যর?'

হেসে বললেন, 'মন বলছে, ভালো আছে। মন বললেই শরীর খুশি।'

আমাকেও হাসতে হ'ল: 'আবার সেই মাইণ্ড অ্যাণ্ড ম্যাটারের প্রশ্ন।'

'ওটা ছাড়া দুনিয়া চলে না।'

সিঁড়ির দিকে পা বাড়ালুম। ওঁর সেই হাসি শুনছি। বললেন, 'রোববার তাহ'লে আসছ? ঠিক?'

বললুম, 'আসব, স্যর। নিশ্চয়।'

'থ্যাঙ্ক ইউ। আই শ্যাল ওয়েট ফর ইউ।'

সেদিন সিঁড়িগুলো নেমে গেছি অতি স্বচ্ছন্দে, অত্যন্ত দ্রুত। আনন্দে ভ'রে গেছে মন। জানতুম না, তাঁর সঙ্গে এই শেষ দেখা। জানতুম না, রোববার আসবে, কিন্তু—

ভাবা যায় না, এমন। বিশ্বাস করা যায় না, এমন। শুনে ভাবতে পারিনি, বিশ্বাস হয়নি। মাথার মধ্যে ঝড় উঠেছে, পায়ের শক্তি ক্ষয় হয়েছে; শিরার রক্ত দ্রুত হ'ল। ঠোঁটে দাঁত ব'সে গেছে। ভেবেছি, এ কী হ'ল! কিন্তু—

আর সময় ছিল না। বাসের গতিতে বিশ্বাস ছিল না; ট্যাক্সিতে ব'সে মনে হয়েছে, এত আস্তে যায় কেন! রাসেল স্ট্রীটের সেই বাড়ির সামনে নেমে দু' দণ্ড দাঁড়াবার তর সয়নি। মোটরের ভিড়, মানুষের ভিড়, চাপা আলোচনা। সিঁড়ির ধারে-ধারে যারা দাঁড়িয়েছিল, তাদের চেনা মুখে কোনো

ভরসা পেলুম না। সেই এক ধ্বনি, না-বলা শব্দ, মুখর নৈঃশব্দ্য 'নেই—নেই—নেই।'

দুপুর গড়াল বিকেলের দিকে। সময় কাটছে। কেউ কারো মুখের দিকে তাকাতে পারছি না; চোখে চোখ পড়লে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছি। সেই সুন্দর, গৌরবর্ণ, ঋজু, উন্নত দেহের অন্তিম পরিণতি কী! এখনো টেবিলের ওপর টার্কিশ সিগারেটের টিনটা রাখা রয়েছে; বইয়ের ভাঁজ থেকে উঁকি দিচ্ছে পেন্সিল; ঘরের পর্দায় অপরাহ্ণের হাওয়া। শুধু আমাদের মাষ্টারমশাই, সুধীন্দ্রনাথ নেই।

সাড়ে-তিনটের সময় তাঁর দেহ ধরাধরি ক'রে নিচে নামানো হ'ল। বছরের পর বছর এই কাঠের সিঁড়িতে তাঁর পায়ের শব্দ বেজেছে। শেষ শয্যা ফুলে-ফুলে ভ'রে উঠল। মাথার শির ছিঁড়ে গিয়েছিল; নাকে, মুখে রক্ত উঠছে; তুলো দিয়ে আড়াল করা হয়েছে। ললাটে এখনো সেই আভা, যার দিকে তাকিয়ে কতদিন আত্মবিস্মৃত হয়েছি। যে-হাসি তাঁর অস্তিত্বকে প্রবল ক'রে জালিয়ে রেখেছিল, তার শেষ চিহ্ন এখনো মুছে যায়নি।

শেষ যাত্রার সময় হয়ে এল। আমরা তৈরি হচ্ছি। ভিড়। দেখলুম বুদ্ধদেব বসুকে, চোখে রুমাল চেপে ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে কাঁদছেন। এই শেষ কয়েকটি বছরে বড়ো কাছাকাছি এসেছিলেন তাঁরা; আজকের দূরত্ব অপরিসীম। দেখলুম আমাদের অধ্যাপক ফাদার ফার্লকে, হাতের মুঠোয় শক্ত ক'রে বাইবেল ধ'রে রেখেছেন। আরো অনেককে দেখলুম, যাঁদের চিনি না, কিন্তু চিনতে অসুবিধে হয় না। আর তরুণ কবি ও সাহিত্যিকের দল, আর আমরা, যাদবপুরের ছাত্রছাত্রীরা—গুরুর শেষ যাত্রায় সঙ্গী হ'তে যারা এসেছে। তাঁর আত্মীয়দের কথা, রাজেশ্বরী দেবীর কথা, কিছু বলতে চাই না।

চারটে বাজতে দশ মিনিট বাকি। সুধীন্দ্রনাথের মরদেহ কাঁধে নিয়ে উঠে দাঁড়ালুম আমরা। পা খোলা, কাঁধে তোয়ালে। মালা ও পুষ্পস্তবকে ভরা গাড়িগুলো ধীরে পিছু-পিছু এগিয়ে এল। থিয়েটার রোড ধ'রে আমরা আস্তে-আস্তে এগিয়ে চলেছি।

সার্কুলার রোডের কাছে দাঁড়াতে হ'ল ট্র্যাফিকের জন্য। কাঁধের পেশীতে জোর পড়ছে, পিছনে তাকাতে পারছি না। ওরই মধ্যে পিছনের সমাবেশ আন্দাজ করলুম। কী হয়েছে, এখন আর মনে নেই; একটা বিবর্ণ মোহের মতো অনুভূতি। ক্ষত খুব গভীর হ'লে যন্ত্রণা কম হয়। আবার চলতে হ'ল চৌরঙ্গি ধ'রে সামনের দিকে।

কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়কে দেখলুম ছুটোছুটি করছেন, কাঁধ দেবার জন্য এগিয়ে আসছেন। এগিয়ে এলেন ফাদার ফার্ল। একটি কৃশকায় তরুণ কবি কাছে এসে কুণ্ঠিতভাবে বললেন, 'আমাকে একবার দিন।'

'পারবেন?'

'চেষ্টা করি। এমন সৌভাগ্য তো আর হবে না।'

জগু বাজারের কাছে এসে হঠাৎ চমকে উঠলাম। ছুটে আসছেন বৈজ্ঞানিক সত্যেন্দ্রনাথ বসু। উস্কোখুস্কো চুল, উদ্‌ভ্রান্ত চেহারা। বললেন, 'তোমরা সুধীনকে একবার দাঁড় করাও, আমি দেখব।'

এগিয়ে চলেছি, পথ ফুরিয়ে আসছে। খানিক আগে রোদ্দুর ছিল, হঠাৎ মেঘ ক'রে বৃষ্টি এল। মেঘ বৃষ্টি দিল। আশুতোষ মুখার্জি রোড ধ'রে বাসবিহারী অ্যাভিন্যু, সেখানে কেওড়াতলার দিকে মোড় নিলাম। রথের মেলা বসেছে। আজ বড়ো ভিড়।

সুধীন্দ্রনাথ দত্তের জীবনদর্শন

শিবনারায়ণ রায়

লোয়ার নদীর তীর বন্যায় ভেসে গেলে মেত্জ-এর বিশপ রায় দিয়েছিলেন যে লোকেরা রবিবারে গির্জায় যায় না ব'লেই এমন দুর্বিপাক ঘটেছে। ফ্লবেয়ার এই ঘটনাটিকে সর্বজনীন মূঢ়তার একটি উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করেছেন। সুপণ্ডিত ধর্মযাজকের ঐ ব্যাখ্যা নির্বোধের উক্তি মাত্র কিনা, আমার বিশ্বাস ফ্লবেয়ার-এর মৃত্যুর ত্রিপাদশতাব্দী পরেও তা নিয়ে তর্ক করার লোকের অভাব নেই। কিন্তু উভয়পক্ষই সম্ভবত স্বীকার করবেন যে এ-জাতীয় উক্তির পিছনে মানুষ এবং বিশ্বজগৎ সম্পর্কে যে-সব ধারণা সক্রিয়, কি অতীতে আর কি বর্তমানে খুব অধিকসংখ্যক মানুষ তাদের প্রভাব এড়াতে পারেনি। সোভম্ ও গোমরা-র ধ্বংস অবলম্বন ক'রে ওল্ড্ টেস্টামেণ্ট্-এ যে-কাহিনী কথিত হয়েছে, আর বিহারের ভূমিকম্প উপলক্ষে গান্ধিজীর উপলব্ধিগত বিখ্যাত ঘোষণা—একই দর্শনের সূত্রে গ্রথিত নয় কি ?

রকমফেরের কথা স্মরণে রেখেও উক্ত দর্শনের মূল প্রত্যয়গুলিকে মোটামুটি বোধ হয় এইভাবে উপস্থিত করা যেতে পারে। সত্য-মিথ্যা, ন্যায়-অন্যায়, সুন্দর-কুৎসিত—এ-সব মানবীয় কল্পনামাত্র নয়; এক মানবোত্তর সত্তার দ্বারা ধৃত হ'য়ে এরা নিত্যতা অর্জন করেছে। এই সত্তা সর্বজ্ঞ এবং সর্বশক্তিমান; প্রকৃতির ঘটনাবলী ও মানুষের ভাগ্য এরই অমোঘ নির্দেশের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। এই সত্তা (যাকে বিশ্বাসীরা ঈশ্বর ইত্যাদি নাম দিয়েছেন) আছে ব'লেই সত্য, শিব এবং সুন্দর স্থানকালপাত্রভেদে বিপরীতে পর্যবসিত হয় না। এই সত্তা মানুষকে ভুল করার সীমাবদ্ধ সামর্থ্য দান করেছে বটে, কিন্তু সে-ভুলের প্রায়শ্চিত্তও অবশ্যম্ভাবী। এই অসীম পরাক্রান্ত পুরুষের সর্বোত্তম সৃষ্টি মানুষ, এবং মানুষকে সার্থক করার উদ্দেশ্যে এই বিশ্বজগৎ পরিচালিত। মানুষের সীমাবদ্ধ জ্ঞান অনেক সময়ে তার স্রষ্টার বিধানের অর্থ ভেদ করতে না-পেরে কষ্ট পায়। কিন্তু যেহেতু ঈশ্বর স্বয়ং সত্য, শিব এবং সুন্দর, সেহেতু তাঁর দ্বারা সৃজিত এবং নিয়ন্ত্রিত এই বিশ্বের সমস্ত ঘটনাই উদ্দেশ্যসিদ্ধ এবং সুসংগত।

যুক্তি এবং অভিজ্ঞতার সমর্থন থাক বা নাই থাক, অধিকাংশ মানুষই এ-যাবৎ উক্ত প্রত্যয়াবলীকেই তাদের নৈতিক জীবনের মুখ্য অবলম্বনরূপে আশ্রয় ক'রে এসেছে। তবে সভ্যতার আদি যুগেই কিছু ভাবুকের মনে এ-সম্পর্কে সংশয় দেখা দিয়েছিল। সেদিনও তাঁরা সংখ্যায় ভারি ছিলেন না; এবং সম্প্রতিকালেও যে তাঁদের সংখ্যা খুব বৃদ্ধি পেয়েছে, এমন সিদ্ধান্ত করার কারণ নেই। এই ভাবুকরা লক্ষ্য করেছিলেন যে বিশ্বপ্রকৃতি যদি বা কার্য-কারণের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, তবু সেই শৃঙ্খলার পিছনে কোনো উদ্দেশ্যের উপস্থিতি প্রমাণাভাবে অসিদ্ধ। তা ছাড়া মানুষের বিকাশ দূরের কথা, তার অস্তিত্ব সম্পর্কেও এই জগৎ উদাসীন। ভালো-মন্দ, সুন্দর-অসুন্দর, এ-সব বিভেদের যদি কোনো মূল্য থাকে, তবে তা শুধু মানুষের কাছে; সূর্যালোক থেকে ধূলিকণা—কারো ব্যবহারে এই বিভেদের অস্পষ্টতম স্বীকৃতিও চোখে পড়ে না। মূল্যবোধ এবং মূল্যমানের উৎস মানুষ স্বয়ং; এবং মানুষী অস্তিত্বের বাইরে অন্য কোথাও এদের সমর্থন খোঁজা নিতান্ত পণ্ডশ্রম। ঈশ্বর মানুষী কল্পনার অন্যতম সৃষ্টিমাত্র। ফলে স্রষ্টাভেদে ঈশ্বরের ধারণাও মুশা থেকে যীশু, উপনিষদের ঋষি থেকে পাঁচালিকারের মনে ভিন্ন-ভিন্ন আকার পরিগ্রহ করেছে।

॥ দুই ॥

সুধীন্দ্রনাথ দত্ত স্পষ্টতই শেষোক্ত ভাবুকদের অন্যতম। তাঁর কাব্যাদর্শে ঐতিহ্যবোধ বিশেষ প্রাধান্য লাভ করেছিল বটে, কিন্তু ভারতীয় ভাবধারার যেটি প্রবলতম ঐতিহ্য সেটির সঙ্গে তাঁর মনের কোনো যোগ ছিল না। এই বিয়োগ যে কত গভীর এবং দুরতিক্রম্য তা বোঝার জন্য এই কৃষিনির্ভর দেশের সাধারণ অধিবাসীদের মানসসত্তার কথা স্মরণ না-করলেও চলে। ভারতবর্ষের আধুনিক ইতিহাসে যাঁদের সাধারণত ভাবনায়ক ব'লে স্বীকার করা হয়—রামমোহন থেকে রবীন্দ্রনাথ, দয়ানন্দ, তিলক, অরবিন্দ, গান্ধী অথবা রাধাকৃষ্ণন—তাঁদের মধ্যেও তাঁর আত্মীয় আবিষ্কার করা কঠিন। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর অন্তরঙ্গ পরিচয়ের সুযোগ ঘটেছিল; কনিষ্ঠের মনে শ্রদ্ধা এবং জ্যেষ্ঠের মনে স্নেহের অভাব ছিল না। তা সত্ত্বেও তিনি শ্রীযুক্ত

অমিয় চক্রবর্তীর মতো ঝোড়ো হাওয়া আর পোড়ো ঘরের মধ্যে মিলনক্রিয়ার কোনো কর্তা উদ্ভাবনে উৎসাহিত হননি। বস্তুত হিন্দু আধ্যাত্মিকতায় দীক্ষা নেওয়ার জন্য তাঁর পক্ষে রবীন্দ্রনাথের দ্বারস্থ হওয়ার কোনো প্রয়োজন ছিল না; তার জন্য পিতা হীরেন্দ্রনাথের "নিশ্চিন্ত বৈদান্তিক" উপলব্ধির উত্তরাধিকারই যথেষ্ট ছিল। কিন্তু তাঁর নিজের ভাষাতেই বলা যায় যে "আকৈশোর অদ্বৈতের অনির্বচনীয় আতিথ্যে উত্তাক্ত হয়ে" তিনি "অল্প বয়সেই অনেকান্ত জড়বাদের আশ্রয়" নিয়েছিলেন। এবং যে-বয়সে এদেশের স্ত্রী-পুরুষের পক্ষে পরলোকের চিন্তা একরকম অবশ্যম্ভাবী, তারই গণ্ডীর মধ্যে প্রবেশ করার পরও তাঁর আত্মজিজ্ঞাসা ব্রহ্মবাদের মাদকসেবনে প্রলুব্ধ হয়নি। ফলে এই অকম্প্র নাস্তিকতা তাঁর কাব্যে এবং ভাবনায় তীব্র নৈঃসঙ্গ্যের সঞ্চার করেছে। পরম্পরাকামী শিল্পীর সংস্কৃত ভাষার প্রতি গভীর অনুরাগ তাঁর রচনাকে সাধারণ পাঠকের নিকটবর্তী না-ক'রে ভাবুকের একাকীত্বকেই আরো প্রকট ক'রে তুলেছে।

অপর পক্ষে, বেদান্তের প্রতিক্রিয়ায় মার্ক্সবাদের সমাধান তাঁর কাছে গ্রহণীয় ঠেকেনি। মার্ক্সবাদ সামনের দরজা দিয়ে ঈশ্বরকে বিদায় দিলেও পিছনের দরজা দিয়ে ইতিহাসের পোষাকে ঈশ্বরকে আবার ঘরের মালিক হিসেবে মেনে নিয়েছে। নইলে সমাজতন্ত্রের অনিবার্যতা প্রমাণ করার জন্য বৈশ্বিক দ্বন্দ্বপ্রক্রিয়ার প্রত্যয় দরকার হ'ত না। দ্বিতীয়ত, মার্ক্সবাদে ব্যক্তি নিমিত্তমাত্র; গোষ্ঠীর একান্ত গতিপথে তার অনন্যতা অস্বীকৃত। তৃতীয়ত, মার্ক্সবাদ উদ্দেশ্য এবং উপায়ের সংগতি সম্পর্কে উদাসীন; এই দুইয়ের মধ্যে বৈপরীত্যের ফলে যে উদ্দেশ্য শেষ পর্যন্ত বিকৃত হ'তে বাধ্য, অভিজ্ঞতা-সমর্থিত এই সহজ সত্যটিকে মূল্য দিতে মার্ক্সবাদীরা গররাজি। ফলে, আরো অনেক সমকালীন ভাবুকের মতো প্রথম দিকে মার্ক্সবাদের প্রতি আকৃষ্ট হ'লেও, উক্ত দর্শনে বেশি দিন আস্থা রাখা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি।

এ-অবস্থায় তাঁর সামনে আরো দুটি সুপ্রসিদ্ধ বিকল্প উপস্থিত ছিল। তাঁর লেখা প'ড়ে এবং তাঁর সঙ্গে আলাপ-আলোচনা-সূত্রে যতটুকু বুঝতে পেরেছি, উভয় বিকল্পের দিকেই তিনি মাঝে-মাঝে আকৃষ্ট বোধ করলেও কোনোটিই শেষ পর্যন্ত গ্রহণ করেননি। প্রথম বিকল্প অনুসারে ঈশ্বরের অনস্তিত্ব থেকে এই

সিদ্ধান্ত করা যায় যে সত্য-মিথ্যা, সুন্দর-অসুন্দর, ন্যায়-অন্যায়ের কোনো নিত্য এবং অবিকল মানদণ্ড নেই। স্থান, কাল, পাত্র এবং বিচারকের মানসিক অবস্থা অনুসারে এই মানদণ্ড পরিবর্তিত হয়। ফলে উৎকৃষ্ট অথবা অপকৃষ্ট, সার্থক অথবা ব্যর্থ, এ-সব বিভেদ নিতান্তই আপেক্ষিক। আসলে, ঈশ্বরের মতোই, কোনো শাশ্বতিক মূল্যমান অলীক কল্পনা মাত্র। অভ্যাস, অথবা ভয়, অথবা সামাজিক নিয়ন্ত্রণের প্রভাবে অধিকাংশ মানুষ যে-সব নির্দেশকে শ্রেয় ব'লে মেনে নিয়ে থাকে, তারা কোনো হিসেবেই স্বতঃসিদ্ধ নয়। অতএব সংসারে সব-কিছুই তুল্যমূল্য। আমাদের নিতান্ত ব্যক্তিগত খোলোলাগা এবং মন্দলাগায় সার্বলৌকিকতা আরোপ ক'রে আমরা যখন ভালোত্ব এবং মন্দত্ব কল্পনা করি, তখন তাতে শুধু আমাদের মুগ্ধ অহংকারই প্রকাশ পায়, আরোহী যুক্তির সত্তাব্যতাও প্রমাণিত হয় না।

এই সর্বগ্রাসী শুভনাস্তিক্যে সুধীন্দ্রনাথের মন সায় দেয়নি। উৎকৃষ্ট এবং নিকৃষ্টের কোনো সর্বজনগ্রাহ্য মানদণ্ডের প্রতিষ্ঠা আমাদের সাধ্যায়ত্ত হোক অথবা না হোক, এ-দুয়ের প্রভেদ যে অনস্বীকার্য সে-সম্পর্কে তাঁর মনে সংশয় ছিল না। তিনি জানতেন যে বিশ্বপ্রকৃতি শুভাশুভ সম্পর্কে নিরপেক্ষ; যে মানুষের ইতিহাসে ভালো এবং মন্দ এমনভাবেই জট পাকিয়ে আছে যে একটিকে অন্যটি থেকে পৃথক করা মানুষের পক্ষে প্রায় সাধ্যাতীত; যে মানুষের চরিত্রে অশুভের আকর্ষণ শুভপ্রবৃত্তির চাইতে অনেক প্রবল। তা সত্ত্বেও তিনি কখনো স্বীকার করেননি যে মূল্যায়নের চেষ্টা নিরর্থক, অথবা ভালো এবং মন্দের মৌলিক পার্থক্য অনুপস্থিত। পার্থক্য আছে, অথচ তা নির্ণয়ের কোনো নিশ্চিত, নিত্য এবং সার্বলৌকিক মানদণ্ডের প্রতিষ্ঠা আমাদের অসাধ্য; পার্থক্যবোধ আছে, অথচ তারই সাহায্যে অশুভের সংক্রমণ থেকে শুভকে বাঁচাতে আমরা অসমর্থ—এই বোধের যন্ত্রণা তাঁর ভাবুকতাকে চিহ্নিত করেছে। কিন্তু এই যন্ত্রণাবোধ তো তাঁর পক্ষেই সম্ভবপর যিনি শ্রেয়ের স্বতঃসিদ্ধতায় আস্থাশীল। ফলে যদিচ "চরাচরে নেতির বিস্তার নির্বিকার", যদিচ "কৃতান্ত আজ ব্যক্ত সর্বঘটে", যদিচ শুভবাদীদের সমস্ত হিসেব বানচাল ক'রে সাম্প্রতিক ইতিহাসে "বিনষ্টির চক্রবৃদ্ধি" নিতান্ত প্রত্যক্ষ, যদিচ

অসূর্যের পুরাণ ঝলক
হিরণ্ময় পাত্র ঠেলে ঠেলে
দেয় মেলে
অন্ধতম অতিপ্রজ্ঞ বন্দীকে বন্দীকে…

তবু "স্বভাবের অনুমোদনেই" এই নাস্তিক কবি সেই যৌবরাজ্যের স্বপ্ন দেখতে পারেন—

ন্যায়, ক্ষমা, মিতালি, মনীষা
যার মুখ্য অবলম্ব, জিজীবিষা
সামান্য লক্ষণ…
পরিস্রুত সুরা
নিদাঘের অফুরন্ত দিন,
সুবর্ণাধারার শষ্পশ্যামল পুলিন
উৎপিঞ্জর তারুণ্যের লাস্যময় লীলায় মুখর…

এবং এ-স্বপ্ন যিনি দেখতে পারেন, শ্রেয় যে কেন শ্রেয় তা তিনি ব্যাখ্যা করতে পারুন অথবা না পারুন, শ্রেয় যে 'শ্রেয়'ই বটে এ-সম্পর্কে তিনি অন্তত নিঃসংশয়।

দ্বিতীয় বিকল্প অনুসারে মনুষ্যজাতির একটি সার্বলৌকিক সত্ত্ব (essence) বর্তমান, এবং মূল্যজ্ঞান এই মনুষ্যত্বের বিশিষ্ট লক্ষণ। বিশ্বপ্রকৃতিতে আমাদের শ্রেয়োবোধের কোনো সমর্থন নেই বটে, কিন্তু মূল্যায়ন মানবচেতনার স্বধর্ম। যা মনুষ্যত্বের স্ফুরণে সাহায্য করে, তা-ই ভালো ; যা এই বিকাশ ব্যাহত করে তা-ই মন্দ। প্রতি মানুষের মধ্যেই নিজের মনুষ্যত্বকে প্রস্ফুটিত করার শক্তি নিহিত আছে। এই শক্তির কোনো আধিদৈবিক উৎস নেই, কিন্তু মানুষের ক্ষেত্রে এর সার্বিক উপস্থিতি সংশয়াতীত। মানুষের মনুষ্যত্বই তাকে সত্য, শিব এবং সুন্দরের সাধনায় অনুপ্রাণিত ক'রে থাকে, এবং এরই সমর্থনে উৎকর্ষ-নিকর্ষ বিষয়ে মানুষের বিচার নির্ভরযোগ্যতা লাভ করে। গ্রীক-রোমক সভ্যতার কাল থেকে আধুনিক যুগ পর্যন্ত অধিকাংশ মানবতন্ত্রী দার্শনিক এই বিকল্পপ্রত্যয়ের সাহায্যে মানুষের দ্বৈপায়ন অস্তিত্বকে বৈশ্বিক শূন্যবাদের আক্রমণ থেকে রক্ষা করার প্রয়াস পেয়েছেন।

এই বিকল্পের প্রতি সুধীন্দ্রনাথের সহানুভূতি থাকলেও এর কেন্দ্রীয় প্রত্যয়

তাঁর কাছে অভিজ্ঞতাসিদ্ধ ব'লে ঠেকেনি। মানুষ সম্পর্কে কোনো সামান্য সিদ্ধান্তে তাঁর আপত্তি ছিল। রাসেল স্ট্রীট অথবা থিয়েটার রোডের অন্তরঙ্গ পরিবেশে শীতকালের অনেক মধ্যরাত পেরিয়ে সুধীন্দ্রনাথ এবং মানবেন্দ্রনাথ রায়ের উচ্চকিত আলোচনা শুনেছি। মানবতন্ত্রী ঐতিহ্যে উভয় মনীষীরই সুগভীর আস্থা থাকা সত্ত্বেও প্রথমোক্তের ঝোঁক ছিল বিশেষের ওপরে, এবং দ্বিতীয়জন ছিলেন সামান্যের সন্ধানী। উৎকর্ষের জন্য আগ্রহ মনুষ্যমাত্রেরই সাধারণ লক্ষণ, সুধীন্দ্রনাথের মতে এবংবিধ প্রস্তাবের পিছনে অভিজ্ঞতার সমর্থন মেলে না। কারণ যদিচ "যদৃচ্ছালব্ধ উপকরণের ব্যবস্থাপনের" দ্বারা মানুষ তার সৃজনক্ষমতার পরিচয় দিয়ে থাকে, তবু সঙ্গে-সঙ্গে এটাও লক্ষ্য না-ক'রে উপায় নেই যে অধিকাংশ মানুষের আচরণে উক্ত ক্ষমতার কোনো প্রমাণ দেখা যায় না, এবং মানুষ "বীভৎসের জনক, মিথ্যার পৃষ্ঠপোষক এবং অমঙ্গলের কর্মকর্তা"-ও বটে। ফলে যে-নারীর "বভ্রু কেশে অস্তগত সবিতার উত্তরাধিকার", সেও অলক্ষ্যে নিশ্চিহ্ন হ'য়ে যায়, এবং মহৎ নেতাকে পুরাকালীন শহরের গলঘণ্ট কুষ্ঠরোগীর মতো উদ্বাস্তু হ'য়ে দেশে-দেশে ঘুরে মরতে হয়। ইতিমধ্যে সংগঠিত বালখিল্যের দল মশালের ধূমার্ত আলোকে সমস্বর নামসংকীর্তন করতে-করতে বিকট উল্লাসে সভ্যতার সমাধি রচনা করে, ব্যক্তির ধ্বংসাবশেষে অতিবেল কারা মেরু পর্যন্ত প্রসারিত হয়। এ-জাতীয় সুপরিচিত অভিজ্ঞতার অনুষঙ্গে সার্বলৌকিক মনুষ্যধর্মের কল্পনা নিতান্তই অবাস্তব।

তা হ'লে, মূল্যের উৎস কোথায়, তার লক্ষণ কী, তার নিত্যতা এবং সামান্যতা কোন প্রমাণের ওপরে প্রতিষ্ঠিত? সুধীন্দ্রনাথ বহুজ্ঞ এবং ভাবুক হ'লেও প্রচলিত অর্থে দার্শনিক ছিলেন না, কোনো সুবিন্যস্ত দার্শনিক মতবাদ তিনি গ'ড়ে তোলার চেষ্টা করেননি। তবে তাঁর বিভিন্ন কবিতা এবং প্রবন্ধ থেকে অনুমান করা যায় যে তাঁর বিচারে মূল্যের একমাত্র উৎস হ'ল ব্যক্তির চেতনা। "অভিজ্ঞতা এবং অভিব্যক্তির অদ্বৈত" তার প্রধান লক্ষণ, এবং একদিকে "অবৈকল্যের ঐকান্তিক উপলব্ধি" আর অন্যদিকে বিভিন্ন দেশকালের অপরাপর মূল্যান্বেষীর সমর্থনই মূল্যস্রষ্টার মনে মূল্যের নিত্যতা এবং সামান্যতা বিষয়ে প্রত্যয়ের সঞ্চার করে। শেষোক্ত প্রত্যয় যুক্তিসিদ্ধ কিনা, শেষ পর্যন্ত

এ-বিষয়ে তাঁর মনে গভীর সংশয় ছিল। কিন্তু ভালোমন্দের পার্থক্য যে আমাদের খামখেয়ালের প্রকাশ মাত্র, এমন সিদ্ধান্তেও তাঁর মন যেমন নায় দিতে পারেনি, তেমনি যা মূল্যবান তার উদ্ভাবনা এবং উপলব্ধি যে মনুষ্য-মাত্রেরই সামান্য ধর্ম নয়, বরং তা যে বিশেষ সাধনাসাপেক্ষ এবং এ-যাবৎ অত্যন্ত অল্পসংখ্যক ব্যক্তিই সে-সাধনায় নিজেদের নিয়োজিত করেছে—এ-সম্পর্কে তিনি সবিশেষ সচেতন ছিলেন।

সর্বসাধারণের সংস্কারগত ঐক্য নয়, সংখ্যালঘু বিদগ্ধ ব্যক্তিদের সমর্থনের দ্বারাই যে মূল্যের সামান্যতা এবং দায়িত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়, এ-কথা বলার জন্য তাঁর "প্রগতিবাদী" সমালোচকরা তাঁর বিরুদ্ধে বর্ণভেদাশ্রয়ী প্রতিক্রিয়াশীলতার অভিযোগ এনেছিলেন। কিন্তু সুধীন্দ্রনাথ মানতেন যে "মহৎ মানুষও মানুষ, অমানুষ বা অতিমানুষ নয়;...তাঁর মনুষ্যত্ব সীমাবদ্ধ, তার জন্যে মানসমষ্টির প্রতিযোগে তাঁর পরাজয় অনিবার্য।" একদিকে "আত্মম্ভরি জীবকোষের মতো অহংসর্বস্ব ব্যক্তিও নিজের অজ্ঞাতসারেই মৃযূর্ষু; অপরদিকে জন্মসূত্র নয়, তন্মনস্ক অনুশীলন এবং নিরলস পরীক্ষানিরীক্ষার দ্বারাই ব্যক্তি উৎকর্ষের উদ্ভাবক এবং অনুরাগী হ'য়ে ওঠে। অর্থাৎ সংস্কৃতির বর্ধন এবং পোষণ যাঁদের ওপরে মুখ্যত নির্ভর করে, তাঁদের আভিজাত্য বংশগত উত্তরাধিকার নয়, তা সাধনার পুরস্কার। এবং বিদগ্ধজনের অনুভবে সংস্কৃতি স্বতঃসিদ্ধ ঠেকলেও সাধারণের চেতনায় সে-অনুভব সঞ্চারিত না-হওয়া পর্যন্ত মুষ্টিমেয়র উৎকর্ষের ফল মানব-ইতিহাসে উদ্বাগী।

। তিন।

তা সত্ত্বেও আমার বিশ্বাস যে মানবীয় মূল্যমানের লোকায়ত স্বতঃসিদ্ধতা এবং বিদগ্ধ-সম্প্রদায়ের আভিজাত্য প্রমাণ করাই যদি সুধীন্দ্রনাথের মুখ্য উদ্দেশ্য হ'ত, তা হ'লে তিনি হয়ত বাংলা দেশে একটি বিশিষ্ট দার্শনিক চিন্তাধারার প্রবর্তক হিসেবে প্রসিদ্ধি লাভ করতেন, কিন্তু সে-ক্ষেত্রে তাঁর প্রতিভা কাব্যে স্ফুরিত হ'ত না। "আমি আজন্ম যুক্তিকামী," তিনি বার-বার এ-কথা বলা সত্ত্বেও তাঁর চৈতন্যে যুক্তির শৃঙ্খলার চাইতে ব্যর্থতার বেদনা অনেক বেশি প্রবল। তিনি জানতেন যে "স্বগত সামঞ্জস্য" তাঁর অন্বিষ্ট এবং অনায়ত্ত।

ক্ষণবাদ এবং সোঽহংবাদের মধ্যে তিনিও কোনো বিচারসহ সেতুবন্ধ রচনা করতে পারেননি। শাশ্বতের উপলব্ধি ছাড়া সোঽহংবাদের প্রতিষ্ঠা বোধ হয় অসম্ভব; এবং ক্ষণবাদীর কাছে সব-কিছুই নশ্বর এবং অস্থায়ী। নিত্যের নিশ্চিতি ছাড়া আমাদের সমস্ত প্রয়াস অর্থহীন, অথচ আত্মপ্রতারণায় যারা গররাজি, অব্যয়ে বিশ্বাস তাদের অসাধ্য—এই সমাধানহীন আত্মিক বিরোধের দুঃসহ চেতনা তাঁর কাব্যে যেমন সমৃদ্ধ অভিব্যক্তি লাভ করেছে, প্রাচীন অথবা আধুনিক ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাসে তা তুলনাহীন। রবীন্দ্রনাথ অথবা তাঁর পূর্ববর্তী ভারতীয় কবিদের রচনায় এই বোধ অনুপস্থিত; এবং সমকালীন বাঙালী কবিদের মধ্যে অঙ্গুলিমেয় কয়েকজন এই বোধের দ্বারা পীড়িত বটে, কিন্তু মতখানি অনুভূতির গভীরতা এবং তার সঙ্গে উক্তির সাযুজ্য ঘটলে প্রাতিস্বিক যন্ত্রণা কাব্যের সংবেদ্য সামান্যতা অর্জন করে, সুধীন্দ্রনাথ ছাড়া তাঁদের মধ্যে আর কারো কবিতায় তার স্বাক্ষর আমার অন্তত চোখে পড়েনি।

কিন্তু সুধীন্দ্রনাথের কবিতার আলোচনা এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়। প্রচলিত অর্থে তিনি দার্শনিক না-হ'লেও যেহেতু দার্শনিকতা তাঁর কাব্যের অন্যতম প্রধান লক্ষণ, এবং তাঁর কাব্যের আধারের ওপরে পূর্বসূরিদের প্রচুর প্রভাব থাকলেও যে-অনুধ্যান উক্ত কাব্যের আধেয়-বেদনার মূল উৎস, বুদ্ধ এবং চার্বাকের কথা স্মরণে রেখেও ভারতীয় ভাবপরম্পরার সঙ্গে তার যোগ আবিষ্কার যেহেতু দুঃসাধ্য,—সে-কারণে এই প্রবন্ধটিকে হয়তো বা তাঁর কবিতা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনার অসমাপ্ত মুখবন্ধ রূপে গণ্য করা যেতে পারে। অজন্তার অন্ধকার গুহাগাত্রে নির্বোধ সময় এবং বর্বর মনুষ্যকুলের আক্রমণলাঞ্ছিত চিত্রাবলীর মধ্যে শিল্পীর ট্র্যাজিক পুরুষকার এবং অমৃতের উদ্ভাবনায় ক্ষণবাদীরও ঐকান্তিক আগ্রহের স্বাক্ষর দেখে সুধীন্দ্রনাথের কথা স্মরণ করেছি। তিনি জানতেন "নিষ্ঠার পরিণতি নির্বেদ", অথচ "স্বতঃসিদ্ধের সাধনাই স্রষ্টাপুরুষের স্বধর্ম।" যে-অন্বেষণসূত্রে এই পরস্পরবিরোধী প্রত্যয়-যুগলের জন্ম, এখানে তারই কিঞ্চিৎ পরিচয় দেবার চেষ্টা করেছি। যদি কখনো সামর্থ্যে কুলোয় এবং উপযুক্ত অবসর মেলে, তা হ'লে সেই জিজ্ঞাসাজাত বিরোধের দুঃসহ অনুভূতি যে-কাব্যদেহে অভিব্যক্ত হয়েছিল, একদিন সে-সম্পর্কে আলোচনার অভিলাষ রইল।

সুধীন্দ্রনাথের মন

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত

সুধীন্দ্রনাথের গদ্য এবং কবিতায় একই অবিভক্ত এবং অবিভাজ্য মন কাজ করেছিলো। তিনি নিজে অবশ্য এক জায়গায় বলেছিলেন : 'গদ্য-পদ্যের সসীকরণ-চেষ্টায় ওয়র্ড্‌স্‌ওয়র্থ কৃতকার্য হননি ; কারণ দৈনন্দিন ভাষা আর কাব্যের ভাষা বস্তুতই বিভিন্ন, বৈধ মতেই বিভিন্ন ; এবং এই প্রভেদ গদ্যের ও পদ্যের স্বভাবগত। গদ্যের অবলম্বন বিজ্ঞান, কাব্যের অদ্বিষ্ট প্রজ্ঞান। তাই গদ্য চলে যুক্তির সঙ্গে পা মিলিয়ে, আর কাব্য নাচে ভাবের তালে তালে…।' কিন্তু প্রায় পরমুহূর্তেই উচ্চারণ করেছিলেন : 'একথা অবশ্যস্বীকার্য যে আবেগ-প্রবণ গদ্য কাব্য-পদবাচ্য।' সুধীন্দ্রনাথের রচনায়, একই কারণে, আধুনিক যুগের 'বিভক্ত বোধ' (dissociation of sensibility) নেই। দেকার্তের পর ভাবরাজ্য ও চিন্তারাজ্য, কবিতা এবং গদ্যের মধ্যবর্তী ভেদরেখা দুস্তর হ'য়ে উঠেছে, এ-কথা অস্বীকার করবার উপায় নেই। লক্‌প্রমুখ চিন্তানায়কেরা যে-নালিশ তুলেছিলেন, সেটি, অ-কবিজনোচিত হ'লেও, ভাববার মতো। কবিতা, লক্‌ বলেছিলেন, রমণীয় এবং মনোমোহন ভাবনা উপস্থিত করতেই এসেছে ; যুক্তিসংগত যা-কিছু তার সঙ্গে কবিতার যেন যুক্তভাবে করণীয় আর-কিছুই নেই। ফলত, কবিতা যেন কোথায় তার গরিমা ও গুরুত্ব হারালো, ঋতকথনের দায়িত্বভার থেকে মুক্ত হ'য়ে গেলো। বাংলা কবিতা সম্বন্ধে এ-বিচার কতোটুকু খাটে, সেটা সংক্ষেপে বিচার করছি। রবীন্দ্রনাথের মধ্যে ঊনবিংশ শতাব্দীর সংস্কারকবৃত্তি এবং সোপার্জিত শিল্পসংবিৎ, এ-দুয়ের মিলন দেখতে পাই। কিন্তু এই মিলনের জন্য অনেক সময়েই তাঁর কবিতাকে কঠিন মূল্য দিতে হয়েছে। সদুক্তির অপ্রাসঙ্গিক ভূমিকাকেও তাই তাঁর একাধিক প্রেমের কবিতা সম্পূর্ণ উপেক্ষা করতে পারেনি। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কবিতায় কখনো-কখনো এসে-যাওয়া গদ্যের এই অবাঞ্ছিত সহযোগিতার কথা বলছি না। অন্তর্লীন সাক্ষ্যবিচারে, তাঁর গদ্য এবং কবিতার মধ্যে যে-পারস্পরিক দেয়া-নেয়া ও সম্প্রীতিসম্পর্ক, সেটিও তাঁর মনের অখণ্ড মণ্ডলটিকে স্পষ্ট করে। 'গীতাঞ্জলি'-'গীতিমাল্যে'র একাধিক কবিতার পাশে 'পথের সঞ্চয়'-

শীর্ষক সংকলনের একাধিক গদ্যরচনার যে-যোগ, তা শুধুমাত্র সমকালীনতার বহিঃসূত্রে সাধিত নয়, তার শিকড় আরো গভীরে। কিন্তু একটু তলিয়ে দেখলে এই অভিন্ন বৃত্তবিধৃতির মূল রহস্য আমরা বুঝতে পারবো। 'কালান্তর' প্রবন্ধের শেষ অনুচ্ছেদের সঙ্গে 'প্রান্তিক' কাব্যগ্রন্থের সর্বশেষ কবিতাটির যে-সাদৃশ্য, তা থেকে একটিকে অপরটির ভাবানুবাদ বললে অত্যুক্তি হয় না। রবীন্দ্রনাথ গদ্যকে কাব্যশ্রী দিয়ে দীক্ষিত ও শুদ্ধশীল ক'রে নিয়েছেন, তাঁর গদ্যকে নির্ভরশীল ক'রে তবেই তার মর্যাদা বাড়িয়েছেন। পক্ষান্তরে, সুধীন্দ্রনাথ গদ্যকে কুসুমাঞ্জলি দিয়েই ক্ষান্ত হননি, কবিতাকেও গদ্যের কঠোর ব্রহ্মচর্যের বীজমন্ত্র দিয়েছিলেন। এখানে দৃষ্টান্ত দিয়ে কথাটা স্পষ্ট করতে চাই :

> মনুষ্যসংসারে মানুষই নিত্য, মনুষ্যসমাজে মানুষই সেব্য, মানুষিক মঙ্গলই মনুষ্যধর্মের একমাত্র লক্ষ্য—এই মহাসত্যে যে-জাতির শিল্প ও সাহিত্য, বিজ্ঞান ও দর্শন, জীবন ও মরণ অনুপ্রাণিত, তার অভ্যুত্থান স্বভাবতই অনিবার্য। কোনও লুপ্ত অমরার গুপ্ত আকর্ষণে সে-দিগ্বিজয় দিশা হারায়নি, সেই জন্যে সারা জগৎ জেগেছিল তার শঙ্খনাদে : আকাশকুসুমে সে-জয়মাল্য গাঁথা হয়নি, তাই কৃপণ প্রকৃতিও তাকে ভেট পাঠিয়েছিল মুক্ত হস্তে ; তার রাখী-বন্ধনে পরমার্থ আর পুরুষার্থের চির বিবাদ মিটেছিল, কাজেই অজানার অভিসারে বেরিয়ে, বুদ্ধি বিপ্রলাপেও ভয় পায়নি। ('মনুষ্যধর্ম', কুলায় ও কালপুরুষ, ১৩৫ পৃষ্ঠা)

> অকূল পাথারে অযাচিত সাম্রাজ্য এরা বাঁচে
> যারা জিতেছিল, অন্তত তাদের অনন্য সখ্য
> ছিল প্রাণপাত পৌরুষ এবং রুদ্র কৌতূহল—
> নিতান্ত নিরুপলক। তরল অনলে পরিণত
> থলমল জল ; গলিত অম্বরতল ; অনুগত
> দিগ্বধূর আঁখি ছলছল কষ্টকল্পনায় ; মেঘে
> অন্তর্হিত চূড়া, পদান্ত উর্মির মুখর উদ্বেগে
> প্রতিচ্ছিত অন্তগিরি, ইত্যাদি বিবাদী লক্ষণের
> অলৌকিক নির্বিরোধ তথা সে-সময়ের জের
> স্মিত বিদেশিনীর অভয়ে, এবং সোনার তরী
> তাদের ডাকেনি অজানার অভিসারে। হিংস্র অরি
> বন্দরে বন্দরে, অবিশ্রান্ত অনুচর, অবহেলা
> চরমে নিশ্চিত জেনেই বেরিয়েছিল তারা। ('ঘর্মান্তি', সংবর্ত)

উৎকলিত প্রথম অংশটি দ্বিতীয় অংশ থেকে কুড়ি-একুশ বছর আগে লেখা।

সুধীন্দ্রনাথ একই রচনা বারংবার নতুন ক'রে লিখেছেন। দুঃসাহসের মতো ঠেকলেও, এমন কথা ব'লে ফেলতে ইচ্ছে করছে, দ্বিতীয় অংশটি প্রথম অংশের পুনর্লিখন ; এরা একই রচনার দুটি পাঠভেদ। ম্যাথু আর্নল্ড চতুর্গানন গদ্যের মুখমণ্ডলে নিয়মানুবর্তিতা (regularity), সামঞ্জস্য (uniformity), স্বচ্ছতাগুণ (precision), এবং ভারসাম্য (balance) লক্ষ্য করেছিলেন। সুধীন্দ্রনাথ তাঁর কবিতায় উল্লিখিত গদ্যের সমস্ত লক্ষণ চরিতার্থ করেছেন। মালার্মে তাঁর সচেতন সাধ্য হওয়া সত্ত্বেও তাঁর নিজের কবিতায় অনুরূপ একটিও দ্ব্যর্থদ্যোতক তথা রহস্যাবৃত পংক্তি পাওয়া যাবে কিনা সন্দেহ।

মালার্মের নন্দনতত্ত্বের সঙ্গে সুধীন্দ্রনাথের ভাবনার একটিই মাত্র সাদৃশ্য লক্ষ্য করি। 'কবিতা থেকে খেয়ালের সমস্ত অস্থিতা ও অমিতাচার মুছে ফেলে একটি ছন্দোময় সমগ্রতা রচনা করতে হবে,'—মালার্মে এটাই চেয়েছিলেন। তাঁর সংকেত-সরণী রোমান্টিকতারই একটা স্বাভাবিক পরিণতি, এ-কথাটা একরকম ধ'রে নেয়া হয়েছে। কিন্তু এ-কথা বললে বোধ হয় অন্যায় হবে না যে উক্ত সংকেতমার্গ রোমান্টিকতার ক্লাসিক পরিণতি। রোমান্টিক মনোভঙ্গির মধ্যে যা-কিছু অবান্তর, উচ্ছ্বসিত এবং অসংলগ্ন—তাকে সমূলে উচ্ছেদ ক'রে মালার্মে তপঃক্লিষ্ট হ'য়ে গিয়েছিলেন। তাঁর কবিতার মধ্যে সেই তপস্যাজনিত কৃশতা। এবং সুধীন্দ্রনাথের কবিতার মধ্যেও সেই ক্লান্ত বিভূতি। মালঞ্চের মালাকর এঁরা কেউ নন, আশ্রমের তাপস।

বুদ্ধদেব বসু বলেছেন, সুধীন্দ্রনাথের মধ্যে রোমান্টিক এবং ক্লাসিক—এই দুটি আপাতবিরোধী ধারণা মিলিত হয়েছে। কিন্তু, প্রকৃত প্রস্তাবে, সুধীন্দ্রনাথের ধ্রুপদী মনে রোমান্টিক কাব্যের উপাদান বা প্রস্তুতি দ্রবীভূত হয়েছিলো, লীন হ'তে পেরেছিলো। তাঁর ধ্রুপদী ব্যক্তিত্ব সমস্ত সময়েই ব্যক্তিগত আবেগকে অগস্ত্যের মতো শুষে নিতে ব্রতী হয়েছিলো। এখানেই জীবনানন্দের সঙ্গে তাঁর পার্থক্য। জীবনানন্দের কবিতা মূলত ব্যক্তিস্বাশ্রয়ী এবং তন্মাত্রিক (elemental)। সুধীন্দ্রনাথ উপাদানকে ধ্রুপদী কাব্যানুশাসনে বলয়িত করেন, ব্যক্তিগত সংলগ্নশীলতা নিষ্কাশিত ক'রে ফেলেন, প্রায় যেন নির্বেদের গৌরীশঙ্করচূড়া থেকে তাকে বিশ্লেষণে-বিশ্লেষণে নৈর্ব্যক্তিক ক'রে তোলেন। উত্তম পুরুষেই তিনি কথা বলেছেন, কিন্তু তাতেই তাঁর কবিতা 'ব্যক্তিগত'

প্রমাণ হয় না। নিজেকে এমন নিরপেক্ষভাবে তাঁর সমকালীন অপর কোনো বাঙালি কবিই দেখেননি। রসোত্তীর্ণ লিরিকে 'আমি' আর 'আমি' থাকে না—অন্য কেউ হ'য়ে যায়। তা ছাড়া, বাইবেলের সংবক্ত এবং বিধুর স্বগত গীতিগুচ্ছের কথা মনে রেখে রিচার্ড গ্রীন ম্যুলটন যে-প্রশ্ন তুলেছিলেন সেটি, সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র প্রসঙ্গ সত্ত্বেও, এখানে পুনরুত্থাপিত হ'তে পারে,—"Monodies of experience are given us in the first person : who is the 'I' that speaks ? And whom therefore are we to picture as passing through the experiences ?"

কারুকৃতিকেই আমরা ধ্রুপদী বলি। ল্যাণ্ডরের ভাষায় : 'The name (classical) is graven on the workmanship.' সুধীন্দ্রনাথের রচনার প্রধান শর্ত কারুকৃতি। প্রাচীন ও মধ্যযুগের লাতিন সাহিত্যে suasoriae ব'লে একরকম কাব্যধারা দেখা গিয়েছিল। কোনো-একটা গৃহীত বিষয়কে উপজীব্য ক'রে কবিবৃন্দ তাঁদের বাগ্মিতা প্রকাশ করতেন। সেই কবিরা নিজেদের একটা প্রদত্ত পরিবেশে স্থাপন ক'রে বিশেষ ধরনের একটা বাক্‌ভঙ্গিতে নিজ-নিজ প্রতিক্রিয়া অভিব্যক্ত করতেন। ওভিদ যেমন তাঁর 'হেরোইদেস'-এর বিভিন্ন পত্রাবলীতে করেছেন। তাঁর অলংকৃত রোদন, চিত্রিত একাকীত্ব, সমস্তই এই কাব্যধারার রেখালেখ্য। অথচ আজ আমরা জানি, এই বিক্ষোভপুঞ্জের কণামাত্রও তাঁর গোপন হৃদয় থেকে নিঃসৃত নয়।

রোমক রাজ্যকাল থেকে ফরাসি বিপ্লবের অধ্যায় পর্যন্ত য়ুরোপীয় সাহিত্য-সাধনের মূল ধারাটি বিন্যায়তনের অঙ্গনে অলংকারশাস্ত্রের অভিভাবকত্বে প্রবাহিত হয়েছিলো। কখনো সে তার সজীবতা হয়তো হারিয়েছে, কখনো রীতিবৈচিত্র্য। কিন্তু সে যে একটি পুণ্যদা নর্মদা নদীর মতো বিভিন্ন শিল্পীকে জাগরূক রেখেছিলো, তাতে সংশয় নেই। সুধীন্দ্রনাথ এই সময়-সম্মানিত নদী থেকে অঞ্জলি ভ'রে তীর্থসলিল নিয়েছিলেন। তাই তাঁর কবিতা ব্যাকরণের দেবদাসী। তাই তাঁর কবিতা প্রতিপাদ্য বাক্যের প্রথমাংশের (protasis) সঙ্গে পরবর্তী অংশের (apodosis) নিরবচ্ছিন্ন অন্বয়ে উদ্‌গ্রীব। শুধু তাই নয়, এক বাক্যের সঙ্গে পরবর্তী বাক্যের যোগও কংক্রীটের সেতুর মতো ক'রে নেওয়ার জন্য সমুচ্চয়ী অব্যয়ের প্রাচুর্য। সংস্কৃত

অলংকারশাস্ত্রোক্ত ধ্বনি সুধীন্দ্রনাথের কবিতায় উপস্থিত। তাঁর কবিতা সেই অর্থেই ধ্বন্যালোকে দীপ্ত। শুধু সে-দিক থেকেই নয়, সংস্কৃত কবিতার অপরাপর অনেক বৈশিষ্ট্যই তিনি অঙ্গীকার ক'রে নিয়েছিলেন। এক ঋতুর উত্তরাধিকার কী ক'রে পরবর্তী ঋতুতে বাহিত হ'য়ে যায়, তার উদাহরণ দিতে গিয়ে, বর্ণনাত্মক কবিতার নজির হিসেবে, রাজশেখর তাঁর 'কাব্যমীমাংসা'য় একটি কবিতা উদ্ধৃত করেছেন। উদ্ধৃত কবিতাটিতে বর্ণনীয় বিষয় : কী ক'রে হেমন্ত ও শীত ঋতুর সমস্ত লক্ষণ বসন্তকালেও ব'য়ে যায়, র'য়ে যায়। কবিতাটি, সুধীন্দ্রনাথের একটি কবিতার অংশসমেত, এখানে উপস্থিত করি :

> ধূনানঃ কাবেরীপরিসরভুবশ্চন্দনতরূন্
> মরুন্মন্দঃ কুন্দপ্রকরমকরন্দানবকিরণ্।
> প্রিয়ক্রীড়াকর্ষচ্যুতকুসুমমামূলসরলং
> ললাটে লাটীনাং লুঠিতমলকং তাণ্ডবয়তি॥
>
> (সদুক্তিকর্ণামৃত)

> বৈদেহী বিচিত্রা আজি সংকুচিত শিশিরসন্ধ্যায়
> প্রচারিল আচম্বিতে অধরার অহেতু আকূতি :
> অস্তগামী সবিতার মেঘমুক্ত মাঙ্গলিক দ্যুতি
> অনিত্যের দায়ভাগ রেখে গেল রজনীগন্ধায়॥
>
> ('হৈমন্তী', অর্কেস্ট্রা)

দুটি শ্লোকই ভঙ্গিতে সদৃশ, আবেগের অনপব্যয়ে যথাযথ। সুধীন্দ্রনাথের কবিতার মিতালেখ্যধর্মিতা, এবং প্রতি স্তবকের শেষে পংক্তিপ্রান্তে যুগ্ম পূর্ণচ্ছেদের চিহ্নসন্নিবেশ সংস্কৃত কবিতা থেকেই এসেছে। মধুসূদনের প্রবহমাণতার চেয়েও সংস্কৃত কাব্যের হ্রদপরিসর বাচংযমই তাঁর অভিপ্রেত ব'লে মনে হয়। সখাদ সোনা নয়, নিকষোপম পংক্তি। আলুথালু বাক্যময়তা নয়, বাঙ্ময় বিদগ্ধ মুখমণ্ডল। সংস্কৃত কবিতার কাছ থেকে তিনি এই অণিমাসিদ্ধি লাভ করেছিলেন।

একটি আশ্চর্য উপমায়, পিণ্ডার, কবিতার প্রস্তাবনা বা সূচনাকে মন্দিরের ললাটভাগ বলেছেন। সুধীন্দ্রনাথের কবিতা এবং গদ্যের আরম্ভ অনেকটা সেইরকম। বিশাল তার দৃশ্যলয়, সহনীয় তার দিগন্তময়তা। যে-পাঠকের

অনুশীলন নেই, তারও মাথা নত হ'য়ে আসে। আর তারপর মনে হ'তে থাকে, এখানে বিস্মিত, পরিশ্রান্ত হবার মতো অকূল আয়োজন যতোখানি, সে-অনুপাতে এতটুকু বিশ্রামের, এক মুহূর্ত অব্যাহতির সুযোগ নেই কেন?

বিষয়ের কাছে বিষয়ীর চূড়ান্ত আত্মোৎসর্জনের কথা সুধীন্দ্রনাথ তাঁর একাধিক সন্দর্ভে বলেছেন। আধুনিক কবিতার কাছে রবীন্দ্রনাথের প্রত্যাশাও ছিলো একটি সুসমঞ্জস নৈর্ব্যক্তিকতা। প্রচলিত আধুনিক কাব্যের একটি বৃহদংশের প্রতি সুধীন্দ্রনাথ বীতরাগ ছিলেন। এডিথ সিট্‌ওয়েল্ তাঁকে মুগ্ধ করতে পারেননি; রবার্ট ফ্রস্টকে তিনি অর্ঘ্য দিয়েছেন। ব্যক্তির স্বৈরতার চেয়ে 'স্বভাব ও মানুষের সামঞ্জস্যসাধন' তাঁর কাছে অনেক স্থায়ী ও গৌরবজনক ব'লে মনে হয়েছে।

কবিতা এবং গদ্য, অনুবাদকর্ম এবং সমালোচনায় যে-অদ্বয় মননের পরিচয় তিনি রেখে গেছেন, সেটি বর্তমান সময়ে দুরূহলভ্য। পরিকল্পনা ও প্রয়োগের ক্ষেত্রেও তাঁর নিরন্তর, মীমাংসিত সেই মন পরিস্ফুট হ'য়ে উঠেছে। তাঁর প্রাকরণিক নানান সংযোজনের কথা ছেড়ে দিলেও, এই অবিভক্ত মননের দিক থেকেই তিনি বাংলা সাহিত্যের সর্বশেষ ধ্রুপদী পুরুষ।

স্বাতন্ত্র্য এবং সুধীন্দ্রনাথ

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

কবিকে আমরা শ্রদ্ধা দান করি ; ব্যক্তিকে ভালোবাসা। ভালোবাসা প্রায়ই শ্রদ্ধাকে ছাপিয়ে যায়। এ-কালের একজন কবির ক্ষেত্রে তা-ই গিয়েছে। তিনি সুধীন্দ্রনাথ। তাঁর মৃত্যুর পর, বিগত কয়েক মাসের মধ্যে, এমন অনেক রচনা আমাদের চোখে পড়েছে, নানাগুণান্বিত এই মানুষটি যার বিষয়বস্তু। সে-সব রচনার প্রত্যেকটিই যে ব্যক্তিকেন্দ্রিক, এমন কথা বলি না ; কিন্তু, লক্ষ্য করেছি, কবিকে নিয়ে আলোচনা করাই যাঁদের উদ্দেশ্য ছিল, তাঁরাও শেষ পর্যন্ত মানুষটির কথা ভুলে থাকতে পারেননি। কবির কথা বলতে-বলতে, প্রায় অনিবার্যভাবেই, তাঁরা ব্যক্তি-মানুষের কথায় এসেছেন ; এবং ব্যক্তির কথায় আসবার পর আর কবির কথায় ফিরে যাননি। ফলত, যা কিনা খুবই স্বাভাবিক, এই সমস্ত রচনা পাঠের পর, পাঠকের চোখে, কবির চাইতে ব্যক্তি-সুধীন্দ্রনাথের চেহারাই আরও স্পষ্ট, আরও সত্য হ'য়ে উঠেছে। অনেকে মনে করতে পারেন, এমনটি হওয়া সংগত ছিল না। সংগত ছিল—তাঁর উপরে নয়—তাঁর কবিতার উপরে লক্ষ্য রাখা। আমি তা মনে করিনে। তার কারণ, আমি জানি যে সার্থক কবিকৃতি যদিও সর্বকালেই অতি দুর্লভ ঘটনা, সার্থক ব্যক্তিত্বও বিশেষ সুলভ নয়। বিশেষত এই সর্বনাশা সময়ে, সবার রঙে রং মেশাবার প্রবণতাই যখন, বিকৃত অর্থে, প্রবল হ'য়ে উঠেছে ; স্বাধীন চিন্তাশক্তি-সম্পন্ন মানুষমাত্রেই যখন অসহায় বোধ করছেন ; এবং—জনতা-জনার্দনের পায়ের তলায়—ব্যক্তিত্ব নামক বস্তুটাই যখন গুঁড়িয়ে যেতে বসেছে।

এই যখন অবস্থা, তখন সুধীন্দ্রনাথের মতো এত নিঃসঙ্গ, এবং নিঃসঙ্গ ব'লেই এমন মহিমান্বিত, একটি ব্যক্তিত্বের সান্নিধ্যে এসে, যে-কোনও মানুষের পক্ষেই, ঈষৎ বিস্মিত হওয়া স্বাভাবিক। বিস্মিত এবং আবিষ্ট। স্বীকার করব, আমি আবিষ্ট হয়েছিলাম। স্বীকার করব, এখনও প্রায় প্রতিটি সন্ধ্যায় যখন অসামান্য সেই মানুষটির কথা আমার মনে পড়ে, তখন, প্রধানত, তাঁর মনুষ্যত্বের কথাই আমার মনে পড়ে। সহৃদয়, সচ্ছল সেই মনুষ্যত্বের কথা, বড়ো বেশি স্বাভাবিক ব'লেই যা এই যুগের পক্ষে বড়ো অস্বাভাবিক ছিল। না, তাঁর

কবিতার কথা তত প্রবলভাবে আমার মনে পড়ে না। অন্তত তাঁর জীবদ্দশায় যতখানি মনে পড়ত, তার চাইতে বেশি নয়। এবং এ-কথা যে তাঁর অসংখ্য অনুরাগীর মধ্যে একমাত্র আমার ক্ষেত্রেই সত্য, এমনও আমি মনে করিনে। সুতরাং, আমি কেন বিস্মিত হব, সুধীন্দ্রনাথ-সম্পর্কিত বিভিন্ন রচনায় যদি আজ তাঁর কবিকৃতির চাইতে তাঁর ব্যক্তিত্বের উপরে, অথবা তাঁর মেধার চাইতে তাঁর মনুষ্যত্বের উপরে, বেশি আলো পড়ে ?

সুধীন্দ্রনাথের সঙ্গে আমার পরিচয় খুব বেশি দিনের ছিল না। বড়ো জোর বছর পাঁচেকের। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে, ছাত্রদের এক আবৃত্তি-সভায়, তাঁকে আমি প্রথম দেখি। তাঁর বয়স তখন পঞ্চান্ন। আমার একত্রিশ। মাঝখানে প্রায় পঁচিশ বছরের ব্যবধান। এই ব্যবধানকে আমি সম্ভ্রমের চোখে দেখেছিলাম ; তিনি, স্নেহের চোখে। অনুষ্ঠান শেষ হবার পর, অনায়াসেই তাই, বয়সের বাধা পেরিয়ে, তিনি আমার কাছে এলেন (যেমন আরও অনেকের কাছেই তিনি সেদিন গিয়েছিলেন) ; বসলেন (যেমন আরও অনেকের কাছেই তিনি সেদিন বসেছিলেন) ; এবং, সেদিনকার আবহাওয়া নয়, তখনকার কবিতা সম্পর্কে, আমার অপ্রতিভ অনিচ্ছা সত্ত্বেও, আমাকে দিয়ে দু-চার কথা বলিয়ে নিলেন। যাবার আগে ব'লে গেলেন, "আমার ওখানে আসবেন—যখনই ইচ্ছে হয়।"

ইচ্ছে প্রতিনিয়তই হ'ত। কিন্তু, স্বীকার করা ভালো, সুধীন্দ্রনাথের সঙ্গে সেই প্রথম পরিচয়ের পর, বিগত পাঁচ বছরে, মাত্রই বার দশেক তাঁর রাসেল স্ট্রীটের বাসায় আমি গিয়েছি। ভুল হ'ল। মাত্রই বার দশেক নয়, অন্তত বার দশেক। 'অন্তত' শব্দটা এখানে এই কারণে ব্যবহার করছি যে, সংখ্যা হিসেবে দশও এ-ক্ষেত্রে সামান্য নয় ; এই কারণে যে, সুধীন্দ্রনাথ যে কেমন মানুষ, তা বোঝার জন্যে, দশ বার কেন, পাঁচ বার যাবারও কোনও দরকার ছিল না। এমন কিছু-কিছু মানুষ থাকেন, প্রথম দর্শনেই যাঁদের চিনে নেওয়া যায়। সুধীন্দ্রনাথকে যেত।

কথাটা একটু দাম্ভিক শোনাচ্ছে, আমি জানি। জানি যে, মানুষমাত্রেরই চরিত্র এ-কালে শতখণ্ডিত। প্রথম দর্শনে সুতরাং মানুষ চেনা যায় না। চেনার জন্যে প্রতীক্ষায় থাকতে হয়। একটু-একটু ক'রে তাঁর কাছে গিয়ে,

একটি-একটি ক'রে তাঁর অসংখ্য আকাঙ্ক্ষার পরিচয় নিতে হয়। এবং, অনেক মাস, অনেক বছর কেটে যাবার পরে, সবে যখন সেই মানুষটিকে আমার চেনা-চেনা লাগছে, ঠিক তখনই হয়তো আবিষ্কার করতে হয় যে, তখনও তাঁকে, সমগ্র তাঁকে, চেনা যায়নি। এ-সবই আমি জানি। জেনেও তবে কেন সুধীন্দ্রনাথ সম্পর্কে এত অনায়াসে আমি বলতে পারলাম যে প্রথম দর্শনেই তাঁকে চেনা যেত? স্বয়ং সুধীন্দ্রনাথই তার কারণ। বলতে পেরেছি, কেননা তাঁকে দেখামাত্রই মনে হ'ত যে, তাঁকে চেনার জন্যে কাউকে প্রতীক্ষায় থাকতে হবে না। মনে হ'ত যে তাঁর ইচ্ছাগুলিকে কারও আলাদা-আলাদা ক'রে, খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে, দেখবার কোনও দরকার নেই। মনে হ'ত, তাঁর সমগ্র সত্তাই যেন তাঁর দৃষ্টিতে এসে ধরা দিয়েছে। কিংবা বলতে পারি, নিঃশব্দ নির্মল সেই হাসির মধ্যে, তাঁর দৃষ্টিতে—প্রায় অশ্রুর মতোই—যা টলটল করত।

কেমন মানুষ ছিলেন সুধীন্দ্রনাথ? তাঁকে যাঁরা দেখেননি, কিংবা দূর থেকে দেখেছেন, তাঁদের কেউ যদি আজ এই প্রশ্ন তোলেন, তবে—তাঁর চরিত্রের মৌল লক্ষণ সম্পর্কে যেহেতু আজ আর বিন্দুমাত্র সংশয় আমার নেই—একটিমাত্র কথায় আমি তার জবাব দেব। বলব, তিনি শ্রদ্ধাশীল মানুষ ছিলেন। এ ছাড়া আরও অনেক কথা, তাঁর বিদ্যা বুদ্ধি পাণ্ডিত্য মেধা ইত্যাদি সম্পর্কে আরও অসংখ্য কথাই হয়তো বলা যায়। কিন্তু সে-সব আমি বলব না, তার কারণ, এই গুণাবলির মধ্যে যদিও প্রত্যেকটিই আমাদের সবিস্ময় সম্ভ্রমের যোগ্য, এর একটিকেও আমি তাঁর চরিত্রের আদি অভিজ্ঞান ব'লে গণ্য করিনে। তাঁর চরিত্রের, তাঁর ব্যক্তিত্বের আদি অভিজ্ঞান ছিল শ্রদ্ধা; এবং সেই শ্রদ্ধা কোনও ব্যক্তিবিশেষে নিবদ্ধ ছিল না।

না, নির্বাচিত কয়েকটি মানুষকে নয়, সকলকেই তিনি শ্রদ্ধা করতেন। স্বজন, বন্ধু, সঙ্গী, সতীর্থ, সহকর্মী—সকলকেই। এমনকি, বিশ্ববিদ্যালয়ের সেই সব তরুণ ছাত্র, যাঁরা তাঁর কাছে পাঠ নিতে যেতেন, অথবা অল্পবয়সী সেই সব কবি, রাসেল স্ট্রীটে সন্ধ্যাযাপন যাঁদের অন্যতম আনন্দ ছিল, তাঁদেরও প্রায় প্রত্যেকেই—প্রায় প্রত্যহ—তাঁর শ্রদ্ধায় অভিষিক্ত হয়েছেন।

কেন?—এই প্রশ্নটা এখানে না-উঠেই পারে না। সত্যিই তো সবাই কিছু শ্রদ্ধালাভের যোগ্য নয়। তবু কেন, যে-কোনও বয়সের, যে-কোনও বৃত্তির, যে-কোনও বিদ্যার মানুষকে উপলক্ষ্য ক'রে, তাঁর শ্রদ্ধা এত অনায়াসে ক্ষরিত হ'ত? ক্ষরিত হ'ত তাঁর প্রতিটি কথায়, প্রতিটি কর্মে? নিজে তিনি রাজার চালে চলতেন? অবশ্য। কিন্তু, আশ্চর্য, এমন কথা কখনও কারও মনে হয়নি যে আর-কাউকে তিনি প্রজার ভূমিকায় দেখতে চান। অন্যেরা যখন কথা কইত, তিনি শান্ত হ'য়ে শুনতেন। নিজে যখন কথা কইতেন, তাঁর গভীর কণ্ঠস্বরে এক আশ্চর্য নম্রতার স্পর্শ ঘটত। তেবে এখন বিস্ময় লাগছে যে তাঁকে কখনও উত্তেজিত হ'তে দেখিনি। বিতৃষ্ণ, বিরক্ত কণ্ঠে কথা বলতে শুনিনি। বরং, সাহিত্য কিংবা সমাজ বিষয়ক কোনও আলোচনার অন্ত্য অধ্যায়েও যখন আমাদের অস্থিরতার অবসান হ'ত না, সেই অস্থিরতাকে যখন আমরা তীব্র ভাষায় ব্যক্ত করতুম, ব্যক্ত ক'রে বিদায় নিতে চাইতুম, তখনও—অস্বস্তিকর সেই মুহূর্তটিতেও—তিনি সহাস্য মুখে উঠে দাঁড়াতেন; দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে শান্ত সহিষ্ণু গলায় বলতেন, "কথা কিন্তু শেষ হ'ল না। আর-একদিন এ নিয়ে আলোচনা করা চাই। ইতিমধ্যে আপনার যুক্তিগুলিকে আমি আবার ভেবে দেখব।"

দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দেবার কথায় মনে পড়ল, এই প্রত্যুদ্গমনও আসলে আর-কিছুই নয়, তাঁর রাজকীয় নম্রতারই একটি প্রতীক। মস্ত বড়ো কোনও অতিথি না-এলে কি আমরা প্রত্যুদ্গমন করি? বিদায়দান অথবা অভ্যর্থনার জন্য খানিকটা পথ এগিয়ে যাই? সুধীন্দ্রনাথ যেতেন। যে-কেউ তাঁর কাছে যাক, খবর পেলেই তিনি দরজা পর্যন্ত এগিয়ে যেতেন, এগিয়ে গিয়ে তাঁকে ভিতরে নিয়ে আসতেন, এবং, আগন্তুক যতক্ষণ না আসন গ্রহণ করছেন, নিজে তিনি আসন গ্রহণ করতেন না। অনেকে একে সৌজন্য বলবেন; আমি একে শ্রদ্ধা বলি। লক্ষ্য করেছি, এবং লক্ষ্য ক'রে বিস্মিত হয়েছি যে, তাঁর প্রতিটি কথা, প্রতিটি কর্মের মধ্য দিয়ে এই শ্রদ্ধা ক্ষরিত হ'ত। এবং ক্ষরিত হ'ত নির্বিচারে। সর্বজনশ্রদ্ধেয় দু-একটি মাত্র মানুষের জন্য নয়, সর্বজনের জন্য।

সকলকেই শ্রদ্ধা করতেন সুধীন্দ্রনাথ। কেন করতেন?

হয়তো এইজন্যে যে না-ক'রে তাঁর উপায় ছিল না। উপায় ছিল না, কেননা তিনি ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যে বিশ্বাসী ছিলেন।

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যে যিনি বিশ্বাস করেন, প্রতিটি মানুষের জন্যই তাঁকে শ্রদ্ধা পোষণ করতে হয়। কেননা, তিনি জানেন যে প্রতিটি মানুষই আসলে স্বতন্ত্র—সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র—একটি অস্তিত্বের প্রতীক। স্বতন্ত্র একটি আকাঙ্ক্ষা এবং স্বতন্ত্র একটি সমগ্রতার প্রতীক। কেননা, তিনি জানেন যে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ব'লেই এক্ষেত্রে একের শূন্যতাকে কখনও আর-কাউকে দিয়ে ভরাট করা যায় না। কোনও দিনই না। নব-নব জন্মের মধ্য দিয়ে যদিও নিয়ত আরও অসংখ্য অস্তিত্বের সূচনা হ'য়ে চলেছে, নব-নব পরিচয়ের মধ্য দিয়ে যদিও নিয়ত আরও অসংখ্য অস্তিত্বের আমরা সান্নিধ্য পাচ্ছি, তবুও না। একের সৃষ্ট সেই শূন্যতা তবু থেকেই যায়।

প্রতিটি মানুষকেই যে শ্রদ্ধা করতেন সুধীন্দ্রনাথ, আমার মনে হয়, সে শুধু এই কারণেই। এই প্রবল বিশ্বাসের অনুবর্তী হ'লে যে কারও অভাবই অন্য কারও দ্বারা পূর্ণ হয় না। "কারও অভাবই অন্য কারও দ্বারা পূর্ণ হয় না।"—কথাটা আমি তাঁরই কাছে শুনেছি। তাঁর বিশ্বাস ছিল, মানুষমাত্রেই মহৎ। মহৎ, কেননা অ-বিকল্প। মহৎ, কেননা স্বতন্ত্র। এবং, সন্দেহ নেই যে সর্বজনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থেকে, বস্তুত, সর্বজনের এই স্বাতন্ত্র্যকেই তিনি শ্রদ্ধা জানিয়ে গিয়েছেন।

দুরূহের দারুণ আকর্ষণে

অমিয় দেব

গদ্যেও সুধীন্দ্রনাথ দুরূহের সাধক : কোবিদ, অথচ 'পণ্ডিত' নন ; কবি, কিন্তু বিচারবিমুখতার ঊর্ধ্বে। একদিকে বিস্তার, অন্যদিকে অন্তর্দৃষ্টি ; আর এ-দুয়ের তিনি সমন্বয় ঘটিয়েছিলেন, কোবিদ ও কবিকে মিলিয়েছিলেন, তাই তাঁর বক্তব্য কখনো ক্ষিতির অভাবে আকাশকুসুম সাজেনি, কিংবা বুদ্ধি অনুভূতির অসহযোগে বন্ধীক গড়েনি। পক্ষান্তরে তাঁর রচনাবলী মহীরুহের মতোই মাটিতে দাঁড়িয়ে সমস্ত আকাশ ধারণ ক'রে আছে মাথার উপর। মহীরুহের মতোই শেকড় ছড়িয়ে দিয়েছে অন্ধকারে, ডালপালা মেলে ধরেছে আলোয় আলোয়। পাঠক যেমন যুক্তির টানে এগিয়ে চলেন, তেমনি বোধির বিভায় উজ্জীবিত হন। প্রসঙ্গের পর প্রসঙ্গের ডাক পড়ে, বিরাট আকাশ থেকে তারা কূলায়প্রত্যাশী পাখির মতো নেমে আসে, পাঠকের দৃষ্টির মোহাবরণ মুছে যায়, বিশ্ব তাঁর আত্মীয় হ'য়ে ওঠে। অথচ, ভাবতে অবাক লাগে, যুক্তির প্রবাহ কোথাও প্রতিহত হয় না। যেন যুক্তি নিত্য, স্বয়ম্ভু বোধিকে আপন ক'রে তোলাই তার ধর্ম। যেন যুক্তি স্বয়ম্ভর, তাকে আশ্রয় ক'রেই বোধির আত্মপ্রকাশ ঘটে।

সুধীন্দ্রনাথের গদ্যে যুক্তির প্রত্যক্ষ ভূমিকা রূপকল্পের। বাক্যপরম্পরা তো বটেই, বাক্যসাধারণও, যুক্তির শাসনাধীন। 'স্বগত' ও 'কূলায় ও কালপুরুষে'র প্রতিটি প্রবন্ধ প'ড়ে মনে হয়, বুঝি শব্দ গেঁথে গেঁথে যুক্তি এক প্রকাণ্ড ইমারত গ'ড়ে তুলেছে। শব্দের সঙ্গে শব্দের, এবং বাক্যের সঙ্গে বাক্যের সম্পর্ক, তাই, কেবল প্রবহমাণতার নয়, পরস্পরের ন্যায্যতা প্রতিপাদনেরও। কার্যকারণ-বিধির মতোই এক সম্বন্ধসূত্র তাদের গ্রথিত করেছে। ফলত যমলাসদৃশ বাক্যাংশদ্বয়ের একটিকে উপেক্ষা করলে অন্যটি আপনা থেকেই অন্তর্হিত হয়। এবং, যুক্তির শাসন অটুট ব'লেই, তাদের দেহে ভূষণ যদিও বা চলতে পারে, ভূষণের বাহুল্য, বা অবান্তরের উদ্দামতা কোনোটাই প্রশ্রয় পায় না। বরঞ্চ সংযমকেই আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন সুধীন্দ্রনাথ। এবং, বলা বাহুল্য, সংযমই তাঁকে ব্যাখ্যাবিমুখ ক'রে তুলেছিল। এত গভীর

ও অনুচ্চারিত তাঁর ইঙ্গিত, এত স্বচ্ছন্দ তাঁর উল্লেখ, যে যুগপৎ শিক্ষিত ও সংবেদনশীল মন না হ'লে সে-ইঙ্গিত বা সে-উল্লেখের তাৎপর্য বুঝে ওঠা শক্ত। আর আশ্চর্য সংযম তাঁর শব্দপ্রয়োগে। প্রায়শই তিনি পাঁচটি দেশী শব্দের পরিবর্তে একটি তৎসম শব্দে কাজ চালাতেন। সেই সঙ্গে ব্যাকরণ-প্রস্তাবিত সংযমাচরণেও তাঁর ছিল অশেষ উৎসাহ। সন্ধি এবং সমাস তাঁর শব্দাবলীতে যে ঘনসংবদ্ধ ব্যূহ রচনা করেছে, তার তুলনা বাংলা গদ্যসাহিত্যে বিরল।

কিন্তু যুক্তি এবং সংযম কেবল যে বহিরঙ্গের বিশ্বকর্মা তা নয়, অন্তর্লীন চিন্তা ও ভাবের ক্ষেত্রেও তাদের ভূমিকা সক্রিয়। সুধীন্দ্রনাথের গদ্যে চিন্তা কখনো পাল তুলে দিয়ে নিরুদ্দেশে পাড়ি জমায় না, কিংবা ভাব আবেগের পাখায় ভর ক'রে ভেসে বেড়ায় না। যাথার্থ্যই আদর্শ তাঁর, অনিবার্যতা অন্বিষ্ট। আর ভাব থেকে ভাবান্তরে গমনও অপ্রতিরোধ্য এবং অমোঘ ব'লেই সার্থক। সার্থকতার প্রমাণ মেলে, যখন আমরা ভিন্ন ধারণায় বিশ্বাসী হ'য়েও তাঁর চিন্তাসূত্রকে মেনে নিতে বাধ্য হই, এবং সংশয়কে স্বেচ্ছানির্বাসনে পাঠিয়ে তাঁর সঙ্গে গলা মেলাই। তবে যথার্থ ও অনিবার্য হ'তে গিয়ে সুধীন্দ্রনাথের চিন্তাধারা গণিতধর্মী হ'য়ে পড়েনি। যুক্তিনির্ভরতাকে তিনি ধর্ম ব'লে জেনেছিলেন, বিচারকে কর্ম ব'লে, কিন্তু ভাবনার রাজ্যে সর্বোচ্চ আসন দিয়েছিলেন বোধিকে ; ফলত তাঁর গদ্যশিল্প ধর্ম-কর্মের গতানুগতিকতায় গা ভাসায়নি, বোধির স্পর্শে প্রতি মুহূর্তেই পুনর্নব হ'য়ে উঠেছে। তাঁর মত-পরিবর্তনও সেই কারণেই স্বাভাবিক ঠেকে। কেননা তাঁর সর্বঋতুর সকল প্রবন্ধেরই প্রধান উৎস বোধি। আর প্রায় প্রত্যেকটি প্রথম বাক্য বোধির আলো পেয়েই উদ্ভাসিত। প'ড়ে মনে হয়, একটি নূতন দরজা খুলে গেল। পড়তে পড়তে আরো অনেক দরজা এবং জানলা খুলে যায়, আলো ছুটে আসে, দৃষ্টির সংকীর্ণতা ঘুচিয়ে আমরা এগোই। যুক্তি আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে চলে, কিন্তু উজ্জীবন জোগায় বোধি। তাতে যাকে একান্তই ক্লান্তিকর মনে হ'তে পারত, তাই হ'য়ে ওঠে চিত্তাকর্ষক। অপর পক্ষে যুক্তিবিহীন বোধির কথা সুধীন্দ্রনাথের গদ্যে অভাবনীয়। আসলে এ-দুয়ের সমন্বয়ই তাঁর গদ্যশিল্পের মূলসূত্র এবং দুরূহসাধনার প্রথম সিদ্ধি।

দ্বিতীয় সিদ্ধি দৃষ্টির উদারতা। যোরোপীয় রেনেসাঁস যে-বিশ্বকৌতূহলের

জনক, সুধীন্দ্রনাথ তারই উত্তরাধিকার অর্জন করেছিলেন। এমন বিষয় খুব কমই ছিল যাতে তিনি কৌতূহল বোধ করেননি। আর তাঁর অনুশীলনের পরিধি যে কত দ্রুতগতিতে বেড়ে যেত তার প্রমাণ ভিক্তর য়্যুগো সম্পর্কে ইংরেজিতে লেখা তাঁর অন্যতম শেষ প্রবন্ধ। বলা বাহুল্য, এই উদারতা তাঁর সাহিত্যচিন্তায় বিস্তার জুগিয়েছে এবং তাঁর দৃষ্টিভঙ্গীকে বিশ্বভৌম ক'রে তুলেছে। যথার্থতম অর্থেই তিনি কোবিদ হ'য়ে উঠেছেন। এই উদারতাই অন্য রূপে প্রকাশ পেয়েছিল তাঁর সমালোচনার আদর্শে। তিনি প্রতীকী কবিদের আত্মীয়, কিন্তু তাই ব'লে ভিক্তর য়্যুগোর মহত্ত্বস্বীকারে তাঁর কোনো দ্বিধা নেই। বিচিত্রের সহ-অবস্থানকে তিনি স্বাভাবিক জেনেই গ্রহণ করেছিলেন। সেই কারণে তাঁর সমালোচনা একই সঙ্গে মন্ময় ও তন্ময় হ'তে পেরেছে। এবং তাঁর কাছে সাহিত্য যেমন দর্শন ও বিজ্ঞানের সগোত্র, তেমনি ভিন্ন আদর্শের সাহিত্যস্রষ্টারাও সবর্ণ।

এই উদারতাকে হয়তো ধ্রুপদী নামে অভিহিত করা যেতে পারে। কিন্তু গদ্যশিল্পে সুধীন্দ্রনাথের ধ্রুবপদ সবচেয়ে বেশি প্রকাশ পেয়েছে তাঁর শব্দ-ব্যবহারে। কেবল যে তাঁর শব্দভাণ্ডার তৎসমপ্রধান তা-ই নয়, অর্থপ্রবাহও তৎসমমুখী। অনেক অপ্রচলিত শব্দের তিনি পুনরুজ্জীবন ঘটিয়েছেন। সেই সঙ্গে বহু প্রচলিত শব্দের বিস্মৃত বাচ্যার্থও পুনরুদ্ধার করেছেন। এবং বাংলা বাগরীতিতে এনেছেন সংস্কৃত ভাষার গাম্ভীর্য ও ঘনসংবদ্ধতা। ভাষায় ঐশ্বর্যবৃদ্ধি হয় নানা ভাবে। কেউ বাণিজ্য করেন প্রবাহের অনুকূল পথে, কেউ বা উজান ঠেলে দূরের পণ্য আনতে যান। এবং যেহেতু বর্তমান থেকেই যাত্রার শুরু এবং বর্তমানেই যাত্রার শেষ, তাই অতীতবাসী হ'য়ে যাবার কোনো ভয় নেই এই দূরযাত্রায়। আসলে এ-বিপদ ঘটে সচেতনতার অভাবে। বলা বাহুল্য সুধীন্দ্রনাথ সচেতন শিল্পী, এবং শব্দব্যবহারে তিনি যে-সিদ্ধি লাভ করেছেন তার সবটাই সচেতন সাধনার ফল।

সচেতন সাধনার ফল তাঁর গদ্যভঙ্গীও। দৈনন্দিন প্রয়োজনে আমরা যে বাগ্‌ধারার আশ্রয় নিই, তার সঙ্গে এই গদ্যভঙ্গীর বাহ্য সম্পর্ক খুব কম। যেন গদ্যের একটি বিশেষ বাহন নির্মাণ করতে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন তিনি। ফলত তাঁর রচনাবলী হয়তো সর্বত্র অন্তরঙ্গ সুরে বাজেনি, কিন্তু যুক্তি ও চিন্তার

তালে-তালে নেচে উঠেছে। সুধীন্দ্রনাথের গদ্যে স্বচ্ছন্দ প্রবাহ ভাষার ততটা নয়, যতটা ভাবনার। বুঝি লিখতে লিখতে তিনি ভাবেননি, ভাবতে ভাবতেই লিখেছেন। সুতরাং প্রাথমিক যে-দুরূহতা আমাদের বাধা দেয়, তা একান্তই ক্ষণস্থায়ী; ভাবনার গভীর প্রবাহে তার অস্তিত্ব সুদ্ধ বিলীন হ'য়ে যায়। অভিধান দেখে-দেখে ক্লান্ত হবার অনেক আগেই ডাক আসে মননের আনন্দলোক থেকে। পাঠক জেগে ওঠেন। ব্যস্ত হ'য়ে ওঠে তাঁর বুদ্ধি, প্রসার ঘটে দৃষ্টির। সুবিন্যস্ত বাক্যাবলীর ফাঁকে ফাঁকে উঁকি মারে অনাস্বাদিত দেশান্তর, মূর্তি পরিগ্রহ করে পর্বতের ধ্যান আর সমুদ্রের বিস্তার। পাঠক বেরিয়ে পড়েন দুরূহের দারুণ আকর্ষণে।

পাঠকের মনে দুরূহ সাধনার সঞ্চার সুধীন্দ্রনাথের গদ্যের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য। তাঁর কাছে পাঠকমাত্রেই সুশিক্ষিত এবং সভ্য। বাংলা তাঁর মাতৃভাষা, কিন্তু বিশ্বসাহিত্য, দর্শন এবং বিজ্ঞানের সঙ্গে তিনি সমধিক পরিচিত। রাজনীতির চর্চা না করলেও খবর রাখেন; এবং পাভ্‌লোভের নাম তো শুনেছেনই, তার উপর জীববিজ্ঞানীদের আসরে পাভ্‌লোভের আসন কোথায় তাও জানেন। সর্বোপরি তিনি সহৃদয় ও দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন। সকল বাচ্যার্থ, ব্যঙ্গার্থ ও ব্যঞ্জনা উপলব্ধি করবার ধৈর্য ও প্রয়াস তাঁর আছে। অথচ তিনি পুস্তকসর্বস্ব কৃমিবিলাসী নন। সাহিত্যপাঠ তাঁর জীবনে অন্তঃপুরের অভিজ্ঞতা, সদরের অস্থায়ী অতিথির সম্ভাষণ নয়। আর তাঁর সংবেদনশীলতার অন্য নাম উদারতা। অর্থাৎ কালিদাসের কালের কবি কিংবা কোবিদ, অথবা য়োরোপীয় রেনেসাঁস যে-সর্বাঙ্গসুন্দর মানুষের জন্ম দিয়েছে—সেই মানুষ যে ভূপৃষ্ঠ থেকে এখনো যে একেবারে লুপ্ত হ'য়ে যায়নি—তারই প্রমাণ সুধীন্দ্রনাথ দত্ত।

সুধীন্দ্রনাথ দত্ত : কবি

বুদ্ধদেব বসু

এই বইয়ের* কবিতাগুলি যাঁর রচনা, তিনি বিশ শতকের একজন শ্রেষ্ঠ বাঙালি, তাঁর মতো নানাগুণসমন্বিত পুরুষ রবীন্দ্রনাথের পরে আমি অন্য কাউকে দেখিনি। বহুকাল ধ'রে তাঁকে প্রত্যক্ষ দেখেছিলুম ব'লে, তাঁর মৃত্যুর পর থেকে একটি প্রশ্ন মাঝে-মাঝে আমার মনে জাগছে : যাকে আমরা প্রতিভা বলি, সে-বস্তুটি কী? তা কি বুদ্ধিরই কোনো উচ্চতর স্তর, না কি বুদ্ধির সীমাতিক্রান্ত কোনো বিশেষ ক্ষমতা, যার প্রয়োগের ক্ষেত্র এক ও অনন্য? ইংরেজি 'genius' শব্দে অলৌকিকের যে-আভাস আছে, সেটা স্বীকার্য হ'লে প্রতিভাকে এক ধরনের আবেশ বলতে হয়, আর সংস্কৃত 'প্রতিভা' শব্দের আক্ষরিক অর্থ অনুসারে তা হ'য়ে ওঠে বুদ্ধির দীপ্তি, মেধার নামান্তর। যদি প্রতিভাকে অলৌকিক ব'লে মানি, তাহ'লে বলতে হয় যে সহজাত বিশেষ একটি শক্তির প্রভাবেই উত্তম কবিতা রচনা সম্ভব, রচয়িতা অন্যান্য বিষয়ে হীনবুদ্ধি হ'তে পারেন এবং হ'লে কিছু এসে যায় না, উপরন্তু ঐ বিশেষ ক্ষমতাটি শুধু দৈবক্রমে সহজাতভাবেই প্রাপণীয়। পক্ষান্তরে, প্রতিভাকে উন্নত বুদ্ধি ব'লে ভাবলে কবি হ'য়ে ওঠেন এমন এক ব্যক্তি যাঁর ধীশক্তি কোনো-কোনো ব্যক্তিগত বা ঐতিহাসিক কারণে কাব্যরচনায় নিয়োজিত হয়েছিলো, কিন্তু সেই কারণসমূহ ভিন্ন হ'লে যিনি বণিক বা বিজ্ঞানী বা কূটনীতিজ্ঞরূপে বিখ্যাত হ'তে পারতেন। এই দুই বিকল্পের মধ্যে কোনটা গ্রহণীয়?

বলা বাহুল্য, এই প্রশ্ন আমরা শুধু উত্থাপন করতে পারি, এর উত্তর দেয়া সকলেরই সাধ্যাতীত। কেননা ইতিহাস থেকে দুই পক্ষেই বহু সাক্ষী দাঁড় করানো যায়, তাঁরা অনেকে আবার স্ববিরোধে দোলায়মান। বহুমুখী গ্যেটে ও রবীন্দ্রনাথের 'বিরুদ্ধে' আছেন একান্ত হ্যেল্ডার্লিন ও জীবনানন্দ, মনীষী শেলি ও কোলরিজের পাশে উন্মাদ ব্লেক ও অশিক্ষিত কীটস,

* নাভানা-কর্তৃক প্রকাশিতব্য 'সুধীন্দ্রনাথ দত্তের কাব্যসংগ্রহে'র ভূমিকা।

উৎসাহী বোদলেয়ারের পরে শীতল ও নিরঞ্জন মালার্মে। জগতের কবিদের মধ্যে এত বিভিন্ন ও বিরোধী ধরনের চরিত্র দেখা যায়, এত বিচিত্র প্রকার কৌতূহলে বা অনীহায় তাঁরা আক্রান্ত, এত বিভিন্নভাবে তাঁরা কর্মিষ্ঠ ও নিষ্ক্রিয়, এবং উৎসুক ও উদাসীন ছিলেন, যে ঠিক কোন লক্ষণটির প্রভাবে তাঁরা সকলেই অমোঘভাবে কবি হয়েছিলেন, তা আবিষ্কার করার আশা শেষ পর্যন্ত ছেড়ে দিতে হয়। এবং কবিত্বের সেই সামান্য লক্ষণ—যদি বা কিছু থাকে—তা আমার বর্তমান নিবন্ধের বিষয়ও নয়; এখানে আমি বলতে চাচ্ছি যে সুধীন্দ্রনাথ দত্ত এমন একজন কবি, যাঁর প্রতিভার প্রাচুর্যের কথা ভাবলে প্রায় অবাকই লাগে যে কবিতা লেখার মতো একটি নিরীহ, আসীন, ও সামাজিক অর্থে নিষ্ফল কর্মে তিনি গভীরতম নিষ্ঠায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন।

কেননা সুধীন্দ্রনাথ ছিলেন বহুভাষাবিদ্ পণ্ডিত ও মনস্বী, তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণী বুদ্ধির অধিকারী, তথ্যে ও তত্ত্বে আসক্ত, দর্শনে ও সংলগ্ন শাস্ত্রসমূহে বিদ্বান; তাঁর পঠনের পরিধি ছিলো বিরাট, ও বোধের ক্ষিপ্রতা ছিলো অসামান্য। সেই সঙ্গে যাকে বলে কাণ্ডজ্ঞান, সাংসারিক ও সামাজিক সুবুদ্ধি, তাও পূর্ণমাত্রায় ছিলো তাঁর, কোনো কর্তব্যে অবহেলা করতেন না, গার্হস্থ্য ধর্মপালনে অনিন্দনীয় ছিলেন, ছিলেন আলাপদক্ষ, রসিক, প্রখর ব্যক্তিত্বশালী, আচরণের পুঙ্খানুপুঙ্খে সচেতন, এবং সর্ববিষয়ে উৎসুক ও মনোযোগী। এই বর্ণনা থেকে বোঝা যাবে যে, একটু চেষ্টা করলেই, বাংলা সাহিত্যের চাইতে আপাতবৃহত্তর কোনো ব্যাপারে নায়ক হ'তে পারতেন তিনি; আমার এক তরুণ বন্ধুর সঙ্গে এ-বিষয়ে আমি সম্পূর্ণ একমত যে সুধীন্দ্রনাথ রাজনৈতিক হ'লে অনিবার্যত নেতৃপদ পেতেন, বা আইনজীবী হ'লে সেই পেশার উচ্চতম শিখরে পৌঁছতে তাঁর দেরি হ'তো না; তাঁকে অনায়াসে কল্পনা করা যেতো রাজমন্ত্রী বা রাষ্ট্রদূতরূপে, তত্ত্বচিন্তায় নিবিষ্ট হ'লে নতুন কোনো দর্শনের প্রতিষ্ঠা করতে পারতেন না তাও নয়। অথচ এর কোনোটাই তিনি করলেন না, কবিতা লিখলেন। পিতার কাছে আইনশিক্ষা আরম্ভ ক'রে শেষ করলেন না; এম. এ. পড়া অসমাপ্ত রেখে ছেড়ে দিলেন; সুভাষচন্দ্র বসুর 'ফরওঅর্ড' পত্রিকার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হ'য়েও রাজনৈতিক কর্মের দিকে প্রবর্তনা পেলেন না; বীমাপ্রতিষ্ঠানে কর্মজীবন আরম্ভ ক'রেও লক্ষ্মীর

বাসস্থানটিকে পরিহার করলেন। এ কি এক তরুণ ধনীপুত্রের খেয়ালমাত্র, না কি এর পিছনে কোনো প্রচ্ছন্ন উদ্যম কাজ ক'রে যাচ্ছে? কেউ-কেউ বলেছেন যে তিনি যেমন তাঁর পিতার 'বৈদান্তিক আতিশয্যে' উত্ত্যক্ত হ'য়ে 'অনেকান্ত জড়বাদে'র আশ্রয় নিয়েছিলেন, তেমনি তাঁর দেশহিতৈষী কর্মবীর পিতাকে ঘিয়জ্ফিতে আত্মবিলোপ করতে দেখে সমাজসেবায় তাঁর আস্থা ভেঙে যায়। এই যুক্তিকে আর-একটু প্রসারিত ক'রে হয়তো বলা যায় যে দেশ, কাল ও পরিবারের আপতিক সন্নিপাতের ফলে জনকর্মে উৎসাহ হারিয়ে, তিনি বেছে নিলেন সেই একটি কাজ, যা শব্দময় হ'য়েও নীরব, এবং সর্বজনের প্রতি উদ্দিষ্ট হ'লেও নিতান্ত ব্যক্তিগত। কিন্তু সত্যি কি তা-ই? না কি তাঁর নাড়িতেই কবিতা ছিলো, দেহের তন্তুতে ছিলো বাক্ ও ছন্দের প্রতি আকর্ষণ, তাই অন্য কোনো পথে যাবার তাঁর উপায় ছিলো না, অন্যান্য এবং অধিকতর প্রভাবশালী বৃত্তির দিকে বিপুল সম্ভাবনা নিয়েও তাই তাঁকে কবি হ'তে হ'লো? তিনি কি অন্যবিধ কীর্তির আহ্বান উপেক্ষা ক'রে কবিতা লিখতে বসেছিলেন, না কি মন্ত্রমুগ্ধ কান নিয়ে অন্য কোনো আহ্বান তিনি শুনতেই পাননি? মূল্যবান জেনেও কোনো-কিছু ত্যাগ করেছিলেন, না কি বর্জন করেছিলেন শুধু সেই সব, যা তাঁর কাছে অকিঞ্চিৎকর, বরণ করেছিলেন শুধু তা-ই, যেখানে তাঁর সার্থকতা নিহিত?

এ-কথার উত্তরে আমি বলতে বাধ্য যে জগতের অন্যান্য উত্তম কবিদের মতো, সুধীন্দ্রনাথও ছিলেন—স্বভাবকবি নন, স্বাভাবিক কবি। তা যদি না হ'তো, তাহ'লে তাঁর মতো মেধাবী ব্যক্তি কবিতা নামক বায়বীয় ব্যাপার নিয়ে প্রৌঢ় বয়স পর্যন্ত প্রাণপাত পরিশ্রম করতেন না। তাঁর সামনে, রবীন্দ্রনাথের মতো, সুযোগ ছিলো অপর্যাপ্ত, ব্যক্তিত্বে ছিলো অন্য নানা গুণপনা; সে-সবের সদ্ব্যবহারও তিনি করেছিলেন। কিন্তু আমি যাঁদের স্বাভাবিক কবি বলছি—আর তাঁরা ছাড়া সকলেই অকবি—তাঁরা লোকমানসে নিতান্ত কবিরূপেই প্রতিভাত হ'য়ে থাকেন, তাঁদের ক্ষমতার অন্যান্য বিকিরণ শেষ পর্যন্ত সেই একই অগ্নিতে লীন হ'য়ে যায়। গ্যেটেকে জগতের লোক কবি ছাড়া অন্য কিছু ব'লে ভাবে কি? জমিদার, ধর্মগুরু, শিক্ষাব্রতী, দেশপ্রেমিক, গ্রামসেবক, বিশ্বপ্রেমিক—রবীন্দ্রনাথ তো কত কিছুই ছিলেন, কিন্তু তাঁর

একটিমাত্র মৌলিক পরিচয়ের মধ্যে অন্য সব গৃহীত হ'য়ে গেলো। তেমনি, সুধীন্দ্রনাথের অন্য যে-সব চরিত্রলক্ষণ উল্লেখ করেছি, বা করিনি—তাঁর অধীত জ্ঞান, মনীষিতা, আলাপনৈপুণ্য, অসামান্য প্রফুল্লতা ও সামাজিক বৈদগ্ধ্য, সম্পাদক ও গোষ্ঠীনায়ক হিশেবে স্মরণীয় কৃতিত্ব তাঁর—এই সবই তাঁর কবিত্বের অনুষঙ্গ, তাঁর কবিতার পক্ষে অনুকূল বা বিরোধী ধাতু হিশেবে প্রয়োজনীয়; যদি তিনি কবি না-হতেন, তাহ'লে তাঁর জীবন ও ব্যক্তিত্ব এ-রকম হ'তো না, এবং যদি ভিন্ন ধরনের কবি হতেন তাহ'লে তাঁর জীবন ও ব্যক্তিত্ব ভিন্ন ধরনের হ'তো।

শ্রীমতী রাজেশ্বরী দত্তর সৌজন্যক্রমে সুধীন্দ্রনাথের অনেকগুলি পাণ্ডুলিপি-পুস্তক দেখার সুযোগ আমার হয়েছে। ছাপার অক্ষরে তাঁর যে-সব কবিতার সঙ্গে আমরা পরিচিত, সেগুলির আদি ও পরবর্তী লেখন সবই রক্ষিত আছে, তাছাড়া আছে ছুটি প্রাথমিক খাতা, যাতে তাঁর কাব্যরচনার সূত্রপাত হয়েছিলো। সর্বপ্রথম খাতাটির তারিখ বঙ্গাব্দ ১৩২৯, অর্থাৎ খৃষ্টাব্দ ১৯২২, সুধীন্দ্রনাথের বয়স তখন একুশ। নামপত্রে লেখা: 'শ্রীশ্রীদুর্গামাতা সহায়। শ্রীসুধীন্দ্র নাথ দত্ত। ১৩৯ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।' ভিতরের পাতাগুলোতে আছে কপ্ত হাতে মেলানো পদ্য, ছয় বা আট পংক্তি থেকে দু-তিন পৃষ্ঠা পর্যন্ত ব্যাপ্তি তাদের, তাতে বানান অস্থির ও ছন্দ ভঙ্গুর; বাংলা ভাষা ও বাংলা ছন্দ—এই দুই অনমনীয় উপাদানের সঙ্গে সংগ্রামের চিহ্ন সর্বত্র ছড়িয়ে আছে। হস্তলিপিও কাঁচা, এবং একেবারে ভিন্ন ধরনের, অক্ষরগুলি কোণবহুল ও বিশ্লিষ্ট, তাতে রবীন্দ্রনাথের প্রভাব একেবারে নেই, এবং আমাদের পক্ষে তা সুধীন্দ্রনাথের ব'লে ধারণা করা সহজ নয়। এটা কেমন ক'রে সম্ভব হ'লো যে সুধীন্দ্রনাথ, একুশ বছর বয়সে, যখন রবীন্দ্রনাথের 'বলাকা' পর্যন্ত ও সত্যেন্দ্রনাথ দত্তর প্রায় সমগ্র কাব্য বেরিয়ে গেছে, তখন ঐ রকম কাঁচা লেখা লিখেছিলেন?

এর উত্তরে আমি এই তথ্যটি উপস্থিত করবো যে সুধীন্দ্রনাথের প্রথম যৌবনে বাংলা ভাষা তাঁর অন্তরঙ্গ ছিলো না। তাঁর বাল্যশিক্ষা ঘটেছিলো কাশীতে; আমি বেসান্ত কর্তৃক স্থাপিত সেই বিদ্যালয়ে তিনি সংস্কৃত ও ইংরেজি ভালোভাবে শিখেছিলেন, কিন্তু বাংলা চর্চার তেমন সুযোগ পাননি।

শুনেছি, কৈশোরে কলকাতায় ফিরে মাঝে-মাঝে মাতার সঙ্গে হিন্দিতে কথা বলতেন। মাতৃভাষাকে স্বাধিকারে আনতে তাঁর যে কিছু বেশি সময় লেগেছিলো তাতে অবাক হবার কিছু নেই; যা লক্ষণীয়—এবং বর্তমান ও ভাবীকালের তরুণ লেখকদের পক্ষে শিক্ষণীয়—তা এই যে মাতৃভাষাকে স্ববশে আনবার জন্য, ও নিজের কবিত্বশক্তিকে উদ্বুদ্ধ করার জন্য, দিনে-দিনে অনলসভাবে অনবরত তিনি 'উদ্যমের ব্যথা' সহ্য করেছিলেন। তাঁর খাতা-গুলিতে দেখা যায়, বাংলা ভাষার কবিতার পংক্তিকে ইংরেজি ধরনে বিশ্লেষ ক'রে তিনি বাংলা ছন্দের প্রকৃতি বুঝে নিচ্ছেন, কোথাও দেখা দিচ্ছে পঠিতব্য পুস্তকের তালিকা, কোথাও পর-পর কতগুলো মিল লিখে রাখছেন। এরই পরিণতিস্বরূপ পরবর্তীকালে আমরা দেখতে পাই, 'পথ' নামক কবিতার আদি লেখনের প্রতিটি পংক্তি উচ্ছেদ ক'রে তারই ফাঁকে-ফাঁকে এক-একটি নতুন পংক্তি রচনা করছেন; দেখতে পাই 'সংবর্তে'র ঈশিত, 'যযাতি'র অতুলনীয় কলাকৌশল।

আমার বিশ্বাস, সুধীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ প'ড়ে আমি যা বুঝিনি, তাঁর পাণ্ডুলিপি-পুস্তকের সঙ্গে চাক্ষুষ পরিচয়ের ফলে তাঁর সেই গোপন কথাটি আমি ধরতে পেরেছি। বুঝতে পেরেছি, কেন জীবনের শেষ পর্যায়ে তাঁর একাত্মবোধ ঘটেছিলো—ধরা যাক তাঁরই মতো আত্মজৈবনিক কবি পোল ভেরলেনের সঙ্গে নয়, স্বভাবে যিনি তাঁর একেবারে বিপরীত, সেই মালার্মের সঙ্গে। সুধীন্দ্রনাথ কবিতা লিখতে আরম্ভ করেছিলেন তাঁর স্বভাবেরই প্রণোদনায়, কিন্তু তাঁর সামনে একটি প্রাথমিক বিঘ্ন ছিলো ব'লে, এবং অন্য অনেক কবির তুলনায় যৌবনেই তাঁর আত্মচেতনা অধিক জাগ্রত ছিলো ব'লে, তিনি প্রথম থেকেই বুঝেছিলেন—যা আমার উপলব্ধি করতে অন্তত কুড়ি বছরের সাহিত্যচর্চার প্রয়োজন হয়েছিলো—যে কবিতা লেখা ব্যাপারটা আসলে জড়ের সঙ্গে চৈতন্যের সংগ্রাম, ভাবনার সঙ্গে ভাষার, ও ভাষার সঙ্গে ছন্দ, মিল, ধ্বনিমাধুর্যের এক বিরামহীন মল্লযুদ্ধ। তাঁর প্রবৃত্তি তাঁকে চালিত করলে কবিতার পথে—সে-পর্যন্ত নিজের উপর তাঁর হাত ছিলো না, কিন্তু তারপরেই বুদ্ধি বললে, 'পরিশ্রমী হও।' এবং বুদ্ধির আদেশ শিরোধার্য ক'রে অতি ধীরে সাহিত্যের পথে তিনি অগ্রসর হলেন, অতি

সুচিন্তিতভাবে, গভীরতম শ্রদ্ধা ও বিনয়ের সঙ্গে। তাঁর প্রথম খাতায় অঙ্কিত সেই মর্মস্পর্শী 'শ্রীশ্রীদুর্গামাতা সহায়'—তাঁর রক্ষণশীল হিন্দু বাঙালি পরিবারের সেই স্বাক্ষরটুকু—এতেও বোঝা যায় কী-রকম নিষ্ঠা নিয়ে, আত্মসমর্পণের নম্রতা নিয়ে, তিনি কাব্যরচনা আরম্ভ করেছিলেন। এই পর্যায়ের রচনার মধ্যে অনেক ছোটোগল্প বা উপন্যাসেরও খশড়া পাওয়া যায়, তার কোনো-কোনোটি সমাপ্ত ও ঔৎসুক্যজনক। সাত বছরের অনুশীলনের ফলে পৌঁছলেন 'তন্বী' পর্যন্ত, যে-পুস্তক, তার বিবিধ আকর্ষণ সত্ত্বেও, তাঁর পরবর্তী কবিতা-সমূহের তুলনায় আজকের দিনে কৈশোরক রচনা ব'লে প্রতিভাত হয়।

১৯২৯-এ প্রথমবার তিনি দেশান্তরে গেলেন, প্রায় সংবৎসরকাল প্রবাসে কাটলো, রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে জাপানে ও আমেরিকায়, তারপর একাকী য়োরোপে। এই সময়টি তাঁর কবিজীবনের ক্রান্তিকাল; এই সময়েই, তিনি যাকে অভিজ্ঞতা বলতেন, তা তাঁর কবিতার মধ্যে প্রথম প্রবেশ করে। সঙ্গে খাতাপত্র নিয়েছিলেন, জাপানের জাহাজে আরম্ভ করলেন একটা ভ্রমণবৃত্তান্ত, পেনসিলে ও কালিতে বিবিধ গদ্য-পদ্য রচনা, দেখে মনে হয় রোজই কিছু-না-কিছু লিখছেন। আমরা সাগ্রহে লক্ষ করি, কেমন ক'রে, সেই প্রথম খাতার পর থেকে, ক্রমশ তাঁর ভাষা বদলাচ্ছে, ভাব বদলাচ্ছে দেখা দিচ্ছে ভাবুকতা ও সংহতি, সুন্দরভাবে রূপান্তরিত হচ্ছে হস্তাক্ষর। তারপর রোমাঞ্চিত হ'য়ে আবিষ্কার করি আমাদের বহুপরিচিত কতিপয় কবিতা—'অর্কেস্ট্রা'র পর্যায়ভুক্ত—কোনোটির রচনাস্থল আমেরিকা থেকে য়োরোপগামী তরণী, কোনোটির বা রাইনের তীরবর্তী নগর। ইতিমধ্যে কিছু-একটা ঘ'টে গেছে; ভূলোক হয়েছে আরো বাস্তব, দ্যুলোক উজ্জ্বলতর; জেমস জয়স যাকে 'এপিফ্যানি' বলেছিলেন আর রবীন্দ্রনাথ, 'স্বপ্নভঙ্গ', তেমনি কোনো উন্মীলনের প্রসাদ তিনি লাভ করেছেন; প্রকৃতি ও সুধীন্দ্রনাথ দত্তের সহযোগে ও চক্রান্তে বাংলা ভাষায় আবির্ভূত হয়েছেন এক নতুন বাক্‌সিদ্ধ পুরুষ।

তিনি কি বুঝেছিলেন যে তাঁর সাতবৎসরব্যাপী পরিশ্রম এবারে পুরস্কৃত হয়েছে? বোধেননি তা তো হ'তে পারে না, কেননা তাঁর নিরন্তর সাধনা ছিলো আত্মোপলব্ধি। আর সেইজন্যেই, তৃপ্তির তিলতম অবকাশ নিজেকে না-দিয়ে, তিনি আরো ব্যাপকভাবে প্রস্তুতির যজ্ঞে অবতীর্ণ হলেন; প্রকাশ

করলেন 'পরিচয়', পাঠ করলেন যা-কিছু পাঠযোগ্য, বৈঠক জমালেন শুক্রবারে, বন্ধু বেছে নিলেন সাহিত্যিক ও মনীষীদের মধ্যে, লিখলেন পুস্তক-সমালোচনা, প্রবন্ধ, ও ছদ্মনামে ছোটোগল্প, তিনটি য়োরোপীয় ভাষা থেকে কবিতা ও গদ্য অনুবাদ করলেন। আর তাঁর নিজের কবিতা? এই সবই তো তাঁর কবিতারই ইন্ধন, এই সমস্ত-কিছুর প্রভাব ও অভিঘাত, উদ্‌ভূত ও অনুষঙ্গ, তাদের যোগ ও বিয়োগের অঙ্কে সর্বশেষ যে-ফলটুকু দাঁড়ায়, তাঁর কবিতা তো তা-ই। তাঁর 'পরিচয়' পত্রিকা তাঁর কবিতার পাঠক সৃষ্টি করেছে, কবিতার শ্রীবৃদ্ধি করেছে তাঁর উদ্ভাবিত শব্দসমূহ, দার্শনিক প্রবন্ধসমূহ স্থাপন করেছে সমকালীন জগতের সঙ্গে তাঁর কবিতার সম্বন্ধ, সাহিত্যিক প্রবন্ধসমূহ বুঝিয়ে দিয়েছে তাঁর কবিতার আদর্শ কী এবং সিদ্ধি কোনখানে, এবং অনুবাদগুচ্ছ বর্ধিত করেছে স্বাধীন রচনার উপর তাঁর কর্তৃত্ব। সবই কবিতার জন্য। সুধীন্দ্রনাথ দত্ত সম্বন্ধে ন্যূনতম কথা এই বলা যায় যে তাঁর মতো বিরাট প্রস্তুতি নিয়ে আর কেউ বাংলাভাষায় কবিতা লিখতে অগ্রসর হননি; আর অন্য একটি কথা—উচ্চতম কিনা জানি না—যা আমরা বলতে বাধ্য, তা এই যে এক অবোধ্য, নির্বোধ ও দুঃশাসন বিশ্বের বুকে মানুষের মন কেমন ক'রে অস্থিত ক'রে দেয় তার ইচ্ছাশক্তিকে, স্থাপন করে শব্দের প্রভাবে এমন এক শৃঙ্খলা ও সার্থকতা, যা একাধারে ক্ষণকালীন ও শাশ্বত—এই লোমহর্ষক প্রক্রিয়াটিকে সুধীন্দ্রনাথের কবিজীবনে আমরা প্রত্যক্ষ করি। কোনো-কোনো কবি প্রক্রিয়াটিকে গোপনে রেখে যান, কিন্তু সুধীন্দ্রনাথ তাঁর সংগ্রামের চিহ্ন বীরের মতো অঙ্গে ধারণ করেছেন। জয়ী হ'য়েও তিনি এ-কথা ভোলেননি যে শান্তি দেবতারই ভোগ্য, মানুষের জীবনকে অর্থ দেয় শুধু প্রচেষ্টা। আর এইজন্যেই প্রৌঢ়বয়সে তিনি বলেছিলেন যে 'মালার্মের কাব্যাদর্শ তাঁর অন্বিষ্ট'; এইজন্যেই প্রেরণার বিরুদ্ধে তাঁর অভিযান এমন পৌনঃপুনিক। তাঁর কবিতা কোনো দিক থেকেই মালার্মের মতো নয়—তা নয় ব'লে আমি অন্তত খেদ করি না; তাঁর সঙ্গে মালার্মের একমাত্র সাদৃশ্য দৈববর্জনের সংকল্পে, স্বায়ত্তশাসনের উৎকাঙ্ক্ষায়। কিন্তু মানুষের পক্ষে দৈববর্জন কি সম্ভব? অন্ততপক্ষে সুধীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গে আমি নিশ্চয়ই বলবো যে তাঁর প্রতিজ্ঞাবদ্ধ অধ্যবসায়ের শক্তিও দৈবের দান, সেই প্রথম কাঁচা

হাতের খাতা থেকে 'সংবর্ত' ও 'দশমী'তে তাঁর উত্তরণ পর্যন্ত যে-গতিবেগ কাজ ক'রে গেছে, তারই অন্য নাম 'প্রেরণা'। আত্মোপলব্ধির এক স্বচ্ছ মুহূর্তেই তিনি নিজের বিষয়ে লিখেছিলেন : 'আমি অন্ধকারে বদ্ধমূল, আলোর দিকে উঠছি।' বলা বাহুল্য, এই উক্তির প্রথমার্ধ সব কবির বিষয়েই প্রয়োজ্য, কিন্তু দ্বিতীয়ার্ধ সত্য শুধু তাঁদের বিষয়ে, যাঁদের মনের প্রয়াসপ্রসূত উদ্বর্তন তাঁদের আয়ুর সঙ্গেই পা মিলিয়ে চলতে থাকে। আমাদের এই দেশে ও কালে, অনেক কবির মধ্যপথে অবরোধ ও অনেক প্রতিশ্রুতির তুচ্ছ পরিণাম দেখার পরে, সুধীন্দ্রনাথের এই বিরতিহীন পরিণতি আমাদের বিস্ময় ও শ্রদ্ধার বস্তু হ'য়ে রইলো।

যোরোপ থেকে প্রত্যাবর্তনের সঙ্গে-সঙ্গে সুধীন্দ্রনাথের সবচেয়ে সৃষ্টিশীল পর্যায় আরম্ভ হ'লো, তার অপর সীমা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সূত্রপাত। ১৯৩০ থেকে ১৯৪০ : এই দশ বৎসর তাঁর অধিকাংশ প্রধান রচনার জন্মকাল : প্রায় সমগ্র 'অর্কেস্ট্রা', 'ক্রন্দসী' ও 'উত্তরফাল্গুনী', প্রায় সমগ্র 'সংবর্ত', সমগ্র কাব্য ও গদ্য অনুবাদ, 'স্বগত' ও 'ঝুলায় ও কালপুরুষে'র প্রবন্ধাবলি—সব এই একটিমাত্র দশকের মধ্যে তিনি সমাপ্ত করেন। 'পরিচয়ে'র সবচেয়ে প্রোজ্জ্বল পর্যায়, ১৯৩১-১৯৩৬—তাও এই অধ্যায়ের অন্তর্ভূত। এই পাঁচ বৎসরের মধ্যে এমনও দিন গেছে যখন তিনি একই দিনে সাতটি শেক্সপীয়র-সনেট অনুবাদ করেছেন, একই দিনে রচনা করেছেন কবিতা ও গদ্য, কোনো লেখা শেষ করামাত্র আর-একটিতে হাত দিয়েছেন। এক প্রবল আবেগ তাঁকে অধিকার করেছিলো এই সময়ে, এক স্মৃতি তাঁকে আবিষ্ট ক'রে রেখেছিলো, কোনো-এক অপূরণীয় ক্ষতির ক্ষতিপূরণস্বরূপ অনবরত ভাষাশিল্প রচনা ক'রে যাচ্ছিলেন : জগতে ভগবান যদি না থাকেন, প্রেম ও ক্ষমা যদি অলীক হয়, তাহ'লেও মানুষ তার অমর আকাঙ্ক্ষার উচ্চারণ ক'রেই জগৎকে অর্থ দিতে পারে। এই আবেগের পরম ঘোষণা ১৯৪০-এ লেখা 'সংবর্ত' কবিতা; ঐ কবিতাটি রচনা করার পর তিনি যেন মুক্তিলাভ করলেন, কবিতার দ্বারা পীড়িত অবস্থা তাঁর কেটে গেলো।

মুক্তি? না। মায়াবিনী কবিতার দেখা একবার যে পেয়েছে, সে কি আর মুক্তি পেতে পারে? রচনার পরিমাণ হ্রাস পেলেও, আরাধ্যা সেই দেবীই

থাকেন। জীবনের শেষ দুই দশকে সুধীন্দ্রনাথ কবিতা বেশি রচনা করেননি, কিন্তু অনবরত নতুন ক'রে রচনা করেছেন নিজেকে, এবং সেটিও কবিকৃত্যের একটি প্রধান অঙ্গ। পুরোনো রচনার তৃপ্তিহীন পরিবর্তন ও পরিমার্জনা তাঁর—যা বন্ধুমহলে মাঝে-মাঝে সরোষ প্রতিবাদ জাগালেও অনেক স্মরণীয় পংক্তি প্রসব করেছে; তাঁর নতুন সংস্করণের ভূমিকা; 'দশমী'র কবিতাগুচ্ছ; এবং তাঁর আলাপ-আলোচনা : এই সব-কিছুর মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়েছে এমন একজন মানুষ, জগতের সঙ্গে যাঁর ব্যবহার বহুমুখী হ'লেও যাঁর ধ্যানের বিষয় বাণীমাধুরী। কবিতার প্রকরণগত আলোচনায় দেখেছি তাঁর অফুরন্ত উৎসাহ; 'আজি' ও 'আজই' শব্দের উচ্চারণগত পার্থক্য তাঁকে ভাবিয়েছে; বানান ও ব্যাকরণ বিষয়ে তাঁকে আমরা অভিধানের মতো ব্যবহার করেছি—আমার সমবয়সী বাঙালি লেখকদের মধ্যে তিনিই একমাত্র, যিনি বাংলা ও বাংলায় ব্যবহারযোগ্য প্রতিটি সংস্কৃত শব্দের নির্ভুল বানান জানতেন, এবং শব্দতত্ত্ব ও ছন্দশাস্ত্র বিষয়ে যাঁর ধারণায় ছিলো জ্ঞানাশ্রিত স্পষ্টতা। এই শব্দের প্রেমিক শব্দকে প্রতিটি সম্ভবপর উপায়ে উপার্জন করেছিলেন; জীবনব্যাপী সেই সংসর্গ ও অনুচিন্তনের ফলেই সম্ভব হয়েছিলো 'দ্বিধা-মলিদা' বা 'শুরু-অশুরু'র মতো বিস্ময়কর অথচ সম্পূর্ণ স্বাভাবিক অন্ত্যানুপ্রাস। সাহিত্যের তত্ত্ব বিষয়ে অনেকেই কথা বলতে পারেন ও ব'লে থাকেন, কিন্তু কতগুলো অস্পষ্ট ও অনিচ্ছুক ভাবনা-বেদনাকে ছন্দ ও ভাষার নিগড়ে বাঁধতে হ'লে যে-সব সমস্যা প্রত্যক্ষ হ'য়ে ওঠে, তা নিয়ে আলোচনা হ'তে পারে শুধু এক কবির সঙ্গে অন্য এক কবির : এবং এই রকম আলোচনার পক্ষে সুধীন্দ্রনাথের শূন্য স্থান পূরণ করার কেউ নেই ব'লে, আজ আরো স্পষ্ট বুঝতে পারি যে 'কবি' শব্দের প্রতিটি অর্থ সুধীন্দ্রনাথের রচনা ও জীবনের মধ্যে মূর্ত হয়েছিলো।

তাঁর বিষয়ে অনেকেই ব'লে থাকেন যে তিনি বাংলা কবিতায় 'ক্লাসিক রীতির প্রবর্তক।' এই কথার প্রতিবাদ ক'রে আমি এই মুহূর্তেই বলতে চাই যে সুধীন্দ্রনাথ মর্মে-মর্মে রোমান্টিক কবি, এবং একজন শ্রেষ্ঠ রোমান্টিক। এর প্রমাণস্বরূপ আমি দুটিমাত্র বিষয় উল্লেখ করবো : প্রথমত, তাঁর প্রেমের কবিতায় আবেগের তীব্রতা, বাসনা ও বেদনার অলজ্জিত ও ব্যক্তিগত

চীৎকার—যার তুলনা আবহমান বাংলা সাহিত্যে আমরা খুঁজে পাবো না, না বৈষ্ণব কবিতায়, না রবীন্দ্রনাথে, না তাঁর সমকালীন কোনো কবিতে। দ্বিতীয়ত, ভগবানের অভাবে তাঁর যন্ত্রণাবোধ—এটিও একটি খাঁটি রোমান্টিক লক্ষণ। তিনি ভগবানের অভাব কবিতা দিয়ে মেটাতে চাননি, জনগণ বা ইতিহাস দিয়েও না : তাই, তিনি নিজেকে জড়বাদী ব'লে থাকলেও, তাঁর কবিতা আমাদের ব'লে দেয় যে তাঁর তৃষ্ণা ছিলো সেই সনাতন অমৃতেরই জন্য। তিনি ছিলেন না যাকে বলে 'মিনারবাসী', স্বকালের জগৎ ও জীবনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে লিপ্ত হ'য়ে আছে তাঁর কবিতা ; কিন্তু যেহেতু তাঁর স্বকালে ভগবান মৃত, তাই কোনো মিথ্যা দেবতাকেও তিনি গ্রহণ করেননি ; যারা প্রফুল্ল মনে 'সমস্বর নামসংকীর্তনে' যোগ দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়, তাদের বীভৎসতার পাশে নিজের স্বর্গের কল্পনাটিও রেখে গেছেন। যা মর্ত্যভূমিতে সম্ভব নয় তা যাঁর গভীরতম আকূতি, তাঁকে কী ক'রে জড়বাদী বলা যায় ?

আর-একটি কথা বহু বছর ধ'রে শুনে আসছি : সুধীন্দ্রনাথের কবিতা দুর্বোধ্য। এ-বিষয়ে একটি পুরোনো লেখায় যা বলেছি, এখানে তার পুনরুক্তি করা ভিন্ন উপায় দেখি না। সুধীন্দ্রনাথের কবিতা দুর্বোধ্য নয়, দুরূহ ; এবং সেই দুরূহতা অতিক্রম করা অল্পমাত্র আয়াসসাপেক্ষ। অনেক নতুন শব্দ, বা বাংলায় অচলিত সংস্কৃত শব্দ তিনি ব্যবহার করেছেন : তাঁর কবিতার অনুধাবনে এই হ'লো একমাত্র বিঘ্ন। বলা বাহুল্য, অভিধানের সাহায্য নিলে এই বিঘ্নের পরাভবে বিলম্ব হয় না। এবং অভিধান দেখার পরিশ্রমটুকু বহুগুণে পুরস্কৃত হয়, যখন আমরা পুলকিত হ'য়ে আবিষ্কার করি যে আমাদের অজানা শব্দসমূহের প্রয়োগ একেবারে নির্ভুল ও যথাযথ হয়েছে, পরিবর্তে অন্য কোনো শব্দ সেখানে ভাবাই যায় না। সুধীন্দ্রনাথের কবিতার গঠন এমন যুক্তিনিষ্ঠ, এমন সুমিত তাঁর বাক্যবিন্যাস, পংক্তিসমূহের পারস্পর্য এমন নির্বিকার, এবং শব্দপ্রয়োগ এমন যথার্থ, যে মাঝে-মাঝে দুরূহ শব্দ ব্যবহার না-করলে তিনি হয়তো প্রাঞ্জলতার উদাহরণ ব'লেই গণ্য হতেন। কিন্তু মাঝে-মাঝে দুরূহ শব্দ ব্যবহার না-করলে, তাঁর কবিতা হ'তো না অমন সুমিত ও যুক্তিসহ, অমন ঘন ও সুশৃঙ্খল—অর্থাৎ, তাঁর চরিত্রই প্রকাশ পেতো না। আর এই দুরূহতা নিয়ে আপত্তি—পঁচিশ বছর আগেকার তুলনায় তা

এখন অনেক মৃদু হওয়া উচিত, কেননা ইতিমধ্যে তাঁর প্রবর্তিত বহু শব্দ লেখক ও পাঠকসমাজে প্রচলিত হ'য়ে গেছে ; অল্পবয়সীরা হয়তো জানেনও না যে 'অন্বিষ্ট', 'অভিধা', 'ঐতিহ্য', 'প্রমা', 'প্রতিভাস', 'অবৈকল্য', 'ব্যক্তিস্বরূপ', 'বহিরাশ্রয়', 'কলাকৈবল্য' প্রভৃতি শব্দ ও শব্দবন্ধ—যা তাঁরা হয়তো কিছুটা যথেচ্ছভাবেই ব্যবহার করছেন—এগুলোর প্রথম ব্যবহার হয় সুধীন্দ্রনাথের কবিতায় ও প্রবন্ধে, এমনকি 'ক্লাসিকাল' অর্থে ক্রপদী শব্দটিও তাঁরই উদ্ভাবনা। এই ধরনের শব্দসমবায়ের সাহায্যে তিনি যুগল সিদ্ধিলাভ করেছেন : একটিও ইংরেজি শব্দ ব্যবহার না-ক'রে, বা অগত্যা চিন্তাকে তরল না-ক'রে, লিখতে পেরেছেন জটিল ও তাত্ত্বিক বিষয়ে প্রবন্ধ, এবং তাঁর কবিতাকে দিয়েছেন এমন এক শ্রবণসুভগ সংহতি ও গম্ভীর ঐশ্বর্য, যাকে বাংলা ভাষায় অপূর্ব বললে বেশি বলা হয় না। এবং, এই সব শব্দরচনার দ্বারা, বাংলা ভাষার সম্পদ ও সম্ভাবনাকে তিনি কতদূর বাড়িয়ে দিয়েছেন, তা হয়তো না-বললেও চলে। আধুনিক বাংলার ও আধুনিক যুগের একজন শ্রেষ্ঠ কবির এই কাব্যসংগ্রহ যাঁরা প্রথম বার পড়বেন, তাঁরা আমার ঈর্ষাভাজন, আর যাঁরা চেনা কবিতার সঙ্গে নিবিড়তর সম্বন্ধস্থাপনের জন্য এগিয়ে আসবেন, আমি নিজেকে তাঁদেরই সতীর্থ ব'লে মনে করি, কেননা আমি জানি যে আমার অবশিষ্ট আয়ুকালে স্বল্প যে-ক'টি গ্রন্থ আমার নিত্যসঙ্গী হবে, এটি তারই অন্যতম।

এই গ্রন্থের ব্যবস্থাপনা বিষয়ে দু-একটি কথা বলা দরকার। 'অর্কেস্ট্রা' থেকে 'দশমী' পর্যন্ত কালানুক্রমে সাজিয়ে, 'তন্বী'কে স্থান দেয়া হ'লো 'দশমী'র পরে। কেননা, আমার বিশ্বাস, সুধীন্দ্রনাথ বেঁচে থাকলে আদ্যন্ত পরিশোধন না-ক'রে 'তন্বী'র পুনঃপ্রকাশে রাজি হতেন না ; এবং বর্তমান অবস্থায়, ঐতিহাসিক অর্থে সুধীন্দ্রনাথের প্রথম পুস্তক ব'লে, এর বিষয়ে আগ্রহান্বিত হবেন তাঁরাই, যাঁরা লেখকের পরবর্তী রচনাসমূহের সঙ্গে পরিচিত। তাই 'তন্বী'কে এই গ্রন্থের প্রথমে স্থান দিতে আমার বিবেকে বাধলো ; মনে হ'লো, অন্যান্য রচনা প'ড়ে আসার পরে 'তন্বী'তে পৌঁছনো পাঠকের পক্ষে অধিক সংগত হবে। পরিশিষ্ট অংশে স্থান পেলো দুটি অপ্রকাশিত কবিতা ('পুরস্কার' ও 'অমৃত'), 'ক্রন্দসী'র কয়েকটি কবিতার নূতন লেখন, ও 'বার্নট নর্টন'-এর

প্রথম অনুচ্ছেদের ছটি অনুবাদ ;—এই ক-টি পংক্তি সুধীন্দ্রনাথের সর্বশেষ রচনা। এবং তাঁর সর্বশেষ সমাপ্ত অনুবাদ-কবিতা, হান্স এগন হোল্টহুজেন-এর 'মৃত্যুর সময়',—সেটি 'প্রতিধ্বনি' পুস্তকের মধ্যে সংযোজিত হ'লো। মৃত্যুর আগে সুধীন্দ্রনাথ 'ক্রন্দসী'র নূতন সংস্করণ প্রস্তুত করছিলেন, ছাপা পৃষ্ঠার শাদা অংশে কিছু-কিছু সংশোধন ও পরিবর্তন রচিত হয়েছিলো। সেই সংশোধনে বানানে যে-সব পরিবর্তন দেখা যায়, আধুনিক পাঠকের অভ্যাসের সঙ্গে সংগতি রেখে সেগুলি এই গ্রন্থে যথাসম্ভব গ্রহণ করা হয়েছে। 'একটি কথার দ্বিধাথরথর চূড়ে / ভর করেছিল সাতটি অমরাবতী'—'অর্কেস্ট্রা'র প্রথম সংস্করণের এই লেখনের পরিবর্তে দ্বিতীয় সংস্করণে দ্বিতীয় পংক্তিটি ছিলো—'বাসা বেঁধেছিল সাতটি অমরাবতী'। কিন্তু তৃতীয় সংস্করণের জন্য সুধীন্দ্রনাথ আবার বদল ক'রে 'ভর করেছিল' লিখেছিলেন ; এই গ্রন্থে সেটিই গৃহীত হ'লো।

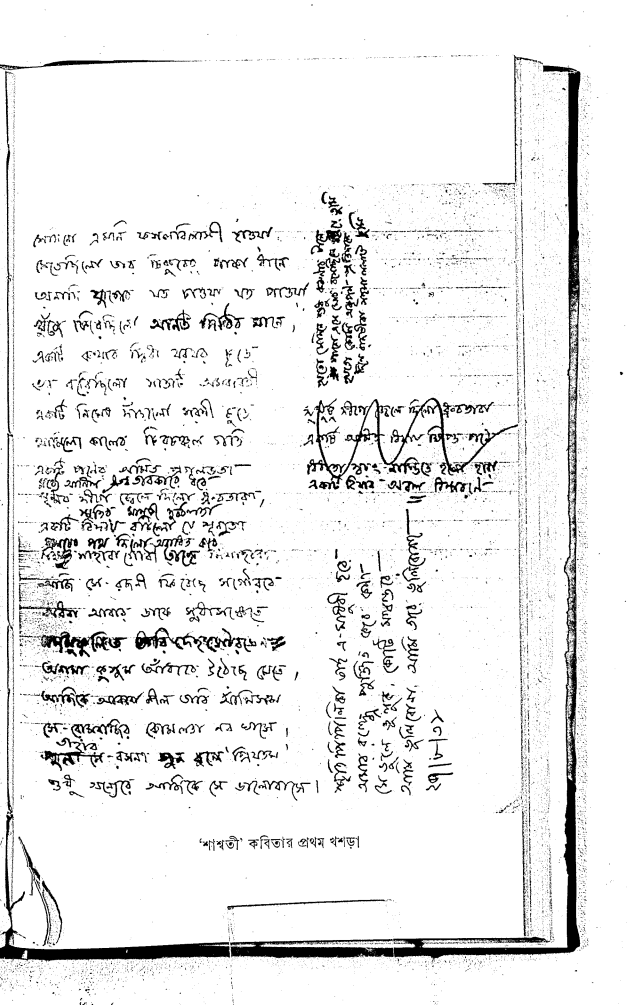

'শাশ্বতী' কবিতার প্রথম খশড়া

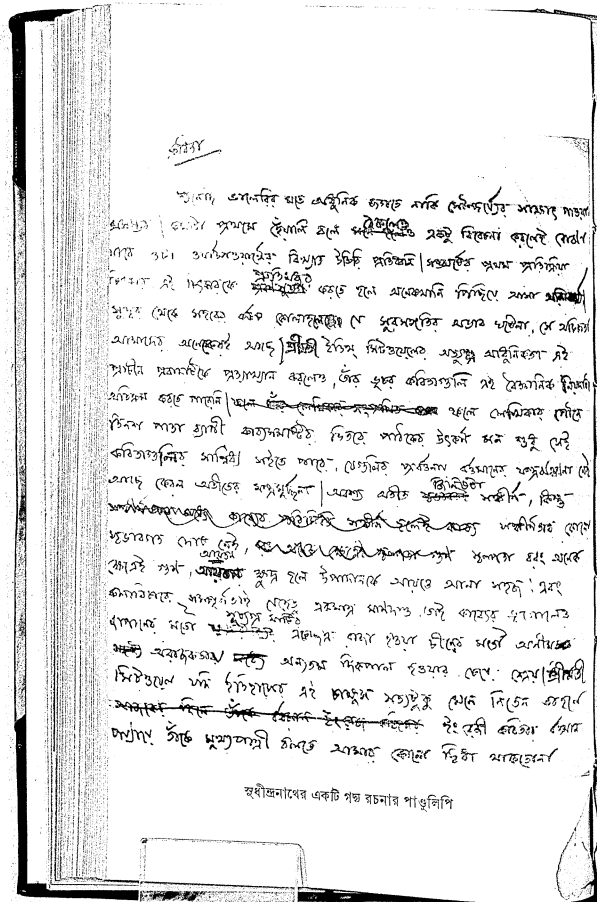

সুধীন্দ্রনাথের একটি গদ্য রচনার পাণ্ডুলিপি

কবিতা
বর্ষ ২৫, সংখ্যা ১-২

টি. এস. এলিয়ট-এর 'বার্ন্ট্ নর্টন'

প্রথম অনুচ্ছেদের অনুবাদ

সুধীন্দ্রনাথ দত্ত

প্রথম লেখন

বর্তমান কাল আর ভূত কাল, উভয়ে বুঝি বা
বর্তমান ভাবী কালে, এবং আশ্রিত
ভাবী কাল ভূত কালে। যদি হয় নিত্য বর্তমান
সর্ব কাল, তবে সর্ব কালের উদ্ধার
অগত্যা অকরণীয়। ঘটনার পর্যায়ে না উঠে
যা সতত ঘটনীয় থেকে গেল, তার
স্থিতি চির কল্পলোকে, সে কেবল বিমূর্ত ভাবনা।
যা ছিল সম্ভবপর একদা, এবং
যা আজ সম্পন্ন, [দুই] নিয়ন্ত্রিত নিত্য বর্তমানে।
স্মরণের যে-দালানে দৃকপাত করিনি
এ-পর্যন্ত যে-কবাট খুলে
গোলাপবাগানে যেতে পারিনি, সেখানে
পদপাত তোলে প্রতিধ্বনি,
তেমনই আমার বাক্য প্রতিধ্বনি তোমার মানসে।
কিন্তু কার উদ্দেশ্যে জানি না, জানি না
কেন বিচলিত ধূলি পাত্রপূর্ণ গোলাপের দলে।

দ্বিতীয় লেখন

বর্তমান কাল আর ভূত কাল, উভয়ে বুঝি বা
বর্তমান ভাবী কালে ; এবং আশ্রিত ভাবী কাল
ভূত কালে। যদি হয় নিত্য বর্তমান সর্ব কাল,
তবে সর্ব কালের উদ্ধার অসাধ্য। যা ঘটমান
নয়, ঘটেনি রয়েছে শুধু সদাঘটনীয়, সে যে
চির কল্পলোকে ভাবনার বিমূর্ত বিকার। ছিল
যা সম্ভবপর একদা, এবং নিষ্পন্ন যা আজ,
দুই সন্নিবিষ্ট নিত্য বর্তমানে। কার পদপাতে
প্রতিধ্বনিপ্রহত স্মৃতির সে-দালান, যা কখনও
আমাদের আকৃষ্ট করেনি, সে-কবাট, যা পেরিয়ে
গোলাপ বাগান। তেমনই আমার বাক্য প্রতিধ্বনি
তোমার অন্তরে।

জীবনী-পঞ্জি

জন্ম : ৩০ অক্টোবর, ১৯০১, কলকাতা। পিতা : হীরেন্দ্রনাথ দত্ত ; মাতা : ইন্দুমতী বসু মল্লিক (প্রবোধচন্দ্র বসু মল্লিকের কন্যা ও রাজা সুবোধচন্দ্র বসু মল্লিকের ভগিনী) ; খুল্লতাত : অমরেন্দ্রনাথ দত্ত।

শিক্ষা : আনি বেসান্ত -প্রতিষ্ঠিত থিয়জফিকাল হাই স্কুল, বানারস, ১৯১৪-১৯১৭ ; ওরিয়েন্টাল সেমিনারি, কলকাতা, ১৯১৭-১৮ (ম্যাট্রিকুলেশন, প্রথম বিভাগ, ১৯১৮) ; স্কটিশ চার্চ কলেজ, কলকাতা, ১৯১৮-১৯২২ (ডিস্টিঙ্কশন-সমেত বি. এ. ১৯২২) ; কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ল কলেজ, ১৯২২-২৪ ; কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ইংরেজি বিভাগে এম. এ., ১৯২২-১৯২৩ ; পিতার কাছে অ্যাটর্নিশিপ-এ শিক্ষানবিশি, ১৯২২-১৯২৭ (এম. এ., বি. এল., অথবা অ্যাটর্নিশিপ-এর কোনোটিতেই পরীক্ষা দেননি।)

প্রথম বিবাহ : শ্রীমতী ছবি বসু ; ২২ জুলাই, ১৯২৪। (১৯২৫, মে মাসে একটি পুত্রসন্তানের জন্ম হয়, জন্মমুহূর্তেই শিশুটির মৃত্যু ঘটে।)

প্রথমবার বিদেশযাত্রা : ফেব্রুয়ারি-ডিসেম্বর, ১৯২৯। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে জাপান ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ; একাকী য়োরোপের বিভিন্ন দেশ। জর্মানিতে রোগভোগ ও আরোগ্যলাভ।

'পরিচয়' প্রকাশ : শ্রাবণ, ১৩৩৮ (১৯৩১)। ত্রৈমাসিক অবস্থায় পাঁচ বৎসর ও মাসিক অবস্থায় সাত বৎসর সম্পাদনা করেন। দ্বিতীয় পর্যায়ে কিছুকাল (১৩৪৬-১৩৫০) হিরণকুমার সান্যাল যুগ্ম-সম্পাদক। ১৩৫০ আষাঢ়ের পর সম্পর্ক ত্যাগ।

অন্যান্য কর্ম : 'ফরওঅর্ড' দৈনিকপত্রের সম্পাদকীয় বিভাগে অবৈতনিক কর্ম : ১৯২৮-২৯ (একই সময়ে কলকাতায় অনুষ্ঠিত ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেসের অধিবেশনের প্রচারবিভাগের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন) ; 'সবুজপত্রে'র নবপর্যায়ের সঙ্গে সংস্রব : আশ্বিন ১৩৩২ থেকে পত্রিকার

বিলুপ্তি পর্যন্ত। লাইট অব এশিয়া ইনশিওরেন্স কোম্পানি : ১৯৩০-১৯৩৩ ; এ. আর. পি. : ১৯৪২-১৯৪৫ ; 'স্টেটসম্যান'-এর সহকারী সম্পাদক : ১৯৪৫-১৯৪৯ ; দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশনের প্রচার-সচিব, ১৯৪৯-১৯৫৪ ; ইনষ্টিট্যুট অব পাব্লিক ওপিনিয়ন-এর কলকাতা শাখার পরিচালক, ১৯৫৪-১৯৫৬ ; যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে তুলনামূলক সাহিত্যবিভাগে অধ্যাপক : ১৯৫৬-৫৭ ও ১৯৫৯-৬০ (মধ্যবর্তী দুই বৎসর প্রবাসে)।

দ্বিতীয় বিবাহ : শ্রীমতী রাজেশ্বরী বাসুদেব ; ২৯ মে, ১৯৪৩।

দ্বিতীয়বার বিদেশযাত্রা : এপ্রিল-সেপ্টেম্বর, ১৯৫২ ; য়োরোপের বিভিন্ন দেশ।

তৃতীয়বার বিদেশযাত্রা : ১৯৫৫-৫৬ ; য়োরোপের বিভিন্ন দেশ।

চতুর্থবার বিদেশযাত্রা : ১৯৫৭-৫৯ : জাপান, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, য়োরোপের বিভিন্ন দেশ। (শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের সংলগ্ন হ'য়ে প্রায় সাত মাস অবস্থান করেন।)

মৃত্যু : ২৫ জুন, ১৯৬০

সুধীন্দ্রনাথ দত্তর গ্রন্থপঞ্জি

কবিতা :

১. তন্বী : প্রথম সংস্করণ ১৩৩৭। 'এম. সি. সরকার এণ্ড সন্স কলিকাতা ১৫ নং কলেজ স্কোয়ার হইতে শ্রী সুধীরচন্দ্র সরকার কর্তৃক প্রকাশিত'। উৎসর্গ : 'রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শ্রীচরণে অর্ঘ্য—ঋণশোধের জন্য নয় ঋণস্বীকারের জন্য'। 'পরবর্তী কবিতাগুলোর উপরে স্বদেশী বিদেশী অনেক কবিই ছায়াপাত করেছেন—সব সময়ে গ্রন্থকারের সম্মতিক্রমে নয়। কেবল রবীন্দ্রনাথের ঋণ সর্বত্রই জ্ঞানকৃত।··· কলিকাতা, ৩১ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৭, শ্রী সুধীন্দ্রনাথ দত্ত।' কবিতার নাম : তন্বী, নবীন লেখনী, শ্রাবণবন্যা, বর্ষার দিনে, বাৎসরিক, পলাতকা, উর্বশী, মৃত প্রেম, ভ্রষ্টলগ্ন, শূদ্রার, কবি, অতন্দ্রায়, অন্ধকার, অনাহূত, পশ্চিমের ডাক, অন্তিম গীতিকা, প্রতিহিংসা, নিকষ, অপলাপ, হিমালয়, চ্যুতকুসুম, উত্তমর্ণ, মানবী, কৈফিয়ৎ, অবিনশ্বর, স্মরণ, অভিসার, অভিব্যাপ্তি, চিরন্তনী।

২. অর্কেস্ট্রা : প্রথম সংস্করণ সেপ্টেম্বর ১৯৩৫ ; প্রকাশক : ভারতীভবন। উৎসর্গ : 'সত্যেন্দ্রনাথ বসুর করকমলে'। কবিতার নাম : হৈমন্তী, চপলা, অপচয়, কস্মৈ দেবায়, পণ্ডশ্রম, মূর্তিপূজা, মহাসত্য, পুনর্জন্ম, ভবিতব্য, বিকলতা, অনুষঙ্গ, মহাশ্বেতা, সঞ্চয়, প্রলাপ, উদ্‌ভ্রান্তি, নাম, জিজ্ঞাসা, সমাপ্তি, দৈন্য, ধিক্কার, সর্বনাশ, মার্জনা, শাশ্বতী, বিস্মরণী ও সাতটি অংশে বিভক্ত নামকবিতা। দ্বিতীয় সংস্করণ (পরিবর্তিত) মার্চ ১৯৫৪ : বৈশাখ ১৩৬১। দ্বিতীয় সংস্করণের প্রকাশক : শ্রী দিলীপ কুমার গুপ্ত, সিগনেট প্রেস, ১০।২ এলগিন রোড, কলকাতা ২০। প্রচ্ছদপট : সত্যজিৎ রায়। ভূমিকা সংবলিত :···'এলিয়ট কবিকে ঘটক আখ্যা দিয়েছেন ; এবং আমিও মনে করি যে ব্যক্তিগত মনীষায় জাতীয় মানস ফুটিয়ে তোলাই কবিজীবনের পরম সার্থকতা। কিন্তু আপন কালের স্বধর্ম ভুললেই; সে-সময়য় সহজ হয় না, উক্ত সঙ্গমের দিকে এগোতে চাইলে, নিজের অভিজ্ঞতাকে, তথা জাতিগত

চৈতন্যকে, প্রতীক-রূপে দেখা দরকার ; এবং ওই দিব্যদৃষ্টি যাঁর অধিকারে, তাঁর কাছে আমার প্রিয়া আর কালিদাসের কান্তা এক বটে, তবু সে-অভেদের ভিত্তি ব্যতিহার্য ছদ্মবেশে নয়, প্রেমানুভূতির নৈর্ব্যক্তিক স্বরূপে। পক্ষান্তরে "অর্কেস্ট্রা"র অভিজ্ঞতা নিষ্কর্ষের ধার ধারে না ; তার পুঙ্খানুপুঙ্খও যাতে স্মৃতিপটে চিরমুদ্রিত থাকে, সেই জন্যেই তার চতুর্দিকে মনের এই অবিরাম পরিক্রমা ; এবং তার প্রতি লেখকের মমতা আত্যন্তিক ব'লেই, সে-তিলোত্তমার স্বতন্ত্র সত্তা সে-দিন ধরা পড়েনি। অর্থাৎ "অর্কেস্ট্রা"য় উক্তি ও উপলব্ধির সাযুজ্য অনুপস্থিত।……আজ যদিও জানি না ইতিমধ্যে লিপিচাতুর্যে সত্যই এগিয়েছি কিনা, তথাচ আমার বিচারবুদ্ধি সন্নিকর্ষের ফলে আর ব্যাহত নেই ; এবং সেই জন্যে বিনা সংশোধনে "অর্কেস্ট্রা"-র পুনর্মুদ্রণ আমার বিবেকে বাধল।…১ অগস্ট, ১৯৫৩।'

৩. ক্রন্দসী : প্রথম সংস্করণ ১৩৪৪। ভারতীভবন, ১১ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। প্রকাশক : শ্রী কুন্দভূষণ ভাদুড়ী। উৎসর্গ : 'হমফ্রে হাউস্ বন্ধুবরেষু'। কবিতার নাম : উটপাখি, সন্ধান, সৃষ্টিরহস্য, প্রত্যাখ্যান, জাদুঘর, বর্ষপঞ্চক, বর্ষশেষ, প্রতর্ক, কাল, অকৃতজ্ঞ, লঘিমা, বিরাম, প্রশ্ন, প্রতীক, জাতিস্মর, নরক, কুহক, ভাগ্যগণনা, মৃত্যু, সিনেমায়, সমাপ্তি, পরাবর্ত, বাক্য, প্রার্থনা।

৪. উত্তরফাল্গুনী : প্রথম সংস্করণ ১৩৪৭। 'পরিচয় প্রেস্ ৮ বি দীনবন্ধু লেন হইতে শ্রী কুন্দভূষণ ভাদুড়ী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত'। উৎসর্গ : 'সুমন্ত্র মহালনবিশের করকমলে'। প্রচ্ছদপট : শ্রী যামিনী রায়। কবিতার নাম : শর্বরী, সংশয়, ব্যবধান, প্রতিদান, মৌনব্রত, নিরুক্তি, অহৈতুকী, মরণতরণী, অনহুতপ্র, প্রশ্ন, দুঃসময়, জন্মান্তর, বিলয়, মহানিশা, জাগরণ, মাধবী পূর্ণিমা, ডাক, দ্বন্দ্ব, প্রতিপদ।

৫. সংবর্ত : প্রথম সংস্করণ, জ্যৈষ্ঠ ১৩৬০ ; দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৩৬২। প্রকাশক : শ্রী দিলীপকুমার গুপ্ত, সিগনেট প্রেস, ১০।২ এলগিন রোড, কলকাতা ২০। নামপত্র : সত্যজিৎ রায় ; প্রচ্ছদপট : শুভেন্দু বসু ; দ্বিতীয়

সংস্করণের প্রচ্ছদপট : সত্যজিৎ রায়। উৎসর্গ : 'আবু সয়ীদ আইয়ুব বন্ধুবরের করকমলে'। 'সংবর্ত' ও 'প্রাক্তনী' এই দুটি অংশে বিভক্ত ; মুখবন্ধের অংশ :…'মালার্মে-প্রবর্তিত কাব্যাদর্শই আমার অদ্বিষ্ট : আমিও মানি যে কবিতার মুখ্য উপাদান শব্দ ; এবং উপস্থিত রচনাসমূহ শব্দ প্রয়োগের পরীক্ষা-রূপেই বিবেচ্য।…কলকাতা। ৩১ মে ১৯৫৩।' কবিতার নাম : নান্দীমুখ, উপসংহার, উজ্জীবন, জেসন, সংক্রাম, কান্তে, জাতক (১ ও ২), সংবর্ত, বিপ্রলাপ, কঙ্কুকী, সোহংবাদ, ১৯৪৫, যযাতি, উন্মার্গ, প্রত্যাবর্তন। 'প্রাক্তনী' অংশে সংকলিত : পুনরাবৃত্তি, লগ্নহারা, অসময়ে আহ্বান, প্রত্যাখ্যান, প্রতিধ্বনি, অনিকেত, পথ। নিখিলবঙ্গ রবীন্দ্রসাহিত্যসম্মেলনের নির্বাচনে ১৩৬০ সালের শ্রেষ্ঠ কাব্যগ্রন্থরূপে সম্মানিত।

৬. প্রতিধ্বনি : প্রথম সংস্করণ ফাল্গুন ১৩৬১। প্রকাশক : শ্রী দিলীপকুমার গুপ্ত, সিগনেট প্রেস, ১০।২ এলগিন রোড, কলকাতা ২০। প্রচ্ছদপট : সত্যজিৎ রায়। উৎসর্গ : 'ইন্দিরা ও সুশীলকুমার দে-র করকমলে'। ভূমিকার অংশ :…'যখন বিদেশী কবিতার অনুবাদ আরম্ভ করি, তখন আমার মনে কোনও মতের বালাই ছিল না, কর্মপ্রবর্তনা পেয়েছিলুম সাময়িক ভালো লাগা থেকে ; এবং সে-মৌল সারল্য যে-পর্যন্ত ফুরয়নি, সে-পর্যন্ত যদিও সংশোধনের প্রয়োজন বুঝিনি, তবু সংস্কারকর্ম এগিয়েছে ছন্দের শৈথিল্য, শব্দের অপপ্রয়োগ, বাক্যের জড়তা, চিত্রকল্পের অসঙ্গতি ইত্যাদি মীমাংসানিরপেক্ষ ত্রুটি-বিচ্যুতির প্রতিবিধানে। এ-দিক দিয়ে দেখলেও, পরবর্তী রচনাবলী আমারই দোষ-গুণের নিদর্শন ; এবং এমন ভাবা ভুল যে উদ্ভাবন-শক্তির অভাববশতই আমি এই পরকীয় লেখাগুলোর পিছনে এত সময় কাটাতে পেরেছি। কারণ উক্ত পরিশ্রম আসলে অপচয় নয় ; এবং অনুবাদে বৈশিষ্ট্যের অবকাশ যতই থাক না কেন, তার সুপরিমিত সীমা যেহেতু স্বেচ্ছাচারের পরিপন্থী, তাই তার চর্চা স্বায়ত্তশাসনের নামান্তর। অন্ততঃপক্ষে আমাকে অনুবাদ পরীক্ষা-নিরীক্ষার যে-সুযোগ দিয়েছে, নিজের বক্তব্যে তার অর্ধেকও

মেলেনি ; এবং সেইজন্যে যে-উদ্যমের প্রস্তাবনা নিছক ভালো লাগায়, তার পরিণতি দুরূহের দারুণ আকর্ষণে।...কলকাতা ॥ ১১ জুলাই ১৯৫৪।'

ইংরেজি থেকে অনূদিত : হিউ মেনাই-এর প্রদীপ ; জন মেসফীল্ড্-এর মাধুরী, প্রদোষ ; সীগফ্রিড সস্থন-এর স্বপ্নপ্রয়াণ ; ডি. এইচ. লরেন্সের কালতরী ; সি. ফীল্ড্-এর উত্তর ; ও উইলিয়ম শেক্সপীয়রের পুত্রেষ্টি, ফাল্গুনী, নিত্য সাক্ষী, মিতভাষী, বিনিময়, শান্তিনিকেতন, দুর্দিনের বন্ধু, সান্ত্বনা, উত্তরাধিকারী, সৌরধর্ম, দুঃসময়, নির্বিকার, গুপ্তপ্রেম, পুরবী, অবিনাশ, প্রাণবায়ু, অনিবার্য, কালযাত্রা, অতি দৈব, কামরূপ, মৃন্ময়ী, জ্ঞানপাপী, মৃত্যুঞ্জয়।

জর্মান থেকে অনূদিত : হান্স কারোসা-র জয়ন্তী ; হাইনরিখ হাইনে-র গোধূলি, তত্ত্বকথা, মন্ত্রগুপ্তি, অধঃপাত, মায়ার খেলা, অবিশ্বাসী, পরিবাদ, প্রত্যাবর্তন, আত্মপরিচয়, রোমন্থ, বর্ষশেষ, সূর্যাস্ত, স্মৃতিবিষ, মহাকাব্য, প্রমারা, প্রায়শ্চিত্ত ; ও য়োহান ভোল্‌ফ্‌গাং‌গ্ ফন গ্যেটের বিদায়, সুরাত্রি।

ফরাশি থেকে অনূদিত : পোল ভালেরি-র আদিনাগ ; ও স্তেফান মালার্মে-র বাতায়ন, উজ্জীবন, উৎকণ্ঠা, নীলিমা, সমুদ্রসমীর, ফনের দিবাস্বপ্ন।

ফনের দিবাস্বপ্ন ভাষ্য সংবলিত।

৭. দশমী : প্রথম সংস্করণ বৈশাখ ১৩৬৩। প্রকাশক : শ্রী দিলীপকুমার গুপ্ত, সিগনেট প্রেস, ১০।২ এলগিন রোড, কলকাতা ২০।. কবিতার নাম : প্রতীক্ষা, নৌকাডুবি, অগ্রহায়ণ, ভ্রষ্টতরী, তীর্থপরিক্রমা, ভূমা, উপস্থাপন, প্রত্যুত্তর, অসঙ্গতি, নষ্টনীড়। উৎসর্গ : 'অবনীভূষণ চট্টোপাধ্যায় বন্ধুবরেষু'। পিছনের মলাটে প্রকাশকের নিবেদন : 'স্বর্গীয়নাথের পরবর্তী কাব্যগ্রন্থে এই কবিতাগুলি সংযোজিত হবে। এই কারণে "দশমী"র পুনর্মুদ্রণ সম্ভব হবে না।'

প্রবন্ধ :

১. স্বগত : প্রথম সংস্করণ ১৩৪১। ভারতী ভবন, ১১ কলেজ স্কোয়ার, কলকাতা থেকে শ্রী কুন্দভূষণ ভাদুড়ী কর্তৃক প্রকাশিত। মুখপত্র ও নামপত্রের ছবি : যামিনী রায়। উৎসর্গ : 'ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের করকমলে'। 'সূচনা' ব্যতীত পাঁচটি অংশে বিভক্ত, প্রবন্ধের সংখ্যা ১৯। প্রবন্ধের নাম : কাব্যের মুক্তি, ধ্রুপদ-খেয়াল, ছন্দোমুক্তি ও রবীন্দ্রনাথ, ডি. এইচ. লরেন্স ও ভর্জিনিয়া উলফ্, ফরাসীর হার্দ্য পরিবর্তন, উইলিয়ম ফকনর, উপন্যাসে তত্ত্ব ও তথ্য, ম্যাকসিম গোর্কি, দোস্তোয়েভ্‌স্কি, লিটন্ ষ্ট্রেচি, উইণ্ড্যাম লুইস ও এজ্‌রা পাউণ্ড, ঐতিহ্য ও টি. এস. এলিয়ট, ভর্জ্ বি. য়েট্‌স্ ও কলাকৈবল্য, ক্লেরার্ড ম্যানলি হপকিন্স, "বাংলা ছন্দের মূলসূত্র", "অন্তঃশীলা", "চোরাবালি", সূর্যাবর্ত।

২. স্বগত : দ্বিতীয় (পরিবর্তিত ও পরিমার্জিত) সংস্করণ আষাঢ় ১৩৬৪। প্রকাশক : শ্রী দিলীপকুমার গুপ্ত, সিগনেট প্রেস, ১০।২ এলগিন রোড, কলকাতা ২০। প্রচ্ছদপট : সত্যজিৎ রায়। 'সূচনা' ও 'পুনশ্চ' ছাড়া পনেরোটি প্রবন্ধ ; প্রাসঙ্গিক মন্তব্য : ' "স্বগত"-এর প্রথম সংস্করণে রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে দুটো প্রবন্ধ এবং তিনখানা বাংলা বইয়ের সমালোচনা সন্নিবিষ্ট হয়েছিল। তারপর গ্রন্থকার কবিগুরু তথা বঙ্গসাহিত্য সম্পর্কে আরও কয়েকবার লিখেছেন ; এবং সেগুলো "স্বগত"-এর অন্তর্গত রচনাবলীরই সগোত্র। কিন্তু "স্বগত" বর্তমানেও এমন অতিকায় যে, আবার তার কলেবরবৃদ্ধি বাঞ্ছনীয় নয় ; এবং সেইজন্যে নূতন সংস্করণ থেকে প্রাগুক্ত পাঁচটা লেখা বাদ পড়ল। তৎপরিবর্তে অল্‌ডাস্ হাক্সলি ও ওমানির প্রসঙ্গে একটি নিবন্ধ এখানে স্থান পেলে ; এবং সেটার বিষয় যেহেতু বিদেশী সাহিত্য, তাই উপস্থিত সংগ্রহে তার প্রবেশ অনধিকার নয়। "পুনশ্চ"-ও আগন্তুক ; তবে তার আবির্ভাব উপলক্ষঘটিত ব'লে, সে কৈফিয়তের অপেক্ষা রাখে না।' সূচি : সূচনা, কাব্যের মুক্তি, ধ্রুপদ-খেয়াল, ডি. এইচ. লরেন্স ও ভর্জিনিয়া উল্‌ফ, ফরাসীর হার্দ্য পরিবর্তন,

উইলিয়ম ফকনর, উপন্যাসে তত্ত্ব ও তথ্য, ম্যাকসিম গর্কি, দোটানা, গুরুচণ্ডাল, বার্নার্ড শ, লিটন্ ষ্ট্রেচি, উইণ্ডাম ল্যুইস ও এজরা পাউণ্ড, ঐতিহ্য ও টি. এস. এলিয়ট, ভর্জ্য. বি. য়েটস ও কলাকৈবল্য, ক্লেরার্ড ম্যানলি হপকিন্স, পুনশ্চ।

৩. কুলায় ও কালপুরুষ: প্রথম সংস্করণ আষাঢ় ১৩৬৪। প্রকাশক শ্রী দিলীপ-কুমার গুপ্ত, সিগনেট প্রেস, ১০।২ এলগিন রোড, কলকাতা ২০। প্রচ্ছদপট: সত্যজিৎ রায়। উৎসর্গ: 'আমার প্রথম শ্রোতাদের মধ্যে যিনি সহগুণে ও অনুকম্পায় অদ্বিতীয় সেই ধীরেন্দ্রনাথ মিত্রের শ্রীকরকমলে'। সূচি: মুখবন্ধ, রবীন্দ্রপ্রতিভার উপক্রমণিকা, রবিশস্য, ছন্দোমুক্তি ও রবীন্দ্রনাথ, সূর্যাবর্ত, দিনান্ত, উক্তি ও উপলব্ধি, 'অন্তঃশীলা', 'চোরাবালি', 'বাংলা ছন্দের মূল সূত্র', শিল্প ও স্বাধীনতা, মনুষ্যধর্ম, অদ্বৈতের অত্যাচার, বিজ্ঞানের আদর্শ, উদয়াস্ত, আঠারো শতকের আবহ, ভিক্টোরীয় ইংলণ্ড, অনার্য সভ্যতা, পিতা-পুত্র, প্রগতি ও পরিবর্তন।

'কবিতা'-য় প্রকাশিত সুধীন্দ্রনাথের কবিতার তালিকা

বর্ষ ১

সংখ্যা ১, আশ্বিন ১৩৪২ : জাগরণ (মিলননিবিড় রাত্রি পরিকীর্ণ নিখিল ভুবনে)
জন্মান্তর (আধখানা চাঁদ রূপার কাঠির পরশে)
সংখ্যা ২, পৌষ ১৩৪২ : শেক্সপীয়রের সনেট অবলম্বনে ২৭ (শান্তিসমুৎসুক হ'য়ে ত্বরা লই আশ্রয় শয়নে)
শেক্সপীয়রের সনেট ২৯ (ভাগ্যের ভ্রূভঙ্গে আর মানুষের তিরস্কারে জ্ব'লে)
সংখ্যা ৩, চৈত্র ১৩৪২ : ডাক (তার সাথে আর হয় না আমার দেখা)
সংখ্যা ৪, আষাঢ় ১৩৪৩ : প্রতীক (মিলের ধোঁওয়ায় ঢাকা শরতের নীল নভস্তল)

বর্ষ ২

সংখ্যা ১, আশ্বিন ১৩৪৩ : বাতায়ন (মৃতকল্প প্রবঞ্চক বকধর্মে সহসা বিরূপ: মালার্মে-র অনুবাদ)
সংখ্যা ২, পৌষ ১৩৪৩ : সমাপ্তি (বরষাবিগ্ন বেলা কাটালাম উন্মন আবেশে)
সংখ্যা ৩, চৈত্র ১৩৪৩ : অকৃতজ্ঞ (আমার মৃত্যুর দিনে কৌতূহলী প্রশ্ন করে যদি)
সংখ্যা ৪, আষাঢ় ১৩৪৪ : প্রার্থনা (হে বিধাতা)

বর্ষ ৩

সংখ্যা ১, আশ্বিন ১৩৪৪ : প্রতিপদ (সমাপ্ত সংরক্ত রাত্রি। শ্রান্ত দোল-পূর্ণিমার শশী)
সংখ্যা ২, পৌষ ১৩৪৪ : শেক্সপীয়রের সনেট ৩৩ (দেখেছি অনেকবার রাত্রিশেষে খেয়ালী তপন)
শেক্সপীয়রের সনেট ৩৪ (নির্মল, নির্মুক্ত দিন তুমিই তো দেখে বলেছিলে)

বর্ষ ৪

সংখ্যা ১, আশ্বিন ১৩৪৫ : নান্দীমুখ (তোমার যোগ্য গান বিরচিব ব'লে)
সংখ্যা ২, পৌষ ১৩৪৫ : উপসংহার (সমাপ্ত সর্পিল পথ দিগন্তের পর্বত-শিখরে)
সংখ্যা ৩, চৈত্র ১৩৪৫ : শেক্সপীয়রের সনেট ৩০ (যখনি বিক্ষিপ্ত চিত্ত মৌন হয় মাধুর্যের ধ্যানে)
শেক্সপীয়রের সনেট ৩১ (ও-প্রেয় বক্ষের মূল্য বৃদ্ধি করে তাদের হৃদয়)
সংখ্যা ৪, আষাঢ় ১৩৪৬ : সংক্রান্ত (তোমার আমার মাঝে বিরহের বাহিনী বহে না)

বর্ষ ৫

বিশেষ পূজাসংখ্যা, কার্তিক ১৩৪৬ : 'এ যুগের চাঁদ হ'লো কাস্তে' (আকাশে উঠেছে কাস্তের মতো চাঁদ)
সংখ্যা ২, পৌষ ১৩৪৬ : ব্যবধান (তোমারে বোঝার বুদ্ধি আজো মোরে দেয়নি বিধাতা)

বর্ষ ৬

সংখ্যা ১, আশ্বিন ১৩৪৭ : জাতক (উন্মুক্ত আকাশে শুনি চমৎকৃত চিলের চীৎকার)
সংখ্যা ৩, চৈত্র ১৩৪৭ : Als die junge Rose blühte (গোলাপ-চারায় ফুল ফুটেছিলো সে-দিন যবে)
Das gelbe Laub erzittert (পীতশাখে ওই ধরেছে কাঁপন)
Es glänzt so schön die sinkende Sonne (নির্বাণমুখ রবিরে রম্য লাগে)

বর্ষ ৭

সংখ্যা ১, আশ্বিন ১৩৪৮ : হাইনের 'Die Geissblattlaube—Ein Sommerabend' অবলম্বনে

(মধুমালতীর কুঞ্জ—চৈত্রসন্ধ্যা—আমরা দু-জনে)

বর্ষ ১৫

সংখ্যা ৪, আষাঢ় ১৩৫৭ : পুনর্লিখিত কিশোর কবিতা
অসময়ে আহ্বান (মরণ, আমারে দিয়েছো আজিকে ডাক)
প্রতিধ্বনি (নিষ্ফল স্বেদ, বৃথা নির্বেদ)

বর্ষ ১৬

সংখ্যা ৪, আশ্বিন ১৩৫৮ : পথ (অনুগ উত্তর হ'তে পলাতক দক্ষিণের পাছে)

বর্ষ ১৭

সংখ্যা ৩, চৈত্র ১৩৫৯ : যযাতি (উত্তীর্ণ পঞ্চাশ : বনবাস প্রাচ্য প্রাজ্ঞদের মতে)
সংখ্যা ৪, আষাঢ় ১৩৬০ : Cyclone (On days of rain I still remember her)

বর্ষ ১৮

সংখ্যা ১, আশ্বিন ১৩৬০ : হিউ মেনাই অবলম্বনে : প্রদীপ (বনবীথি জনশূন্য নিশীথে)
সংখ্যা ২, পৌষ ১৩৬০ : স্তেফান মালার্মে অবলম্বনে : ফনের দিবাস্বপ্ন (ওই অপ্সরীরা, মন চায় ওদের চিরায়ু দিতে)
সংখ্যা ৪, আষাঢ় ১৩৬১ : পোল ভালেরি অবলম্বনে : আদিনাগ (মহীরুহ দোদুল মারুতে)

বর্ষ ১৯

সংখ্যা ১, আশ্বিন ১৩৬১ : নৌকাডুবি (শরতের সমীরোহ প্রকাণ্ড প্রান্তরে)
সংখ্যা ৩, চৈত্র ১৩৬১ : অগ্রহায়ণ (হেমন্তের বেলা প'ড়ে আসে)

বর্ষ ২০

সংখ্যা ৩, চৈত্র ১৩৬২ : তীর্থপরিক্রমা (এখনও গেল না ভোলা, যদিও এ-দেশ স্নিগ্ধ নয়)
ভূমা (সবুজের স্বরগ্রাম ফাল্গুনের রৌদ্রে হিরণ্ময়)

বর্ষ ২৪

সংখ্যা ২, পৌষ ১৩৬৬ : The Vagrant (The tree, a shock of red and yellow, shakes its crown)
1945 (Predicting victory, you said that, diabolic though)

সংখ্যা ৩, চৈত্র ১৩৬৬ : হান্স এগন হোল্‌ট্‌হুজন অবলম্বনে : মৃত্যুর সময় (আজও তবু পৃথিবীই আমাদের চোখ জুড়ে আছে)

শ্রীরাজেশ্বরী দত্ত -সহযোগে

বর্ষ ২৪

সংখ্যা ২, পৌষ ১৩৬৬
(শততম সংখ্যা)

A Requiem For Ashes : Paul Gilson
(The dust being that of a wall)
Late In The Night : Pierre Reverdy
(The colour decomposed by night)
White And Black : Pierre Reverdy
(How to live elsewhere except near)
Palimpsest : Georges Gabory
(As from a cold and passive tree)
The Rose of May : Francesco Arcangeli
(May's light can only ravage)
A Rose : Francesco Arcangeli
(Sweet bee, O friend of mournfulness)
Venus : Francesco Arcangeli
(Upon the evening's verdant dust)
Variation on Time And Death : Hans Egon Holthusen
(And still today we have the world before our eyes)

Autumn Crocus : Georg Von Der Vring
(The asters' blue is like the dust itself)
Fall off, O Heart : Ingeborg Bachmann
(Fall off, O heart, fall off the tree of time)
My Room : Guenter Eich
(When I threw my windows open)
A Night-song For O : Horst Lange
(O slumber, soundly now, be one with sleep)

'কবিতা'-য় প্রকাশিত সুধীন্দ্রনাথের প্রবন্ধের তালিকা

বর্ষ ৩

বিশেষ সমালোচনা সংখ্যা, বৈশাখ ১৩৪৫ : স্বগত

বর্ষ ১৪

সংখ্যা ২, পৌষ ১৩৫৫ : টি. এস. এলিয়ট
(ইংরেজি প্রবন্ধের বুদ্ধদেব বসু -কৃত অনুবাদ)

বর্ষ ১৮

সংখ্যা ২, পৌষ ১৩৬০ : ফ্রয়েডের দিবাস্বপ্নের ভাষ্য

বর্ষ ২০

সংখ্যা ৪, আষাঢ় ১৩৬৩ : সমালোচনার স্বাধিকার

'বৈশাখী'-তে প্রকাশিত সুধীন্দ্রনাথের রচনার তালিকা

কবিতা :

১৩৪৮ : হাইনের 'Wir sassen am Fischerhause' অবলম্বনে
(মাঝি-মাল্লার বৈকালী সভা)

কবিতা

যুগ্মসংখ্যা আশ্বিন-পৌষ ১৩৬৭

হাইনের 'Hat die Natur sich auch verschlechtert' অবলম্বনে (অনাচারে ভোবে নিসর্গ-সুন্দরী)

১৩৫২ : বিপ্রলাপ (হয়তো ঈশ্বর নেই ; স্বৈরসৃষ্টি আজন্ম অনাথ)

১৩৫৩ : ১৯৪৫ (তুমি বলেছিলে, জয় হবে, জয় হবে)

প্রবন্ধ :

১৩৫৩ : উপলব্ধি ও উক্তি

১৩৬৪ : উদয়াস্ত

অসমাপ্ত উপন্যাস :

১৩৬৩ : উপন্যাসের উপক্রমণিকা

কবিতাভবন, ২০২ রাসবিহারী এভিনিউ, কলকাতা ২৯ থেকে প্রকাশিত ও নাভানা প্রিন্টিং ওআর্কস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪৭ গণেশচন্দ্র এভিনিউ, কলকাতা ১৩ থেকে মুদ্রিত।

সম্পাদক, প্রকাশক ও মুদ্রক : বুদ্ধদেব বসু

একটি ছোট ছেলের কথা

উত্তর কলিকাতায় একটি সংকীর্ণ গলিতে তারা থাকত। ধুলো, ধোঁয়া আর আবর্জনার দুর্গন্ধে বেচারী অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিলো। সোনালী রোদ, নীল আকাশ আর খোলামেলা জায়গার জন্য তার মন আকুল হয়ে উঠতো।

সে জানতো না যে তার বাবা মার মনের অবস্থাও ঠিক তারই মতন। একদিন সে শুনলো তারা কল্যাণীতে বসবাস করতে যাচ্ছে।

এখন তারা কল্যাণীতে। তার জীবনে যেন এক নতুন অধ্যায় আরম্ভ হয়েছে এখন। কল্যাণীর জীবন তার কাছে অপূর্ব মনে হচ্ছে। এই জীবন সে উপভোগ করছে—আর মহানন্দে আছে

কল্যাণীতে

১৮৮এ,
রাসবিহারী এ্যাভিনিউ
কলিকাতা ২৯—একটি সেল্‌স্ প্রমোশন অফিস খোলা হয়েছে। কল্যাণী সংক্রান্ত সমস্ত বিষয় সম্পর্কে উক্ত অফিসে সন্ধান পাবেন

পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক প্রচারিত

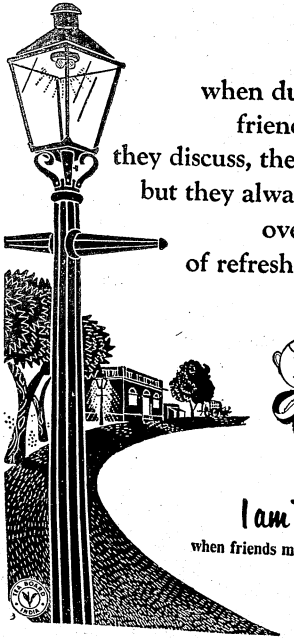

R. N. 5167/57

কবিতা

বর্ষ ২৫ সংখ্যা ৩

বুদ্ধদেব বসুর পত্র-প্রবন্ধ

মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, সত্যজিৎ দত্ত ও
সুবীর রায়চৌধুরীর প্রবন্ধ ও আলোচনা

—

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, শক্তি চট্টোপাধ্যায়,
তারাপদ রায়, গোপাল ভৌমিক,
নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, সুনীল
গঙ্গোপাধ্যায় ও অন্যান্যের
কবিতা

কবিতা

চৈত্র ১৩৬৭ বর্ষ ২৫ সংখ্যা ৩ ক্রমিক সংখ্যা ১০৪

বুদ্ধদেব বসুর পত্র-প্রবন্ধ

নিগ্ননি ইংরেজি : মার্কিনি সাহিত্য : মায়াকভস্কি

—

অতুলচন্দ্র গুপ্ত

মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

দুই মেরু : সত্রাজিৎ দত্ত ● সুধীন্দ্রনাথের গদ্য : সুবীর রায়চৌধুরী

—

কবিতাগুচ্ছ

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, মণিভূষণ ভট্টাচার্য,
তারাপদ রায়, মোহিত চট্টোপাধ্যায়, মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়,
শ্রেয়কণা রায়, গোপাল ভৌমিক, দীপান্বিতা ভট্টাচার্য,
নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী ও সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

Invitation to Poetry

KAVITA 100

international English-language number

A collection of contemporary poems, in English translation, from many Indian and Western languages. Ten languages and seven nations represented.

Poems and translations by

Rabindranath Tagore, Jibananda Das, Sudhindranath Datta, Amiya Chakravarty, Premendra Mitra, Humayun Kabir, Buddhadeva Bose, Bishnu Dey, Samar Sen, Gopal Bhaumik, Naresh Guha, Umashankar Joshi, G. Sankara Kurup, Maithili Sharan Gupta, Mahadevi Varma, Sochi Raut Roy, Hans Egon Holthusen, Ingeborg Bachmann, Werner Rehfeld, D. J. Enright, Galway Kinnell, Dorothy Norman, Pierre Reverdy, Paul Gilson, Francesco Arcangeli, Rajeshwari Datta, Jyotirmoy Datta, Nikolaus Klein, Lila Ray, Sujit Mukherjee, and many others.

A Note on *Modern Bengali Poetry*
Jyotirmoy Datta

Available :
KAVITABHAVAN
202 RASHBEHARI AVENUE
CALCUTTA 29

Rs 2/-, 3 sh, 6d. or 75 cts.

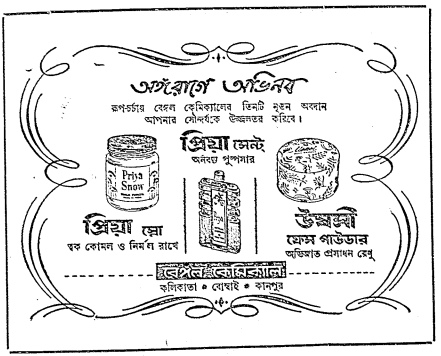

প্র কা শি ত হ' লো
প্রতিভা বসুর নতুন উপন্যাস
অতল জলের আহ্বান
দাম—৩·৫০

বুদ্ধদেব বসু	হুমায়ুন কবির	সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত
যে-আঁধার আলোর অধিক ২·৫০	স্বপ্নসাধ ২·০০	কাব্যসঞ্চয়ন ৫·৫০
	সাথী ১·৫০	হসন্তিকা ১·৫০
আধুনিক বাংলা কবিতা ৬·০০	বিষ্ণু দে আলেখ্য ২·৫০	সুশীল রায় পাঞ্চালী ২·০০
মেঘদূত ৬·০০	হরপ্রসাদ মিত্র তিমিরাভিসার ১·৫০	মণীন্দ্র রায়
অচ্যুত চট্টোপাধ্যায় নিঃসঙ্গ মেঘ ২·০০	নবনীতা দেব প্রথম প্রত্যয় ১·৫০	অমিল থেকে মিলে ১·৫০

এম. সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড
১৪ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

এ প্রাণ রাতের রেলগাড়ি
দিল পাড়ি —
কামরায় গাড়ি-ভরা ঘুম,
রজনী নিঝুম।

চালায় যে নাম নাহি কয়।
কেউ বলে যন্ত্র সে, আর-কিছু নয়।
মানেহীন বলে তারে, তবু অন্ধের হাতে
প্রাণমন সঁপি দিয়া বিছানা সে পাতে।
বলে সে অনিশ্চিত, তবু জানে অতি
নিশ্চিত তার গতি।
নামহীন যে অচেনা বারবার পার হয়ে যায়,
অগোচরে যারা সবে রয়েছে সেথায়
তারি যেন বহে নিশ্বাস —
সন্দেহ-আড়ালেতে মুখ-ঢাকা জাগে বিশ্বাস।
গাড়ি চলে
নিমেষে বিরাম নাই আকাশের তলে।

— রবীন্দ্রনাথ

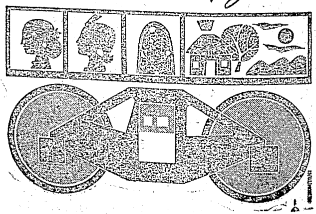

পূর্ব রেলওয়ে

রবীন্দ্র শতবর্ষপূর্তি গ্রন্থমালা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ছিন্নপত্রাবলী

'ছিন্নপত্র' গ্রন্থের পূর্ণতর সংস্করণ। ১০৭টি নূতন চিঠিও আছে। বোর্ড বাঁধাই ১০৲, মোটা কাগজে ছাপা ও কাপড়ে বাঁধাই ১২॥০

য়ুরোপ-যাত্রীর ডায়ারি

পূর্ব-প্রকাশিত দুইটি খণ্ড বর্তমান সংস্করণে একত্রে গ্রথিত। 'ডায়ারি'র প্রাথমিক খসড়াটি আদ্যন্ত সংকলিত; পূর্বে কখনো গ্রন্থভুক্ত হয় নাই। কাগজের মলাট ৫৲; বোর্ড বাঁধাই ৬॥০

য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র

স্বচ্ছন্দ চলিত বাংলায় লেখা কবির প্রথম ইংলণ্ডগমন ও প্রবাস-যাপনের মনোহর বিবরণ। কাগজের মলাট ৪॥০; বোর্ড বাঁধাই ৬৲

শেষ সপ্তক

শেষ সপ্তকে মুদ্রিত দশটি গদ্যকবিতার ছন্দোবদ্ধ রূপ বা রূপান্তর এই সংস্করণে সংযোজিত। সচিত্র কাগজের মলাট ৪॥০; বোর্ড বাঁধাই ৫॥০

বীথিকা

শতবার্ষিক সংস্করণে সমকালীন দশটি নূতন কবিতা সংযোজিত। বিশেষ শোভন সংস্করণে বিভিন্ন কবিতার ভাব ও বিষয়বস্তুর দ্যোতক কয়েকখানি রঙিন ও একরঙা ছবি গ্রথিত। বাঁধাই ৬॥০

কালান্তর

নূতন সংস্করণে সাতটি প্রবন্ধ প্রথম গ্রন্থযুক্ত। কাগজের মলাট ৫॥০

বিশ্বভারতী

কবিতা

বর্ষ ২১
বর্ষ ২২
বর্ষ ২৩
ও বর্ষ ২৪-এর
সম্পূর্ণ সেট
পাওয়া যাচ্ছে।
বহু মূল্যবান কবিতা
অনুবাদ-কবিতা
ও
প্রবন্ধের সঞ্চয়ন।
প্রতি সংখ্যা ১।০*
প্রতি সেট পাঁচ টাকা
মাশুল স্বতন্ত্র

* 'কবিতা'র শততম সংখ্যা ও সুধীন্দ্রনাথ দত্ত স্মৃতিসংখ্যা—প্রত্যেকটির মূল্য ছ-টাকা

কবিতা

ত্রৈমাসিক পত্র

আশ্বিন, পৌষ, চৈত্র ও আষাঢ়ে প্রকাশিত। * আশ্বিনে বর্ষারম্ভ, বৎসরের প্রথম সংখ্যা থেকে গ্রাহক হ'তে হয়। প্রতিসাধারণসংখ্যা এক টাকা, বার্ষিক চার টাকা, রেজিস্টার্ড ডাকে ছয় টাকা, ভি. পি. স্বতন্ত্র। * ষাণ্মাসিক গ্রাহক করা হয় না। * চিঠিপত্রে গ্রাহক-নম্বরের উল্লেখ আবশ্যিক। * ঠিকানা-পরিবর্তনের খবর দয়া ক'রে সঙ্গে-সঙ্গে জানাবেন, নয়তো অপ্রাপ্ত সংখ্যা পুনরায় পাঠাতে আমরা বাধ্য থাকবো না। অল্প সময়ের জন্য হ'লে স্থানীয় ডাকঘরে ব্যবস্থা করাই বাঞ্ছনীয়। * অমনোনীত রচনা ফেরৎ পেতে হ'লে যথাযোগ্য স্ট্যাম্পসমেত ঠিকানা-লেখা খাম পাঠাতে হয়। প্রেরিত রচনার প্রতিলিপি নিজের কাছে সর্বদা রাখবেন, পাণ্ডুলিপি ডাকে কিংবা দৈবাৎ হারিয়ে গেলে আমরা দায়ী থাকবো না। * সমস্ত চিঠিপত্রাদি পাঠাবার ঠিকানা:

কবিতাভবন
২০২ রাসবিহারী এভিনিউ
কলকাতা ২৯

অতুলচন্দ্র গুপ্ত

[১২৯৪—১৩৬৭]

একে-একে সেই কিন্নরদল অন্তর্হিত হলেন, অতুলচন্দ্র গুপ্ত ছিলেন যাঁদের শেষ প্রতিভূ। আভিজাত্যের সর্ব লক্ষণ হারাবার জন্য বদ্ধপরিকর এই যুগ; কিছুকালের ব্যবধানে পর-পর রাজশেখর বসু, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত এবং অতুলচন্দ্র গুপ্তর মৃত্যু কেবলি একের পর এক অপূরণীয় শূন্যতা রচনা ক'রে দিয়ে গেলো।

বাংলা গদ্যসাহিত্যের ক্ষেত্রে এই তিন মনীষা এমন একটি কৌলীন্যের প্রতিভূস্বরূপ ছিলেন যার শেষ চিহ্ন বলতে এখন আর কেউ রইলেন না। একই সামান্য লক্ষণদ্বারা আক্রান্ত ছিলেন তিনজনে, যে-লক্ষণের কবচকুণ্ডল—বলা যায়—ক্লাসিক মানস। ফলে, অত্যন্ত স্বল্পকালের ভিতর এই-যে তিনটি অসাধারণ ব্যক্তিত্বের তিরোভাব ঘ'টে গেলো তা যেন একটি বিশেষ দিকে আমাদের কাতর অভিনিবেশ দাবি করতে চাচ্ছে: নিতান্তই কাকতালীয় সমাপতন হ'লেও এর ভিতরে যেন দৈবের কোনো বিমুখ মনোভাবকে আবিষ্কার ক'রে নিতে পারা যায়।

শৃঙ্খলা, ভারসাম্য, যুক্তিনিষ্ঠা, নিয়মানুবর্তিতা, মাত্রাজ্ঞান ও সংশয়ধর্ম—এঁদের সম্বন্ধে কিছু ভাবতে গেলেই এইসব কথা সারি-সারি ভিড় ক'রে আসে। পাথরের মিনারের চারপাশ ঘিরে সুনিশ্চিত সিঁড়িগণ যেমন স্থিরভাবে লক্ষ্যের দিকে এগোয়, তেমনিভাবে তাঁদের যুক্তিনির্ভর রচনাবলি অমোঘরূপে মূল বক্তব্যটিকে উদ্ঘাটিত ক'রে দিয়ে যায়। ভুলছি না যে সুধীন্দ্রনাথ দত্ত কবি ছিলেন; এটাই সেই কারণ যার ফলে কোনো তীব্র কবির নগ্ন ও অকুণ্ঠিত আবেগকে ওই কঠিন ও পরিশীলিত গদ্যের অন্তরালে হীরকচ্ছুরিত দীপ্ত আলো ফেলতে দেখি। আর এই জন্যই বোঝা যায় যে আলোকপ্রাপ্তি ও তার পরবর্তী রোমান্টিক পুনরভ্যুত্থানের মধ্যবর্তী সময়ের প্রধান ব্যক্তিত্ব তিনি। কিন্তু রাজশেখর বসু কি অতুলচন্দ্র গুপ্তর মধ্যে সন্ধিক্ষণের সেই অস্থির দোলাচল বিন্দুমাত্র নেই।

নিশ্চয়ই এখানে কেউ-কেউ প্রমথ চৌধুরীর দিকে অঙ্গুলিসংকেত ক'রে দিতে চাইবেন। আঠারো শতকি ইংরেজ এবং ফরাশি বুদ্ধিজীবীদের মতো তাঁরও মূলধন ছিলো যুক্তি, এবং কেবলমাত্র যুক্তি। সেইজন্যই যা-কিছু তাঁর অপছন্দ ছিলো, অবান্তর ও অপ্রাসঙ্গিক -ভাবে হ'লেও তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গের দ্বারা মুহূর্তে তাদের তিনি বিদ্ধ ও বিধ্বস্ত ক'রে দিতে চাচ্ছিলেন। বোধহয় এই দিক থেকে তিনি পোপ-ড্রাইডেনেরই অনুসারী, যাঁদের হাতে এমনকি কবিতার ছন্দমিলও প্রবন্ধ ও আলোচনায় পরিণত হ'তো। শ্লেষ কৌতুক ও ব্যঙ্গের এই শানিত অস্ত্রগুলি রাজশেখর বসুও পরশুরামের ছদ্মবেশে গ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু কেবলমাত্র আঘাত করার জন্যই বীরবলের মতো প্রয়োজনে-অপ্রয়োজনে তাঁর তূণীরের শরণ নেন নি। ভাষণসংযমের উজ্জ্বল উদাহরণ তিনি, প্রবন্ধ ও আলোচনাতেও অতিশয় সংক্ষিপ্ত এবং যথাযথ—প্রমথ চৌধুরীর ধাতে যে-বাকসংযমের অভাব ছিলো। অতুলচন্দ্র—যদিও প্রমথ চৌধুরীর আমন্ত্রণ ও উৎসাহ তাঁকে সাহিত্য বিষয়ে উদ্বুদ্ধ করেছিলো—সন্দর্ভ ও নিবন্ধের ক্ষেত্রে, রাজশেখর বসুর মতোই, প্রসঙ্গচ্যুতির অনুরাগী ছিলেন না। পরশুরাম সত্ত্বেও মনের দিক থেকে তিনি বোধ করি বসু-মহাশয়েরই সহযোগী। এই কথাটি আরো বিশদ করার যোগ্য।

রাজশেখর বসু ও অতুলচন্দ্র গুপ্ত—উভয়েরই মনীষা যুগপৎ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য বিষয়ে আকৃষ্ট হয়েছিলো; সমান অভিরুচি ছিলো সংস্কৃত সাহিত্য ও য়োরোপীয় জ্ঞানকাণ্ডে; এবং কেবলমাত্র তা-ই নয়, এই দুইয়ের ভিতর বিনিময়, যোগাযোগ ও সংমিশ্রণ ঘটিয়ে সৃষ্ট একটি সামঞ্জস্যবিধানের চেষ্টা করেছিলেন তাঁরা। যুক্তির পরাকাষ্ঠা যার জন্ম দেয়, সেই নিস্পৃহ নিরাসক্তি উভয়েরই রচনার বৈশিষ্ট্য। মোহমুক্তভাবে সব কিছুর দিকে তাকাবার ক্ষমতা ছিলো, প্রাঞ্জলতা অধিষ্ট ছিলো ব'লে অবান্তর আতিশয্য ও বাগাড়ম্বর কোনো দিনই তাঁদের অভিনিবেশকে লক্ষ্যচ্যুত ও পথভ্রষ্ট করতে পারে নি। বৈজ্ঞানিকের মতো সব কিছুকে বিশ্লেষণ ক'রে দেখতে চেয়েছিলেন দু'জনে—আর এই মানসতার পিছনে নিশ্চয়ই উভয়ের কর্মজীবন সক্রিয়ভাবে প্রভাব বিস্তার করেছিলো। রাজশেখর বসুকে যেমনভাবে আধুনিক বাংলাভাষার ব্যবহারযোগ্য একটি অভিধান রচনায় ব্যাপৃত হ'তে হয়েছিলো, প্রাচ্য ও

পাশ্চাত্ত্য নন্দনতত্ত্বের সংশ্লেষসাধন ক'রে নতুনতর এক কাব্যজিজ্ঞাসা রচনায় অতুলচন্দ্রও তেমনি তাঁর উত্তমকে নিয়োজিত করেছিলেন।

আর, মৃত্যুর পূর্বদিন পর্যন্ত উভয়েই বাংলা দেশের সাহিত্য ও সংস্কৃতির অভিভাবক স্বরূপ ছিলেন: কোনো রকম সমস্যা ও জটিলতার সৃষ্টি হ'লে নিঃসংকোচে তাঁদের নিকট উপস্থিত হওয়া যেতো—তা সে বঙ্গবিহার সংযুক্তিপ্রস্তাবের বিরোধী আন্দোলনই হোক বা ভাষা কমিশনের 'কুখ্যাত' বিবৃতির প্রতিবাদই হোক। যখন জীবনের সর্বক্ষেত্রে কেবল মাঝারিদেরই আধিপত্য, সেই সময়ে তাঁদের রচনাবলির মধ্য থেকে এমন এক নক্ষত্রকিরণ বিচ্ছুরিত হয় যা মনের অতিবিরল সম্ভ্রান্তি ও কৌলীন্যের ঘোষণা ক'রে দেয়। সেই সম্ভ্রান্তিকে যদি এক কথায় বোঝাতে হয়, তবে বলা যায় মনুষ্যত্বেরই একটি অনাবিল আভা। এই দিক থেকে এঁরা তাঁদেরই সমগোত্রীয়, যাঁদের পুরোধা ছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, এবং কিছুকাল আগেও রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী প্রমুখের মধ্যে যার বিকাশ দেখেছি।

২

পূর্ববঙ্গের অন্তর্ভূত রংপুরে জন্ম হয়েছিলো অতুলচন্দ্রের। দর্শনশাস্ত্রের শেষ পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার ক'রে আইন পড়েছিলেন তিনি, প্রথমে রংপুরেই আইন ব্যবসায়ে লিপ্ত হয়েছিলেন, পরে কলকাতায় এসে ব্যবহারজীবী হিশেবে প্রচুর প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। স্যর আশুতোষের অনুরোধে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন-বিভাগে অধ্যাপনা করেছিলেন কিছুকাল। প্রমথ চৌধুরীর 'সবুজপত্র' যে-লেখকফুলের সৃষ্টি করেছিলো, অতুলচন্দ্র ছিলেন তাঁদের পুরোধা। তাঁর সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের একটি উক্তি প্রসঙ্গত বিশেষ প্রণিধানযোগ্য: 'তিনি নিজের চিত্তের জোরে নিজের মতো ক'রেই ভাবেন এবং স্বচ্ছন্দে সেটা স্বচ্ছ ক'রে প্রকাশ করতে পারেন।.....চিন্তাশক্তির অন্তর্নিহিত সহজ নতুনত্ব নিয়েই তিনি নিশ্চিন্ত।' সাধারণত যাঁদের 'লেখকদের লেখক' বলা হ'য়ে থাকে, অতুলচন্দ্র ছিলেন তাঁদেরই অন্যতম। পরবর্তী কালে হয়তো এমন হবে, যখন অনেকে অতুলচন্দ্রের খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে সংশয় প্রকাশ করবেন; কিন্তু তখনো তাঁর রচনাবলি আমাদের আগ্রহ ও রুচিকে

শিক্ষিত ক'রে তোলার ব্যাপারে সাহায্য করবে। লিখেছিলেন নন্দনতত্ত্ব, শিক্ষা ও সভ্যতা, সামাজিক ক্রিয়াকলাপ ও রাজনীতি সম্বন্ধে, কিন্তু এদেরই ভিতর তাঁর ক্ষুদ্র একটি পত্রগুচ্ছের সংকলন 'নাদীপথে' তার স্নিগ্ধ সুষমার দ্বারা এক সৃষ্টিশীল অভিলাষের দিকে সংকেত করে। অন্তত এটাই দ্বিজেন্দ্রনাথের একটি বহু-কথিত উক্তিকে তাঁর সম্বন্ধে প্রয়োগ করতে উদ্বুদ্ধ করে : তাঁর রচনাবলি যা প্রমাণ করে, অতুলচন্দ্র তার চেয়েও বড়ো সাহিত্যিক ছিলেন।

তাঁর বহুমুখী প্রতিভার ভিতর এমন একটি উদ্দীপিত ঔদার্য ও সুদৃঢ় পৌরুষ ছিলো যা বাংলা সাহিত্যে অতিবিরল। তাঁর পক্ষপাতহীন বিশ্লেষণ-ক্ষমতা তাঁর ক্ষুদ্রকায় গ্রন্থপঞ্জীকে অসাধারণ তাৎপর্য দিয়েছে। নিরহংকার, নিরাসক্ত ও পৌরুষমণ্ডিত এই অস্থিতা কখনো সাময়িক করতালি কি অনুগ্রহের প্রত্যাশায় পথভ্রষ্ট হননি। এই অসামান্য আভিজাত্যের তিরোধান আলোকপ্রাপ্ত ও ঐতিহ্যমণ্ডিত একটি বিপুল যুগের অবসান ঘটিয়ে দিলো—অবশেষে শেষ কিন্নরটিও এই বামনশাসিত যুগের হাতে সাহিত্য ও সংস্কৃতির সব ভার তুলে দিয়ে অপসৃত হলেন।

মালবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

দুটি কবিতা

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত

একটি ভুল প্রায়শ্চিত্ত

অনুতাপের সিঁড়িতে শুয়ে আছে
আমার বন্ধু, আরেকটু হ'লেই
প'ড়ে যাবে সদর রাস্তায় ;
গর্হিত পাপ বরং লুকোলেই

ভালো লাগতো আমার হৃদয় মনে :
কিন্তু ভাখো, ঈশ্বরের পা
ধরবে ব'লে কদর্য হাত মেলে
নিতে চাচ্ছে ঋষির শিরোপা।

আমি যে আর সইতে পারছি না—
জটাজটসমন্বিত স্ফোভে
এতদিনের সঞ্চিত দখিনা
ও কি শেষে গঙ্গাজলে ধোবে'!

ও কি শেষে বুকের হাড় খুলে
আপন হাতে জ্বালবে নিজের চিতা ;
অসামাজিক একটি রক্ষিতা
কেন ওকে নেয় না চরণমূলে ?

ঘৃণা

তবু খুব হাওয়া না-বুঝে তর্ক করে,
বোঝে না আমার উপায় ছিলো না কোনো,
বোঝে না আমি যে নমিতার শেষ ঘরে
গিয়েও পারিনি দায়িত্ব নিতে, ঝড়ে

বল্লরীবাহু এবং আচ্ছাদনও
মেলেছিলো, তবু নিরাপদ অন্তরে
চুম্বন করেছিলাম রক্তব্রণ।

কেননা, নমিতা প্রথম কক্ষে শুধু
উপাসনা নিতে রাজি হয়েছিলো, পূজা
তাকে করেছিলো দিগ্বধূ অতিস্থদূর ;
অবশেষে কেন তিমিরে সে দশভূজা
হ'তে গেলো ? কেন ভুজমৃণালের উজান
কাঁপা সরসিজে ব্যাপ্ত, ওষ্ঠাধরে ?
জ্ঞানশূন্যতা করলো নিজ অনুজা
প্রথম ঘরের নমিতাকে শেষ ঘরে ॥

অধঃপতন : চারটি সনেট

শক্তি চট্টোপাধ্যায়

১

আমার বেদনাময় বাংলাভাষা যদি বিদ্ধ করে
নির্মলতা-হারা প্রাণ, তবে পূর্বে প্রণতিস্বীকার।
ভালো নির্মলতা, ভালো শান্তি ; জানি সুখের কদরে
আয়ু দীর্ঘতর হ'তো স্নিগ্ধ বারি দীর্ঘিকার !

আমার বেদনাময় বাংলাভাষা যদি বিদ্ধ করে
অজেয়, অমর শ্বেত-পাতার প্রচ্ছন্ন জাগরণ ;
তা কি নয় স্বর্গচ্যুত মন্দার সহসা বুকে ধ'রে
স্পর্শে প্রেতায়িত হওয়া ? তা কি নয় নিশ্চিন্তে মরণ ?

তবুও স্বর্গের মতো কিছু নেই, যা থেকে পতন
হ'তো অধঃভূমে কিংবা পাতালের প্রচণ্ড গহ্বরে।
মর্তের দণ্ডিত মর্তে প'ড়ে থাকে অভ্যর্থনাহীন—
আমার বেদনাময় বাংলাভাষা কারে বিদ্ধ করে ?

তোমাদের দরজা-জানলা ফুটো-ফাটা বন্ধ ক'রে দাও,
ফুলের বাগানে ভূত মারাত্মক প্রস্রাব ছিটোয়।

২

এ কি আলিঙ্গন ? এ যে ওতপ্রোত গ্রাসের গঠন—
পদতল, মধ্য, মাথা, তাল ক'রে ওষ্ঠ পেতে দেওয়া—
খেতে ও খাওয়াতে। এ কি তামসিক কলঙ্কমোক্ষণ
নিষ্প্রভ প্রাণের ; এ কি বন্ধমূল স্ববিরোধী খেয়া ?

এবার চুরমার ক'রে দেবে দাও কান্তি-সভ্যতার
প্রয়োগনৈপুণ্য, ধর্ম, ধর্ম-অনুসারে শিল্পরীতি,
বাক্ ও মুমুক্ষা, পরিপুষ্ট কোষে মূর্খ জ্ঞানভার—
সমস্ত চুরমার ক'রে দিতে, বক্ষে থাক্ করো প্রীতি।

এ কি আলিঙ্গন ? এ কি সভ্যতার জড়ানো চণ্ডালে
আশিরগোড়ালি-নখ। এ কি আলিঙ্গন মানুষের
ঘোরতর ? ব্যবধান গ্রাসচ্ছলনার অন্তরালে
অনৈসর্গিক কাম, এ কি জীবনের চেয়ে ঢের
কাঙ্ক্ষিত শিল্পের কাছে ? শিল্প কি বিমূঢ়
অনাসৃষ্টি আলিঙ্গন সাংঘাতিক পুরুষে-পুরুষে ?

৩

তোমারে আবহমান কাল থেকে চেয়েছি জানাতে—
আমি ভালোবাসি ; আমি সবচেয়ে তোমারই অধীন।
রটেছে, শুনেছো কানে, প্রবঞ্চনা চাতুরী ও হীন
নিশ্চিত শঠতা কত ! আদালতে বোবা ও কানাতে
সাক্ষ্য দেয় ; কাজী শুধু এ-পাপের শাস্তি মরে খুঁজে।
পাপীর প্রতিভা চায় মুক্তি। আমি মুক্তি মানে বুঝি,
তোমার বুকের 'পরে ব'সে থাকা ; গায়ে থাবা গুঁজি—
তোমারে জাগাতে যেন কুমোরের মতন গম্বুজে।

জগতে সমস্ত সৃষ্টি ওতপ্রোত মিথ্যা ও ব্যর্থতা
তুমি ছাড়া দয়াময়ী ! যুক্ত করো কণ্ঠ ও গরাদে
ফাঁস-মফ্‌চেনে। আমি, স্বরাজের মর্মের বক্রতা
মানে বুঝি, পরিত্যাগ। তোমারে শাসাতে আমি বাঁদে
এগিয়ে আসে না কেউ ; এমনকি ভিক্ষুক সভয়ে
পার হয় খোলা দরজা, যাজ্ঞা বিনা বন্ধ করতাল।

৪

ভালোলাগার আদরে তুমি জাগো না নীরবে
আমি দেখি। ভেসে ওঠে পরিপূর্ণ তীব্র কলকাতায়
অধঃপতনের ধ্বনি। তবু বুকে-শান্তিতে-পাতায়
তোমার বৃষ্টির মতো ঝ'রে পড়া ফলবতী হবে।

না, আমি যাবো না ফেলে পড়ন্তবেলার জাগরণে
সন্ধ্যা নামছে। বহুদিন পরে যেন মৃত্যু থেকে দূরে
তোমায় দেখলাম ; হোক মেঘভাঙা আলোক বিধুর
তবু যা-আলোক নয়, স্মৃতি তারে স্পর্শ করে মনে।

বস্তুত পায়ের মাঝে ঢেলে দিলে জাগ্রত দ্যুতিরে,
এ-মুখমণ্ডল হ'তে শুষে নিলে মালিন্য আমার,
তুবড়ে গেলো নৈরাশার অননুমোদিত নিমগ্নতা—
তবু কি পেলাম, যাকে লোকে বলে অপর্ণাতিমিরে
পাওয়া স্বতোজ্জ্বল ? যার স্পর্শ লেগে নরকে নামার
সিঁড়ি হবে সাবলীল, স্বর্গ হবে প্রশস্ত দরোজা ?

দুটি কবিতা

মণিভূষণ ভট্টাচার্য

বিনিদ্র সংলাপ

অন্ধকার আকাশের নিচে
অবিরল রক্তস্রোতে শুয়ে আছি সারাদিন রাত;
অযুত যোজন থেকে ক্ষীণতম সুরে
শুনেছি জলের শব্দ দূরে।

চতুর্দিকে বাজনাবাজা আলোজ্বলা দিন
কয়েকটি পীড়িত মুখ, রৌদ্রের মিছিল
বুকের নিভৃত কক্ষে পেতেছে আসন।

গাথরে ফোটাই পেশী, ধ্বংসস্তূপে গান,
চেয়েছি পাইনি শুধু আরেক সন্ধান।

চলমান দৃশ্যপুঞ্জে সময়ের পদশব্দ শুনি,
উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত মুদ্রাদোষে
বিয়োগান্ত অমর ফাল্গুনী।

আলোর বিশাল কক্ষে যাতায়াত আছে
এমন অতিথি নেই আমাদের কাছে।

নিদ্রাহীন এ-শতক। বিনিদ্র সংলাপ।
প্রাগৈতিহাসিক সুরে রক্তের বিষণ্ণ অন্তঃপুরে
আমরা কয়েকজন সারা দিনরাত
শুনেছি জলের শব্দ দূরে॥

সংগীতের জন্ম

চাঁদ ডুবে গেছে দূরে চতুর্থীর তিথির তিমিরে,
প্রতিবিম্বে চূর্ণ চতুর্দিক ;
স্নায়ুর সর্পিল নদী প্রবল স্রোতের দিকে ফিরে
অন্ধকার স্পর্শ করলো নির্মম নির্ভীক।

যে-গান বাঁধবো ব'লে মধ্যরাত্রে প্রদীপ জ্বালাই
প্রতিটি অক্ষর ধ্বনি ধ্বংসের নিয়মে পরিম্লান,
শেষ দৃশ্যে স্তূপীকৃত ছাই—
দিগন্তে ছড়িয়ে পড়ে ধ্বনিময় ধ্বংসের সে-গান।

আকাশে এখনো রাত্রি, পূর্বাশার আগ্নেয় তোরণ
তন্দ্রাহত। কুশীলব শোণিতাক্ত পঞ্চমাঙ্কে স্থির,
নিরাপত্তা প্রতিশ্রুতি ক্ষমাহীন মূঢ় শতাব্দীর
অন্ধকার বুকে নিয়ে জাগে পাখি, জাগে শালবন।

খুনের কাহিনী, গীতাভাষ্য, উপনিষদের বাণী
অধুনা নিহিত অর্থে শিষ্ট সমার্থক ;—
মৃত্যুর অপর নাম সংগীত, অন্তিমে শুধু জানি
রাত্রির বিকল্প তুমি, অর্ধমৃত কিংবা পলাতক॥

তিনটি অপ্রাকৃত কবিতা

তারাপদ রায়

দুঃসাহস

একদা সাহসী হবে এই সব ভীত মানবক।
সিংহের কেশর ধ'রে লড়াইয়ে প্রমত্ত হবে তারা,
হাঙ্গর বাহন হ'য়ে ক্ষুরধার সমুদ্রের জলে
অনায়াস ভেসে যাবে ছলে-বলে অথবা কৌশলে।
এবং একদিন হয়তো ইহাদেরই প্রবল প্রতাপে
বাঘে ও গোরুতে মিলে এক ঘাটে এসে জল খাবে।

তথাপি অধুনা তারা নিতান্তই ভেতো, ভীরু, ভিতু;
দেয়ালে টিকটিকি কিংবা আলমারির কাচে চলমান
লোহিত আরশোলাগুলো দুঃস্বপ্নের মতো মনে হয়:
ইহারা জানে না নাকি, ইহাদেরই আসিছে সময়॥

জীবিত কুকুর

মুক্ত আকাশের নিচে চিৎ হ'য়ে শুয়ে আছে একটি কুকুর,
হা ক'রে রয়েছে শুয়ে নির্লিপ্ত নয়নে স্থাণে চেয়ে
নীল-শাদা পাখি-মেঘ; আসন্ন শরতে
এ-সব বদলিয়ে যাবে এক আকাশ হিমেভরা মিহি কুয়াশায়।

'এত মিহি জমিনের শাড়ি, এত নীল তাকে কি মানাবে,'
তার কোনো চিন্তা নেই;
দক্ষিণ কি উত্তরের হিমার্দ্র বাতাসে
কোনো ম্লান অনুভূতি নেই
পরম নিশ্চিন্ত এক অবোধ কুকুর॥

তরুণ কবির প্রতি

সে-সিঁড়ি কোথাও নেই, কোনোদিন নন্দনকাননে
পৌঁছোতে পারবে না তুমি; কেউ-কেউ নিশ্চয়ই যাবে,
কিন্তু তাঁরা ক্ষণজন্মা, ঈর্ষা ক'রে কী যে ফল পাবে
কিছুই পাবে না তুমি, তার চেয়ে ভঙ্গ দিয়ো রণে।

ইচ্ছে হ'লে মিশে যেতে পারো সমতল জনতায়,
নানা ভিড়ে; দাঁতের মাজন বেচে গরিব দালাল;
কেউ-কেউ বানর নাচায়, ভাঙা ডুগডুগিতে তাল
তেমন জমে না, তবু চতুর্দিকে লোক জ'মে যায়।

অবশ্য তুমিও হয়তো তাই চেয়েছিলে, কিছু ভিড়,
কিঞ্চিৎ নজরানা আর দুর্লভ স্বর্গের সিঁড়ি যদি
ভাগ্যবলে করায়ত্ত হয়, জন্ম যৌবন অবধি
তাই ভেবে দিন গেলো দিন বড়ো চতুর গভীর॥

উপসর্গ

মোহিত চট্টোপাধ্যায়

কবিত্বে কি প্রয়োজন ছিলো ? শব্দ, সুমন্ত্রিত ধ্বনির উচ্ছ্বাসে
অমরতা চাহিনি তো ; দৃষ্টির সমর্থ বুদ্ধি সবিনয় ক্ষোভে
নিজের সুস্পষ্ট হাতে কররেখা পড়তে পারে, কোন দীপ্তরেখা
রাজচক্রবর্তী হবে এ-কথা বলেনি ভ্রমে ; তবু নিশাকালে
কবিতা জ্বালায়ে রাখি, জন্ম থেকে একাকিত্বে বুঝি ভয় ছিলো।

শিল্পকে বর্জন ক'রে যদি বাঁচতে পারি, যদি জাগরণ
বিস্ফোরণে আবর্তিত, সমুদ্রের তলদেশে সক্ষম জোনাকি
উড়তে থাকে—বিরাট মাছের পুচ্ছে ঘা খেয়ে তবুও তুচ্ছ
প্রাণ অকম্পিত জলে, তাহ'লে শব্দের ভার, ধ্বনির সমিধ
বহনে জটিল যজ্ঞে কিবা লাভ ! পৃথিবীতে বহুকাল শুধু
নিজেকে জাগায়ে রাখা, উপবনে নিদ্রাহীন রণবাদ্যে ঘোর
অস্থির অনন্ত মৃত্যে মগ্ন থাকা একমাত্র। অন্য সব মৃত
যাবতীয় উপসর্গ—শিল্প, শব্দ, ধ্বনির উপমা !

দুটি কবিতা

মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

ঝিনুকের মৃত্যু

জঞ্জাল, মাছের কানকো, ছাইপাঁশ স্তূপ হ'য়ে ছিলো।
কোথাও গোপনে তবু বন্ধমূল আলোকের ফুল
দ্ব্যর্থহীন ডাকে তারে অন্ধকারে আরক্ত, নির্ভুল :
তিক্তের বলয় ফেটে গাছ ফোটে, কুন্তিল নিখিলও
অবিরাম পরিশ্রমে দায়িত্বেরে ছাপে মোহমান—
উপমা, কবির স্নেহ, করুণার মত্ত পরিমল
পবনে ছড়িয়ে যায়, সপ্রতিভ সকল সম্বল
শূন্যতায় ঝ'রে পড়ে—ওঠে গাছ, প্রতিশ্রুত প্রাণ।

অসতর্ক দিগন্তের স্বতঃপ্রভ প্রবল অতলে
কনক ছায়ার মতো নক্ষত্রের অভ্যর্থনায়
উপদ্রুত পতাকার চঞ্চলতা ঘুরে-ঘুরে যায়,
বন্দরের শেষ চিহ্ন ডুবে গেলো সেইখানে জলে।
শূন্যতা বিদীর্ণ ক'রে স্রোতোময় কুহকের খেতে
বর্বর দাঁথের স্বরে শুশুকের স্বাধীন উত্থান—
দুরূহ বিমান হানে জাদুকর হাওয়ার পুরাণ
অবোধ পোতের পালে সংশয়ের প্রমত্ত সংকেতে।

সঙ্গীসাথী যারা ছিলো বিসংবাদী নির্বেদে বধির,
অনিচ্ছুক প'ড়ে থাকে ক্ষমাহীন হা-করা পাতালে :
রক্ত, গন্ধ, নিঃসরণ অনর্গল রূপান্তর জালে
শ্যাওলা, শামুক, হাড়ে, প্রবালের শিখায় সুস্থির।

প্রতিবিম্ব কম্পমান, কুয়াশার রশ্মি ঢাকে স্মৃতি ;
অনিশ্চয় লুপ্ত হ'লে ঢেউ, ঝড়, স্রোতের বিস্তার

হারানো আরেক দিন—রৌদ্র, তৃষা, হতাশার ভার—
ছড়ায় দিগন্ত জুড়ে কৃষ্ণকায় খনির নিভৃতি।
ব্যগ্র নিষ্পলক চোখ খোঁজে শ্বেত অঙ্গারের ধার,
যা দেবে, অন্ধকারে, উদ্ধারের অব্যয় সংগতি।

অস্থির স্মৃতির তীব্র বেগবান নিষ্পলক চাপে
নাবিকের হাত কাঁপে সর্বনেশে শিথিল স্পন্দনে ;
তুফান, বাঘের থাবা, সুযোগসন্ধানী আক্রমণে
দুর্নিবার লাফ দেয়, দ্বন্দ্বের প্রখর অভিশাপে
স্তম্ভের উদ্ধার আসে—অবশেষে—চরম গ্লাবনে।
—শুক্তির স্বপ্নের বৃন্ত প্রভাস্বর লুপ্তির উত্তাপে॥

কুহকের দ্বার

স্ফটিকেরা অন্ধকারে রুপোর পালক হ'লো ধীরে,
ঘর যেন ত্রিয়ামন্তল অর্বাচীন তরী, যার পাল
সমুদ্রের ডাক শোনে স্রোতে, ঝড়ে, আরক্ত তিমিরে,
জেটির অলীক সিঁড়ি ছুঁয়ে থাকে অমল দেয়াল।

চকিতে জানেলা সব খুলে যায় প্রবল হাওয়ায় :
শয্যাশায়ী তার মতো হুবহু আরেকজন একা—
(কে জানে কোথায় ছিলো, এলো কোন অন্ধকার থেকে)
পেরিয়ে দড়ির সিঁড়ি পাটাতনে সুস্থির দাঁড়ায়।

লোহার অঙ্কুশ কাঁপে, এইবার ঘূর্ণির এলেকা ;
তাসের মিনার ধ্বসে, দুরন্ত অরণ্য এঁকেবেঁকে
দূরান্তে মিলিয়ে যায়, পথ ছোটে চঞ্চলের দিকে,—
রুপোলি কুয়াশা, হাওয়া, নীল রাত সম্ভাবনায়
তারায়-তারায় জ্বালে অসহ্যের উদ্দীপক শিখা।

মর্মরগভীর পথে কুহকের শূন্যতার মেঘ
অনিবার্য নক্ষত্রের তিনবিন্দু সোনালি পাহারা :
দিগন্তে সুস্থির গানে উপকূলে স্নেহের আবেগ,
অচেনা বন্দর ছোঁয় স্তব্ধের বর্বর চীৎকারে
সিঁড়ির অমূল রেখা, ধাপে-ধাপে জলস্ত ইশারা—
না-নেমে উপায় নেই—একা, এই সমুদ্রের তীরে।

বেদনা, ধবল শঙ্খ, লাল বালি, জাফরান সুদূর,
দিগন্তের কালো বন—সব পথ শেষ হ'লে পরে
বিশাল তোরণদ্বারে বৃক্ষের উজ্জ্বল লণ্ঠন ;
চন্দন, করুণ ছায়া, সূর্যাস্তের রশ্মির প্লাবন
কেঁপে ওঠে স্রোতে, পথে, নীলিমার ক্লান্ত অবসরে
যেখানে, মায়ার মতো, দ্যুতির পাখায় বাজে সুর।

যখন মাংসের ভোজে বেশামাল গোকার আহ্লাদ
নিরঙ্কুশ জ'মে ওঠে জীর্ণ তার নিঃসাড় শরীরে,
তখনি রূপের উষা অলৌকিক বিভার সংবাদ
পাঠালো অব্যয় স্বরে, চরাচরে, লুপ্তির তিমিরে॥

ত্রিবর্গ-সার

শ্রেয়কণা রায়

সে-এক আশ্চর্য দেশ : কাচ-কাঠ-সীমা দিয়ে ঘেরা,
পুরোনো বই-এর গন্ধে বন্দী হ'য়ে আছে লোভী মেয়ে।
রোজ তার খোঁজ নেই রবীন্দ্র-রচনাবলি বেয়ে
সাধক-চরিতে নিত্য কম্পিত আঙুল দিয়ে ধরা।
ওর কোনো ভয় নেই ; তাই ছাখো নির্জন দুপুর
জ্যোৎস্নাভিসারের মতো অপূর্ব আলোকে নৃত্যপরা।
ঘরটা তো অন্ধকার, জানলাতেও বাঁধা শক্ত তার
আলমারি বেয়ে-বেয়ে নিঃসঙ্গ লুকোচুরি করা।
বাংলা বই নেবে ব'লে কদাচিৎ কেউ চ'লে আসে
ও-মেয়ে যে কোন স্বর্গে লুপ্ত থাকে ওই তো তা জানে
অন্যজন মাঝে-মাঝে বিলম্বিত স্বগতোক্তি শোনে—
'সব ভালোবাসা যার বোঝা হ'লো দেখুক সে মৃত্যু ভালোবেসে।'

সে-এক আশ্চর্য মন : সমুদ্রই একমাত্র স্বাদু—
এই জেনে থেকে-থেকে ক'রে বসে নীলিম-প্রত্যাশা,
উন্মত্ত অধীর হ'য়ে ভাব পাতানোই ভালোবাসা ;
না-না ক'রে ছেড়ে দিলে ছোঁয়া থাকে অবিচ্ছেদ্য জাদু।

সে-এক আশ্চর্য মায়া : যে-মায়ায় সব ভুলে গিয়ে
ফের নিতে ইচ্ছে করে জীবন্মৃত সংসারের ভার।
ভগবানই একমাত্র ভাগ্যবান, তা না-হ'লে আর
মানুষ কি পেতে পারে লৌকিক অলৌকিক দুয়ে !

দুষ্মন্ত-বিলাপ

গোপাল ভৌমিক

শীতে আমি ভীত নই
বরং ফাল্গুনে পাই ভয় :
মদ-রং নেশা যার
মন-রাঙা সোনালি সময়
কোনো দিন ছিলো কিনা
ভেবে দেখা হয়নি জীবনে।
অথচ সে-কিশলয়
সুগোপন শীতের স্বপনে।

শীত তো জানিয়ে আসে,
হাড়ে লাগে বিষম কাঁপুনি ;
ফাল্গুন গোপনচারী
প্রেমিক বা খুনী
যা কিছু সে হ'তে পারে।
তাকে নিয়ে তাই এত জ্বালা,
সব তার প্রায় এক
আগমনী বিদায়ের পালা।

শীত আসে শীত যায়,
মাঝখানে দুরন্ত ফাল্গুন—
অপগত শরগুলি
কুড়িয়ে যদিই ভরে তূণ
আমি তার কতটুকু জানি।
অথচ সে-শরাঘাতে
অতীতের প্রতীতি জাগালে
বুঝি সে রয়েছে সাথে-সাথে।

ভুল

দীপান্বিতা ভট্টাচার্য

যদি দিয়ে যেতে পারো এইখানে আমার নিভৃতে—
যেখানে এখনো আছি দুর্বিষহ অভেদ্য তিমিরে—
তমোঘ্ন ভোরের আলো,
দেখে যেয়ো তবে
তারা অশ্রু হ'য়ে কবে ঝ'রে গেছে আমার বাগানে।
কত না বিষণ্ণ রাতে একাকী তোমার কথা ভেবে
মেলেছি বাসন্তী ইচ্ছা ;
অচেনা মুকুল
হঠাৎ ফোটার নেশা, বৃষ্টি-ভেজা মন
আলোর সোহাগ লেগে ঘুম ভেঙে ওঠে কতক্ষণ।

তুমি তা জানবে না জানি, শুধু
আমার বাগান ঘুরে
একটি ফুলের সাধ তোমার খোঁপায় নেবে ভ'রে,
অথবা কিছুই নয়,
দেখে যাবে
একটি ভোরের ফুল ফুটে আছে আমার বাগানে
কত সাধ কত আশা কত কল্পনায় ফোটা মন
তোমার অমনোযোগে অশোভন।
আমার প্রত্যহ দিয়ে ঘেরা এক সাধের পুতুলে
'কিছু নয়' তোমাদের এতটুকু হিশেবের ভুলে।

দেয়ালটা দারুণ শাদা

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

আলো জ্বাললে যেন এক দারুণ অস্বস্তি
নিমেষে প্রকট হয়। আলো জ্বাললে ঘরের দেয়ালে
যেন খুব হিংসা জ্ব'লে ওঠে।
টেবিল, আলমারি, ছবি—জনে-জনে প্রত্যেকের দিকে
একাগ্র তাকাও ; দেখবে, প্রত্যেকেই সুযোগসন্ধানী।
প্রতিটি নির্জীব বস্তু আপাতনির্জীব।
আসলে প্রত্যেকে ওরা শিকারী জন্তুর
স্থির প্রতীক্ষায় আছে। সুযোগ মিললেই ছিঁড়ে খাবে।

আলো জ্বাললে এই তীব্র ভীষণ অস্বস্তি
নিমেষে চিত্রিত হয়। আলো জ্বাললে ঘরের দেয়ালে
যেন খুব হিংসা জ্ব'লে ওঠে।
দেয়ালটা দারুণ শাদা। এত বেশি শাদা যে, তোমার
মনে হবে, শুভ্রতার চেয়ে
বড়ো কোনো অহংকার নেই।
বড়ো কোনো হিংসা নেই আলোকের থেকে।
টেবিল, আলমারি, ছবি,—আপাতনির্জীব
এইসব বস্তু তাই উদ্ভাসিত দেয়ালের নিচে
পলকে হিংস্রক হয় জন্তুর মতন।

আলো জ্বাললে যেন এক দারুণ অস্বস্তি
নিমেষে প্রকট হয়। আলো জ্বাললে ঘরের দেয়ালে
যেন খুব হিংসা জ্ব'লে ওঠে।

আলোটা জ্বেলো না।

কয়েক হাজার নিশ্বাসের ভিড়ে

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

তিনটে থেকে ব'সে রয়েছি ওই বুকে মুখ লুকিয়ে রাখবো ব'লে
কেমন তোমার আলেয়া-চোখ, ভিড়ের মধ্যে পাংশু মুখের সভায়
কী হাহাকার শুনতে পেলে, ছুটি স্তনের চূড়ার মধ্যে শীতল সমতলে
কয়েক হাজার মুখ লুকোনোর ব্যাকুলতা ; বুকের কাছে হাওয়ার জিহ্বায়
কত কাতর শব্দ উঠলো, স্পষ্ট দেখলে তোমার চতুর্দিকে
কয়েক হাজার ব্যগ্র চোখের, উষ্ণ নিশ্বাসের আগুন জলে।

রৌদ্র জলে আকাশ জুড়ে সাতাশ বছর বন্ধ-করা ঘরে
এ কি ভয়ংকর রৌদ্র, সূর্য যেন দুঃশাসনের রক্ত পান করে
কেমন তোমার আলেয়া-চোখ, আঁচলে মুখ প্রসাধনের ছলে
আমায় একটু চেয়ে দেখলে, লুকিয়ে গেলে নিপুণ ছদ্মবেশে
কোন সমুদ্রে, নির্জনতায়, সন্ধ্যাবেলায় স্রোতের উদ্দেশে।
আমি একলা ব'সে ছিলাম তোমার বুকে মুখ লুকাবো ব'লে।

নিগ্ননি ইংরেজি : মার্কিনি সাহিত্য : মায়াকভস্কি

বুদ্ধদেব বসুর কয়েকটি চিঠি

২৩শে জানুয়ারি ১৯৬১

জ্যোতি,

চলেছি প্রশান্ত মহাসাগর পেরিয়ে হনলুলুর দিকে। রৌদ্রোজ্জ্বল দিন, মাথার উপর বর্তুল আকাশ নিখুঁত নির্মল ছাতার আকারে ছড়িয়ে আছে, নিচে আর একখানা নীল আকাশ নানা রঙের মেঘ নিয়ে প্রসারিত। সমুদ্র, কিন্তু মেঘের সমুদ্র ; ফেনিল, কিন্তু সে-ফেনা মেঘের, জলের সমুদ্র কত নিচে ধারণা করা যায় না। এখন তেইশ তারিখের বেলা প্রায় তিনটে, আমার ঘড়ির সাড়ে-পাঁচটা নাগাদ হনলুলু পৌছবো, তখন সেখানে হবে তেইশ তারিখের মধ্যরাত্রি। এই সব বিস্ময়ের মধ্য দিয়ে চলেছি। কিন্তু বিস্মিত হবার মতো বয়স আর আমার নেই, সেটা প্রতিদিন অনুভব ক'রে প্রতিদিন মনে-মনে কষ্ট পাই।

জাপানে দশদিন চমৎকার কাটলো। দুই শহরে গোটা ছয়েক বক্তৃতা, টোকিওতে রেডিওতেও কিছু বলতে হ'লো। অনেক বন্ধু পেলাম, জীবনে আর হয়তো দেখা হবে না তাঁদের সঙ্গে, কিন্তু কে জানে—! অধ্যাপক ওটার স্ত্রী আমাদের জন্য এয়ার-পোর্ট পর্যন্ত এসেছিলেন—প্লেনের দেরি ছিলো, আমাদের জন্য দু-ঘণ্টা অপেক্ষা ক'রে ছিলেন, তারপর মাত্র মিনিট দশেকের জন্য দেখা হ'লো। শুধু চোখেরই দেখা, কেননা কথা বলার ভাষা নেই, তাঁর ভাঙা ইংরেজি ও সরল চোখের নম্র শুভেচ্ছা নিয়ে যাত্রা করলাম। কিয়োতোর বন্ধুদের সহৃদয়তাও ভোলার নয়। ভারতবর্ষ, বাংলাদেশ বা রবীন্দ্রনাথ বিষয়ে এরা জানে অল্পই, কিন্তু জানবার আগ্রহ আছে, এঁদের বোঝার সুবিধের জন্য আমি অত্যন্ত মোটামুটি মামুলি কথা বলেছি—টোকিওতে আবার আমি এক-একটি বাক্য বলছি, ওটা তার জাপানি অনুবাদ করছেন, এইভাবে বক্তৃতা সারতে হয়েছে। P.E.N.-এর কোনো-এক সভায় ভালেরির বক্তৃতাটা মনে পড়ছিলো, বলছেন—বিভিন্ন ভাষার কবিদের মধ্যে কী ক'রে যোগাযোগ হ'তে পারে—তা অসম্ভব! খুব গোঁড়া মত, পুরোপুরি

মানতে পারি না, কিন্তু এক ফোঁটা সত্যও আছে কথাটায়। তবু জাপানে এসে বার-বার মনে হয়েছে যে আমাদের সাহিত্যের কিছু অনুবাদ হওয়া অতি জরুরি প্রয়োজন এখন—এমনও হ'তে পারে যে আগামী পঞ্চাশ বছরের মধ্যে কোনো ইংরেজ-মার্কিনের উৎসাহ জাগলো না—আমাদের দিক থেকে কিছু চেষ্টা করা কি যায় না? এটা তোমার কাজ, জ্যোতি, তুমি এ-বিষয়ে চিন্তা কোরো। জাপানিরা আমাদের মনে-মনে ঈর্ষা করে আমরা ইংরেজি ভালো জানি ব'লে—কিন্তু সত্যি ক-জন ভারতীয় ইংরেজি লিখতে পারে, আর তা পারবেই বা কেন, ইংরেজির অধঃপতন আমাদের দেশে অনিবার্য। জাপানে বিদ্বান লোকেরা স্বচ্ছন্দে ইংরেজি বলতে পারে না—যারা মার্কিনফেরৎ তারাও না, কেননা এদের কাজকর্ম পড়াশুনো সবই মাতৃভাষায়। কিন্তু কোনো-কোনো জাপানি (সংখ্যায় খুব কম তাঁরা) নিশ্চয়ই উৎকৃষ্ট ইংরেজি লিখতে শিখেছেন—কেননা জাপানি সাহিত্যের অনেক অনুবাদ স্থানীয় লোকেরাই করেছে। কালক্রমে আমাদের দেশে এই রকম অবস্থা এলে ভালো হয় না কি? কলকাতার কোনো-কোনো অধ্যাপক অনর্গল ইংরেজিতে বক্তৃতা করতে পারেন বটে, কিন্তু তাঁদের সেই মৃত নিশ্চল আক্ষরিক ইংরেজির চাইতে জাপানিদের ব্যাকরণহীন মৌখিক ইংরেজি অনেক সপ্রাণ বোধ হয়। আমাদের 'শুদ্ধ' ইংরেজি আমাদের দাসত্বের চিহ্ন—ঐ মৌখিক বাগ্মিতার লোভ ছাড়লে হয়তো আমাদের দেশেও দু-চারজন সত্যিকার ইংরেজি লিখতে পারবেন। অবশ্য বিষয়টা ভালো ক'রে ভেবে দেখিনি, কিন্তু সোজা কথাটা এই যে বাংলা সাহিত্যের কিছু ইংরেজি অনুবাদ হওয়া উচিত—বই বেরোনো উচিত—তুমি চেষ্টা করো।

প্লেন বড্ড কাঁপছে, কাগজও ফুরোলো।

বু. ব.

205 West 15th. Street
Apt. I-V, New York 11, N. Y.
১৩ ফেব্রুয়ারি, ১৯৬১ ; রাত্রি

জ্যোতি,

সেদিন এশিয়া সোসাইটির মিসেস ক্রাউনের সঙ্গে লাঞ্চ খেলাম। ছিপ-ছিপে তরুণী সুশ্রী মহিলা, আমার চোখে প্রায় মিমির মতো লাগলো, রকফেলারের টাকায় তৈরি এক ঝকঝকে বাড়ির উজ্জ্বল ঘরে আপিশ করেন। যে-রেস্তোরাঁয় খাওয়ালেন সেটার নাম The Left Bank ; রাস্তা থেকে কয়েক সিঁড়ি নেমে যেতে হয়, চৌখুপি কাপড়ে ঢাকা ক্ষুদ্র টেবিল, চেয়ারগুলো প্রায় পানীয়নের চেয়ারের মতো নড়বড়ে—বুঝলাম, এই প্যারিসীয় দারিদ্র্যের অভিনয়টাই এখানকার আকর্ষণ। মহিলাটির সঙ্গে কথাবার্তা ব'লে বেশ লাগলো, খুব সরল ভালোমানুষ গোছের অথচ বুদ্ধিমতী ; বিশেষ কয়েকটা মার্কিনি মুদ্রাদোষ থেকে মুক্ত।

মিসেস ক্রাউনকে গল্পের কথা ব'লে ফেলে এখন ভয়ে-ভয়ে আছি। এখানে ঘরকন্নার কাজ এত করতে হয়, আর এত নিমন্ত্রণ থাকে, যে সত্যি নিবিষ্ট হ'য়ে বসারই সময় পাচ্ছি না। তার উপর ঘরে দিনের আলো নেই, তার উপর পড়ানোর হাঙ্গামাও কম নয়। আমার অদৃষ্টে ছাত্রসংখ্যা মন্দ জোটেনি, তারা মূর্খ নয়, এবং কেউ-কেউ বেজায় উৎসাহী, অচিরেই আমার অজ্ঞতা ধ'রে ফেলবে এইরকম আশা করছি ; তখন আর তথ্য-পরিবেশনের অপচেষ্টা ক'রে ক্লান্ত হ'তে হবে না। যা-ই হোক, কথা হচ্ছে আমার সেই 'একটি জীবন' গল্পটার অনুবাদে কি হাত দেবে এবার? জনরব শুনছি আমার অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে তুমি আমার বিষয়ে প্রবন্ধ লিখে 'কবিতা'য় ছাপাবার মৎলব আঁটছো—খবরদার, কখনো না, আমি যতদিন সম্পাদক আছি 'কবিতা'য় আমার বিষয়ে আলাদা কোনো প্রবন্ধ বেরোবে না, বড়ো জোর বুক-রিভিয়ু পর্যন্ত মার্জনীয়। কাজের কাজ হবে যদি ঐ গল্পটা অনুবাদ ক'রে পাঠাও। শক্ত কাজ, কিন্তু তুমি পাত্রটিও তো সোজা নও। লেখা, টাইপ করা, আমার সংশোধন, পুনশ্চ টাইপ—সব মিলিয়ে দু-মাসের ব্যাপার নিশ্চয়ই, হয়তো বেশি। অর্থাৎ, ততদিনে আমি প্রায়

ফিরতি প্লেনের যাত্রী—কিন্তু তবু কিছু দিয়ে যেতে চাই এদের হাতে, আর যা দেখছি এমনি তাড়াহুড়োর মধ্যে ছাড়া কিছুই হ'য়ে ওঠে না আজকাল। আমার লেখার ধরনটা হালকা হচ্ছে, কিন্তু তাই ব'লে আমার অভিপ্রায়ে গুরুত্বের অভাব নেই তা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো?

ডরথি নর্ম্যানের সঙ্গেও দেখা হয়েছে এর মধ্যে। ভারতীয় সিল্কের কাপড় প'রে. তিনি আমাদের চা খাওয়ালেন; চা-টা যদিও ঈষদ্‌গন্ধী গরম জলের মতো অনুভূত হ'লো, তবু অন্যান্য বিষয়ে তিনি ও তাঁর পরিবেশ এত উল্লেখযোগ্য যে তাঁর প্রতি চিত্তের উৎসুকতা অনিবার্য হ'য়ে ওঠে। রাহু খুঁটে-খুঁটে দেখতে লাগলো তাঁর ঘরের আসবাবপত্র, গাছপালা,..... আর আমি তাকিয়ে-তাকিয়ে দেখতে লাগলাম ছবির বই, কবিতার বই, দেয়ালে ঝোলানো ছবি ও ছবির মতোই জীবন্ত ফোটোগ্রাফ, কী অপর্যাপ্ত সংগ্রহ ভদ্রমহিলার। আমার কেবল তোমার কথা মনে হ'তে লাগলো—মনে-মনে কতবার বললাম, 'জ্যোতির এখানে আসা উচিত।' আমার বয়স হ'য়ে গিয়েছে, জীবনের আর নতুন কিছু দেবার নেই আমাকে—রাসবিহারী ছেড়ে ফিফ্‌থ এভিনিউতে এলে সত্যি লাভবান হবার দিন আমার ফুরিয়ে গেছে। অনেক কিছু না-হ'লেও আমার এখন চ'লে যায়, বরং না-হ'লেই ভালো থাকি। কিন্তু তোমার মনের দগদগে খিদে নিয়ে তুমি এ-রকম একটা জায়গায় এসে পড়লে কতই না সঞ্চয় করতে পারো। তাই ব'লে এমন কথাও ভাবি না যে বিদেশে আসার সত্যি কোনো জরুরি প্রয়োজন আছে। পরিগতির শক্তি থাকলে কোনো দেশেই উপাদানের অভাব হয় না, তুমি তোমার নিজেরই উত্তমেই নিশ্চয়ই বিকশিত হবে—তোমায় জীবনে অন্য যা-কিছু ঘটছে বা ঘটবে সেগুলো উপলক্ষমাত্র।

George Oppen নামে এক ভদ্রলোক আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন। দেখতে ভালো নয় মানুষটা, কিন্তু তিন মিনিট কথা ব'লেই বুঝলাম তিনি সত্যি কবিতা পড়েন, বোঝেন, ভালোবাসেন। আর-একটু আলাপের পর ধরা পড়লো তিনি নিজেও ঐ পাপকর্মটি ক'রে থাকেন বা এককালে করতেন। যখন বললেন যে 'কবিতা'র ইংরেজি সংখ্যায় আমার কবিতা তাঁর মনকে গভীরভাবে নাড়া দিয়েছে, এমন সুর লাগলো কথাটায়

যে অবিশ্বাস করতে পারলাম না। 'স্মৃতির প্রতি' ১ ও ২ তিনি আমার ইংরেজি থেকে আধুনিক মার্কিনিতে তর্জমা করেছেন—আমার অনুমতি পেলে ছাপাতে চান। কী বলবো, 'আত্মা' হয়তো আমারই, কিন্তু গলার আওয়াজ একেবারেই হাল আমলের মার্কিনি—বাংলাতেও ঐ ধরনটা আমার ইহজন্মে আসবে না। (পরে তোমাকে লেখা দুটো পাঠিয়ে দেবো।) আমার আপত্তি তাঁকে ক্ষীণভাবে বললাম। আমার সহযোগে আমার কবিতা অনুবাদ করা তাঁর ইচ্ছা, খুবই আগ্রহ করলেন। সবই ভালো, কিন্তু সময় কোথায় বলো? ক-দিন পরেই তো পাখি আবার উড়ে যাবে। কথা হচ্ছে, অনন্ত সময় ব্যতীত কিছু হবার কোনো উপায় নেই—অতএব সব ছেড়ে-ছুড়ে দিয়ে চুপচাপ ব'সে থাকাই ভালো। একটি জানলা, কিছুটা আকাশ, আকাশে মেঘ, তাকিয়ে-তাকিয়ে বেলা কেটে গেলো, ভাবতে মন হু-হু ক'রে ওঠে। 'ছিন্নপত্র' পড়েছো?

তোমার পত্র-প্রবন্ধ পাইনি ভেবো না, কিন্তু তার যথাযোগ্য উত্তর লেখার সময় নেই।

বু. ব.

১৯. ৩. ৬১; রাত্রি

জ্যোতি,

ট্রেনে লম্বা পথ পাড়ি দেবার সুযোগে দু-জন কবির সঙ্গে পরিচয় হ'লো। রঁসার, যোলো শতকের ফরাশি, গ্রীক-যাজক, রাজাদের চাটুকার, কপট ধার্মিক, রঁসার। আর-একজন: মায়াকভস্কি, মূর্তিমান বিদ্রোহ ও বিশ-শতক, প্রকাণ্ড, উচ্ছল, ছেলেমানুষ, করুণ। ফ্রেড তোমাকে যে-বইটা দিয়েছিলো, তারই মধ্য দিয়ে তাঁকে দেখলুম। কবিতা প'ড়ে, জীবনী প'ড়ে, মানুষটাকে মর্মস্পর্শী মনে হয়েছে আমার, থেকে-থেকে মনে পড়ছে, ভুলতে পারছি না। অনেকখানি ভান আছে না কবিতায়? দেখানোপনা? অভিনয়? যেন নিজের ব্যক্তিগত জীবনের ডায়েরি লিখে চলেছে, অথচ এমনি অহমিকা যে ভাবছে তার জীবনসংক্রান্ত তুচ্ছ খুঁটিনাটিও কবিত্বময়, অমর সাহিত্য। নেই

রিলকের প্রচ্ছন্নতা বা পাস্টেরনাক-এর তির্যক ভঙ্গি, সবই চড়া গলার চ্যাঁচামেচি—ফেনিয়ে-ওঠা, উপচে-পড়া, ছেলেমানুষি করুণ। হুইটম্যান অথবা নজরুল ইসলাম অথবা ডি. এইচ. লরেন্সের মতো—কিন্তু হয়তো তিনজনের চেয়েই ভালো কবি, কেননা বোদলেয়ারের রক্ত ঈষৎ জোলো হ'য়ে মায়াকভস্কির ধমনীতেও বইছে। আশ্চর্য, এই অত হট্টগোলের মধ্যেও বোঝা যায় লোকটা খাঁটি কবি, যেমন গ্রীক অনুকরণের কৃত্রিমতার মধ্য দিয়েও রঁসারকে চিনতে ভুল হয় না। তাও তো অনুবাদে পড়ছি আমরা। বলো তো কী জাদু আছে কবিতায়? বুক দুরদুর করে, চোখ ঝাপসা হ'য়ে আসে, আর নিজেকে মনে হয় ব্যর্থ ব্যর্থ ব্যর্থ ব্যর্থ ব্যর্থ। এই মায়াকভস্কির লেখা পড়তে হবে।

আজ সন্ধ্যায় ডরথি নর্ম্যানের পার্টিতে অনেকের সঙ্গে আলাপ হ'লো। প্রথমে উল্লেখ্য অ্যালান গিন্‌স্‌বার্গ। তোমার মুখে যার নাম শুনেছি, কিন্তু যার লেখা আমি কিছুই পড়িনি। সম্ভ্রান্ত ককটেল-পার্টিতে একটা গলা-খোলা লাল শার্ট গায়ে দিয়ে এসেছে (স্পষ্টতই আমার কবিতা পড়েনি); ভারি সুশ্রী দেখতে, আমি দেখামাত্র ভালোবেসে ফেলেছি, ছেলেটিকে দেখে তোমার কথা বড্ড মনে পড়ছিলো। বললে—আমেরিকার পাঁচজন শ্রেষ্ঠ কবি শীঘ্রই ভারতবর্ষ আক্রমণ করতে চলেছে: কেরুয়াক, গিন্‌স্‌বার্গ, আরো কে-কে! 'হুসভা' ভারতীয়দের বিশ্বত সোমরসে দীক্ষাদান এদের মহান ব্রত। আমি বললুম 'সোম' বোধহয় ফরাশি বা ইতালীয় ওয়াইনের মতো নিরীহ ব্রাঁকারস মাত্র ছিলো, কিন্তু হাক্সলি এদের মগজে যে-ভূত ঢুকিয়েছেন তা তাড়ানো আমার মতো ওঝার কর্ম নয়। এরা বিবিধ নেশার চর্চা ক'রে থাকে—গাঁজা, সিদ্ধি, চরস ইত্যাদি, তুরীয় অবস্থায় কবিতা লেখে, সামাজিক রীতিনীতিকে পদদলিত করে—অথচ, এই সমস্ত অতি পুরোনো অতি মলিন অতি ব্যবহৃত মুদ্রাদোষ সত্ত্বেও গিন্‌স্‌বার্গকে আমি অস্বীকার করতে পারলুম না, আমার মনে হ'লো লোকটা সত্যি কিছু খুঁজছে, খুঁজে বেড়াচ্ছে, আর-দশজনের মতো নয় সে, ভিতরে এক কৌটা আগুন জ্বলছে। আমি আবেগের বশে কাল রাত্রে তাকে যেতে ব'লে দিয়েছি, একজন বন্ধু নিয়ে আসবে বলেছে—কী অবস্থায় আসবে, আস্ত দল নিয়েই চড়াও হবে কিনা—এ-সব ভেবে

এখন একটু উদ্বিগ্ন বোধ করছি—কিন্তু ছেলেটির চেহারা স্মরণ ক'রে অনুতপ্ত হ'তে পারছি না।

আরো অনেকের সঙ্গে আজ দেখা হ'লো। ডনাল্ড কীন, জাপানি-অনুবাদক; প্যারিস রিভিয়ুর অন্যতম সম্পাদক সিলভার্স; শ্রীমতী ক্লিমার, অর্থাৎ হাইনরিখ ক্লিমারের বিধবা পত্নী। শেষোক্ত মানুষটির সংস্পর্শে এসে রোমাঞ্চিত হয়েছি;—যদিও জানি উনি ওঁর স্বামী নন, এবং স্বামীর প্রতিভাও ওঁর মধ্যে কিছু বর্তায়নি, তবু আমাদের পৌত্তলিক স্বভাবদোষে যে-কোনো একটি প্রতীক পেলেই আমরা নমস্কার জানাই। উনি বললেন ওঁর স্বামী রবীন্দ্রনাথের 'রাজা'র একটা জর্মান অনুবাদ করেছিলেন, সেটা এখনো ছাপা হয়নি—শুনে খুব কৌতূহল হচ্ছে। এই তিনজনের সঙ্গেই আবার দেখা হবার সম্ভাবনা আছে—প্যারিস রিভিয়ুতে হয়তো কিছু বাংলা লেখার অনুবাদ ছাপানো যেতে পারে—যদি তুমি অনুবাদ ক'রে দাও। বাংলার জন্য ডনাল্ড কীন-এর মতো কোনো অনুবাদক যতদিন তৈরি না হয়, তোমার উপরেই আমরা নির্ভর ক'রে থাকবো। ওখানে ভেড মেহ্‌টাও ছিলো—হাত-ঝাঁকানি হ'লো আমার সঙ্গে—কথাবার্তা ইচ্ছে ক'রেই এড়িয়ে গেলুম। আর-একজন ভারতীয় ছিলো—সে ইংরেজিতে কবিতা লেখে, সম্পাদকরা ফেরৎ পাঠাবার সময় তাকে মনোরম চিঠি লেখেন—সেটাই তার পক্ষে গর্বের বিষয় মনে হ'লো। এই ইংরেজি-লিখিয়ে ভারতীয়দের মতো বেচারা জীব ভূ-ভারতে নেই—পায়ের তলায় দাঁড়াবার মতো মাটি নেই এদের—যার কোনো মাতৃভাষা নেই তার মতো দুর্ভাগা আর কে আছে বলো। কৌতুকের বিষয় এই যে এরা কেউ-কেউ রবীন্দ্রনাথের আদর্শে অনুপ্রাণিত, কেননা রবীন্দ্রনাথ 'ইংরেজিতে কবিতা লিখেছিলেন!'

পরশু রাত্রে চ্যাপেল হিল্‌-এ তোমার বয়সী ছেলেমেয়েদের আড্ডায় আমাকে ধ'রে নিয়ে গিয়েছিলো। তারা অনেকে প্রত্যক্ষ বা প্রচ্ছন্নভাবে 'বীট' সম্প্রদায়-ভুক্ত; ছেলেরা দাড়ি রাখে, গোঁফ কামায়; মেয়েরা রাখে লম্বা চুল, কালো রঙের মোজা পরে, লিপস্টিক লাগায় না। তাদের সঙ্গে কবিতা বিষয়ে কথা ব'লে সুখ পেয়েছিলাম। আমার অনেক বয়স হ'লো, অথচ আমার মুশকিল এই যে প্রবীণ পণ্ডিত অধ্যাপকীয় সংসর্গে আমাকে ঠিক খাপ খায়

না—সাহিত্যিক ছেলে-ছোকরাদের মহলে বরং আসর জমাতে পারি ; একটা জীর্ণ দেহের মধ্যে তপ্ত হৃৎপিণ্ড অত্যন্ত অসংগতভাবে বহন ক'রে বেড়াচ্ছি। তপ্ত ? না—হয়তো তাও ম'রে গেছে, হয়তো শুধু স্মৃতির তাড়নায় ছাইয়ের তলা থেকে মাঝে-মাঝে ফুলকি জ'লে ওঠে—যখন কবিতা পড়ি, কবিদের কথা পড়ি, বা যখন এমন কারো সঙ্গে দেখা হয় কবিতা যার শিরায়-শিরায় বইছে, সমালোচনার কেতাবে আবদ্ধ হ'য়ে নেই।

চ্যাপেল হিল্-এ প্রণবেন্দু বেশ সুনাম রেখে এসেছে, আমার পক্ষে এটা বিশেষ আনন্দের কথা।

মানিক যদি নিউ ইয়র্কে আসে তুমি তার হাতে তোমার উপন্যাস পাঠাতে পারো—অন্তত খানিকটা। এই চিঠি পেয়েই তার সঙ্গে যোগাযোগ কোরো —কবে রওনা হবে, সত্যি আমেরিকা পর্যন্ত আসবে কিনা, ইত্যাদি। এসেনিন আর মায়াকভস্কির আত্মহত্যার কথা ভেবে আজ নতুন ক'রে কম্পিত হচ্ছি —নতুন ক'রে মনে পড়ছে ডস্টয়েভস্কিকে, কিন্তু মরবার আগেও ওঁরা যদি কবিতা লিখতে পেরেছিলেন, তাহ'লে আত্মহত্যার কী প্রয়োজন ছিলো ?

বু. ব.

Hotel Chelsea
222 West 23rd St,
NY 11
৫ মার্চ ১৯৬১ ; রাত্রি

জ্যোতি,

কাল অমিয় চক্রবর্তীর সঙ্গে সারা দুপুর কাটানো গেলো, সন্ধেবেলা তিনি আমাদের 'দি কিং অব দি ডার্ক চেম্বার' দেখাতে নিয়ে গেলেন। বেপাড়ায় একটা ছোট্ট থিয়েটারে অভিনয় হচ্ছে ; দলের লোকেরা অর্ধেক ভারতীয় অর্ধেক মার্কিন ; এই মার্কিন-ভারতীয় আক্র ভেদ ক'রে দু-এক ফোঁটা বিশুদ্ধ রাবীন্দ্রিক রস যে চুঁইয়ে পড়েছিলো, তাইতে মানতে হ'লো যে 'রাজা' নাটকটায় সারপদার্থ কিছু আছে। পাব্লিক পাকড়াবার জন্য এঁরা অনেক

নিচু স্তরের ব্যাপার ঢুকিয়েছেন। 'ভারত' নামক একটা অদ্ভুত ধারণা নটরাজের মূর্তি, কথাকলির মুখোশ ও দক্ষিনী নাচের মুদ্রায় জগাখিচুড়ি পাকিয়ে গেছে। পাত্রপাত্রীরা 'ওঁ মণিপদ্ম' বলছে—যা রবীন্দ্রনাথের নাটকে ঠাট্টা না-ক'রে কেউ বলে না—তার উপর ঐ ফুলেল ইংরেজিও মাঝে-মাঝে কেমন-কেমন শোনায়। এবং রাজার ভূমিকায় শিঙের মতো বিকট শিরস্ত্রাণ-পরা মিশকালো নিগ্রোটিকেও আমার অন্তত বড্ড বেসুরো লাগছিলো (যদিও স্থানীয় বর্ণভেদের প্রতিবাদস্বরূপ এই ব্যবস্থাকে উত্তম বলা যেতে পারে)—তবু, সব সত্ত্বেও, মূল কথাটা ঠিক জায়গায় পৌঁছলো—সেইজন্য রবীন্দ্রনাথকে সাধুবাদ দিলুম। কিন্তু পৌঁছলো কার কাছে ? এখানকার সব কাগজে প্রশংসা ক'রে যা সব আজগুবি কথা লিখেছে তাতে বোঝা যায় কেউ কিছু বোঝেনি, কাল লোকেরা মাঝে-মাঝে যখন 'উপভোগ' ক'রে হাসছিলো সেই হাসি শুনে আমাদের কান্না পায়। আমার ছাত্রদের এক দলকে দেখতে পাঠিয়েছিলুম, একজন বলেছিলো সে নিরাশ হয়েছে, প্রথম অর্ধেক কিছুই বুঝতে পারেনি, তারপর ডস্টয়েভস্কি ধরনের দ্বন্দ্ব আশা করতে গিয়ে ছাখে, সবই অতিশয় সরল। এই কথার দ্বিতীয়াংশে কিছু সত্য আছে—কেউ কিছু বোঝে না তাও নয়। নাটকের প্রয়োজনায় স্থানে-স্থানে বেশ কৃতিত্ব দেখলুম, রানীর ভূমিকায় সূর্যকুমারী (মাদ্রাজের ফিল্ম অভিনেত্রী) খুব ভালো করেছেন, সুরন্দমাও ভালো—যদিও আমার মনে হ'লো তাঁর কথাগুলো বড্ড ছাঁটা হ'য়েছে। অভিনয়ের পক্ষে শক্ত নাটক, কলকাতায় বা শান্তিনিকেতনে কখনো খুব ভালো অভিনয় হয়নি—এঁদের চেষ্টাকে তাই শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বীকার ক'রে নিচ্ছি।

এবার মনে হ'লো রবীন্দ্রনাথের ঠাকুরদাদা ব্যক্তিটি অসহ্য—'ডাকঘর' ভিন্ন অন্য সব নাটক থেকে ছেঁটে দেয়া উচিত। জনতার দৃশ্যগুলো আমার মতে কৃত্রিমতার পরাকাষ্ঠা। নিউ ইয়র্কের থিয়েটারে সেটা নিছক ভাঁড়ামিতে পরিণত হয়েছে, আবার হয়তো গম্ভীর হ'তে গেলে নিতান্ত ক্লান্তিকর হ'য়ে উঠতো। দেখে খুঁত ধরার কাজটা শক্ত নয়। কিন্তু এ-সব ব্যাপারে কী করলে ভালো হ'তো তা কেউ জিগেস করলেই মাথা চুলকোতে হয়।

আমার বই বাংলাদেশের তথাকথিত সমালোচকরা কোনোদিনই লক্ষ করেন না—অন্তত গত কুড়ি বছরের মধ্যে করেননি—এই ব্যাপারটাতে আমি এতদূর পর্যন্ত অভ্যস্ত হ'য়ে গেছি যে হঠাৎ এর ব্যতিক্রম ঘটলেই অবাক হ'তে হবে। আমি তো একে-একে কাগজের নৌকো জলে ভাসিয়ে দিচ্ছি—আমার চোখের উপরেই অনেকগুলো ডুবে মরলো, যদি শেষপর্যন্ত আমার কয়েকটা খেলনা দিগন্তকে ধরতে পারে। তাহ'লে তা দেখবার জন্য আমি উপস্থিত থাকবো না তা বলাই বাহুল্য—কিন্তু সে-রকম একটি আশা মনের তলায় উকি দেয় না তা বললে মিথ্যে বলা হবে। সত্যি বলতে, সেই আশাটাই সর্বস্ব।……

বু. ব.

[এই পত্রগুচ্ছের কয়েকটি 'অমৃত'-নামক সাপ্তাহিকে প্রকাশিত হয়েছে]

দুই মেরু

সত্রাজিৎ দত্ত

অন্তত পরিমাণের দিক থেকে, বাংলা কাব্যরচনার প্রবাহ এখন এতটাই ফুলে ফেঁপে উঠেছে যে তাকে প্লাবন না-হোক জোয়ার বলা চলে। তা সত্ত্বেও এই দুটি কবিতার বই হাতে পেয়ে এক প্রবল ঔৎসুক্য অনুভব করেছিলাম। তরুণ কবিদের গিশগিশে ভিড়ের মধ্যেও এঁদের চিনতে ভুল হয় না। আর এঁরা দু'জন অপর কবিদের থেকে ভিন্নই শুধু নন, অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত ও শক্তি চট্টোপাধ্যায় অধুনাতন বাংলা কাব্যের প্রায় বিপরীতমুখী, এমনকি, হয়তো, পরস্পরবিরোধী দুটি কাব্যাদর্শের প্রতিভূরূপে বাঙালি পাঠকের কাছে পরিচিত।

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত গত এক দশকেরও অধিককাল কাব্যরচনায় ব্রতী এবং এই সুদীর্ঘকাল ধ'রে প্রায় নিরবচ্ছিন্নভাবে তিনি বিভিন্ন পত্রিকায় বহুলভাবে প্রকাশিত ও পঠিত। অর্থাৎ চর্চা ও সাধনায় তাঁর ঐকান্তিক নিষ্ঠার ফলস্বরূপ তিনি বাঙালি পাঠকের কাছে এতটাই স্বীকৃত ও গৃহীত যে, 'তরুণ' বিশেষণটির প্রয়োগে তাঁর কবিপরিচয়কে চিহ্নিতকরণও আজ প্রায় অবান্তর ব'লে বোধ হয়। সেইজন্যেই তাঁর প্রথমতম কাব্যগ্রন্থের অতিবিলম্বিত প্রকাশ যে পাঠকের প্রত্যাশা ও ঔৎসুক্যকে বিশেষভাবে উদ্দীপ্ত করবে, তা খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু অন্তত বর্তমান পাঠকের কাছে এ-প্রত্যাশা (হয়তো অধিকাংশ প্রত্যাশার মতোই) একেবারে আশঙ্কারহিত ছিলো না। অলোকরঞ্জনের কাব্যচর্চায় বিবর্তনের স্পষ্ট লক্ষণ দুর্লভ্য, আমাদের এই আশঙ্কা অমূলক ব'লে প্রমাণিত হ'লে সুখী হতাম, কিন্তু প্রারম্ভে এ-কথা সবিনয়ে স্বীকার ক'রে নেওয়াই ভালো যে, 'যৌবন বাউল' আমাদের প্রত্যাশা-পূরণে সম্পূর্ণ সমর্থ হয়নি ; হয়নি, তার অন্যতম একটি কারণ নিশ্চয়ই এই যে, অলোকরঞ্জনের কাছে আমাদের প্রত্যাশা অপরিসীম, কিন্তু অন্যবিধ কারণগুলিও হয়তো উপেক্ষণীয় নয়।

যৌবন-বাউল : অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত। সুরভি প্রকাশনী, কলকাতা
হে প্রেম হে নৈঃশব্দ্য : শক্তি চট্টোপাধ্যায়। গ্রন্থজগৎ, কলকাতা

অলোকরঞ্জনের কবিতার মনোযোগী পাঠকের কাছে তাঁর প্রত্যেকটি কবিতায় এমন কয়েকটি সামান্য লক্ষণ আবিষ্কৃত হয়, তাঁর কাব্যচিন্তায় যার পৌনঃপুনিক উপস্থিতি পাঠকের বিমূঢ় বিস্ময়বোধ উদ্রিক্ত করে ; করে, কেননা এই পুনরাবৃত্তির কোনো যুক্তিসংগত ব্যাখ্যা তাঁর কাছে ধরা পড়ে না। যে-আনন্দ, বিশ্বাস, প্রত্যাশা, বিস্ময় আর সর্বজনীন স্নেহ বারবার তাঁর কবিতায় উচ্চারিত, বলাই বাহুল্য জীবন সম্পর্কে তা একটি বিশেষ মনোভঙ্গিজাত। যেহেতু কোনো মনোভঙ্গি সম্পর্কে ভালো-মন্দ কোনোরকম চরম মূল্যায়ন সম্ভব নয়, সেহেতু সে-সম্পর্কে, আপত্তির কারণ দেখি না ; কিন্তু এই ব্যক্তিগত বোধ বা উপলব্ধির সুশোভন বিবৃতিতেই, পুনরুচ্চারণের ফলে, কখনো-কখনো যা প্রায় প্রচার-প্রবণ ব'লে বোধ হয়, নিঃসন্দেহে কবির দায়িত্ব সীমাবদ্ধ নয়। কোনো অনুমিত উপলব্ধি নয়, তৎসম্পর্কিত আশা আর বিশ্বাসের বাণী উচ্চারণও নয়, কবিতাকে বস্তু হ'তে হয়, হ'তে হয় এমন একটি গাঢ় ঘন নৈর্ব্যক্তিক প্রক্রিয়া যা কবির ক্ষেত্রে যেমন, পাঠকের ক্ষেত্রেও ঠিক তেমনি অনিবার্যরূপে অর্জিতব্য একটি অনন্য অভিজ্ঞতার ধারক। কাব্যপ্রেরণার উৎসস্থলে বোধ বা উপলব্ধির যে-অনুমানগুলি ক্রিয়াশীল, তা এই প্রক্রিয়ার উদ্দীপক উপকরণ মাত্র ; উপকরণের অধিক মর্যাদা দিতে উৎসুক ব'লেই অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত কাব্যগ্রন্থের প্রস্তাবনাতেই তাঁর অনুমিত উদ্দিষ্টগুলিকে শপথোচ্চারণের ভঙ্গিতে উপস্থাপিত না-ক'রে পারেননি। প্রারম্ভেই তাঁকে ঘোষণা ক'রে নিতে হয়েছে 'ভগবানের গুপ্তচর মৃত্যু এসে বাঁধুক ঘর ছন্দে, আমি কবিতা ছাড়বো না।' কিন্তু কোনো কবির পক্ষে এই ঘোষণার প্রয়োজন কি সত্যিই অনিবার্য ?

বস্তুত, অলোকরঞ্জনের কাব্যচিন্তার প্রধানতম লক্ষণই এই সুবিন্যস্ত আস্থাপ্রসূত উচ্চারণভঙ্গি ; বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কতগুলি আত্ম-কেন্দ্রিক অস্তিবোধ, কতগুলি অনুমিত প্রত্যয়, প্রত্যাশা, আকাঙ্ক্ষা, বিশ্বাস এবং সম্ভাবনার দ্বিধাহীন বিবৃতিতেই তাঁর পরিতৃপ্তি। এই পরিতৃপ্ত প্রত্যয়, বলাই বাহুল্য, পরিপার্শ্ব ও কাল সম্পর্কে সর্বাঙ্গীণ নিস্পৃহতা ভিন্ন সম্ভব নয়। অলোকরঞ্জন নিজেও তাঁর এই নির্লিপ্তি গোপন রাখেননি। অথচ, যদিও কাব্যগ্রন্থের নাম থেকে শুরু ক'রে তাঁর বিভিন্ন কবিতায় নিজের বৈরাগ্যের

স্বীকৃতিতে তিনি অকৃপণ, তৎসত্ত্বেও পাঠকের পক্ষে এ-সত্যটা আবিষ্কার করা একেবারেই দুরূহ নয় যে, তাঁর 'বাউল'-বৈরাগ্য আসলে তৃপ্ত আত্ম-কেন্দ্রিকতারই আপাত-রূপ : তাঁর এই সচেতন আপাত-মগ্নতাকে পরিস্ফুট করতে গিয়ে অকপট আত্মকথনও তাঁর কাছে কখনোই অপ্রাসঙ্গিক বোধ হয় না, এমনকি স্থানে-স্থানে নিজের নামোল্লেখেও তিনি যত্নবান। এই সারল্য ঈর্ষণীয়, কিন্তু নিতান্ত ব্যক্তিগত একটি অনুভূতির সরল অভিব্যক্তিই যদি কখনো কাব্যরচনার একমাত্র উদ্দিষ্ট রূপে প্রতিভাত হয়, সে-ক্ষেত্রে সেই সরল কবিত্ব শেষপর্যন্ত কবিতা হ'য়ে ওঠে কিনা সে-বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ আছে ; দৃষ্টান্তস্বরূপ 'শিশুমহল' কবিতাটির উল্লেখ করা যায়। সত্যি বলতে, তাঁর কোনো-কোনো কবিতায় এই আপাত-সারল্যের অন্তরালে অন্য কিছু আবিষ্কার করতে না-পেরে পাঠক 'আপাত' শব্দটির প্রয়োগ সম্পর্কেই দ্বিধাগ্রস্ত বোধ করেন।

সম্ভবত এই শিশুজনোচিত সারল্যই তাঁর বিস্ময়বোধের জনক। তাঁর কবিতায় 'অবাক' এবং 'আশ্চর্য' এই দুটি শব্দের প্রাচুর্য সত্যিই আমাদের অবাক করে ; প্রসঙ্গত, জনৈক তরুণ কবিবন্ধুর উক্তি স্মরণ করি : 'এত অবাক তিনি হন কী ক'রে ?' কোথায় পান তিনি এই অফুরান আশ্চর্যের দেখা, এই অপ্রত্যাশিতের চমক, এই অবিরল বিস্ময়বোধ ?'

প্রকৃতপক্ষে, এই বিস্ময়বোধ যে-মানসতার অভিব্যক্তি অলোকরঞ্জন দাশগুপ্তর কাব্যচরিত্র তারই কেন্দ্রাভিমুখী। এ-বিস্ময় অপ্রত্যাশিতের সম্মুখীন হওয়ার বিস্ময় নয়। বরং তা তাঁর প্রত্যাশা আর প্রত্যয়ের সঙ্গেই সম্পৃক্ত ; হওয়ার বিস্ময় নয়। বরং তা তাঁর প্রত্যাশা আর প্রত্যয়ের সঙ্গেই সম্পৃক্ত ; হওয়ার বিস্ময় নয়। বরং তা তাঁর প্রত্যাশা আর প্রত্যয়ের সঙ্গেই সম্পৃক্ত ; হওয়ার বিস্ময় নয়। বরং তা তাঁর প্রত্যাশা আর প্রত্যয়ের সঙ্গেই সম্পৃক্ত ; বিস্মিত হবার জন্যেই যেন তিনি নিজেকে প্রস্তুত করেছেন। সম্মুখবর্তী যা-কিছু, তাদের সম্পর্কেই যেহেতু তাঁর অভিপ্রায়, সেহেতু বিস্ময়ের মাধুরী মিশিয়ে সব-কিছুকেই তিনি তাঁর প্রত্যাশার উপযোগী ক'রে গ'ড়ে নেন ; হয়তো সে-কারণেই তাঁর কবিতায় স্মৃতির অনুরণনও প্রায় অনুপস্থিত। তাঁর কাব্য-মানসের এই চরিত্রলক্ষণ একটি বিরল ব্যতিক্রম হিশেবে বিশেষভাবে লক্ষণীয়। তাঁর কবিতায় বর্তমান এবং অধিকতর মাত্রায় ভবিষ্যৎকালেরই সর্বাধীন আধিপত্য, অস্তিবোধই তাঁর তৃপ্তি, শান্তি আর আনন্দের ধারক। সম্ভাবনা আর প্রতিশ্রুতিই তাঁর বিশ্বাসের উপজীব্য। যদিও তাঁর মুখের এই উচ্চারণ—

"'কী জিনিস চাও?' জানালাম: 'গতকল্য' " আমাদের অন্যবিধ প্রত্যাশাকে উদ্দীপ্ত করে, কিন্তু বস্তুত তাঁর কবিতায় অতীতকাল অনুপস্থিত। অথচ যা কিছু অতীত, তা-ই তো স্মৃতি; আর এই স্মৃতি আর তাঁর বহুধাবিস্তৃত অনুষঙ্গ, তাঁর আনন্দ, বেদনা, বিষণ্ণতা, যন্ত্রণা, রোষ, ক্ষোভ, আক্ষেপ—এরাই তো একাধারে কবিতার প্রধানতম উপাদান আর অভিব্যক্তি, হয়তো বা জন্মিত্রীও। কখনো-কখনো তাঁর বিবৃতির মধ্যেও স্মৃতির এই দাবি স্বীকৃত হয় ('সমস্ত পৃথিবী তুমি রেখে গেছ স্মৃতিচিহ্ন ক'রে') কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁর 'স্মৃতির চন্দনা' কোনো অস্পষ্ট-অন্ধকারের ঘ্রাণ পাখায় মেখে আনে না; আলোই যেহেতু তাঁর উদ্দিষ্ট (এই 'আলো' শব্দটির ব্যবহার কি অপর্যাপ্ত তাঁর কবিতায়!), সেহেতু স্মৃতির অন্ধ গহ্বর সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষা করেন তিনি। 'শান্তি', 'বিশ্বাস', 'আনন্দ', 'খুশি'—এই শব্দগুলি শুধুমাত্র শব্দ হিশেবেই প্রিয় নয় তাঁর কাছে, তাঁর কাব্যানুভূতির কেন্দ্রগত ধারণা হিশেবেও অনিবার্য। সেই জন্যেই তাঁর কাছে, শেষপর্যন্ত, 'যন্ত্রণাও যূথী হয়', হয় 'সৌম্য' এক 'ইমনকল্যাণ', কান্না হয় 'কনক', হয় 'আনন্দমন্দিরা', সেই জন্যেই 'পুষ্প যেমন সুদীপ্ত বিশ্বাসে/ কোরকে তার শান্তি রাখে সযত্ন বিন্যাসে' তাতেই তাঁর অভিলাষ। এই সুবিন্যস্ত বিশ্বাসের ভিত্তিভূমি যা-ই হোক না কেন, পাঠকের কাছে তা অনাবিষ্কৃতই থেকে যায়।

অথচ যাকে বলি ইন্দ্রিয়চেতনা, শব্দ-গন্ধ-স্পর্শের সেই বিচিত্র সংবেদন-ক্রিয়াও তো স্মৃতিরই দান। প্রকৃতপক্ষে, তা-ই, স্মৃতিই অভিজ্ঞতা; চেতন অথবা অবচেতন সেই অভিজ্ঞতার গাঢ়, ঘন বস্তুরূপেই কাব্যের উদ্দিষ্ট, শুধুমাত্র বিশ্বাসের বিবৃতি পাঠকের কাব্যঅভিজ্ঞতায় কোনো অভিঘাত সৃজনে অসমর্থ। কিন্তু অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত সূচনা থেকেই নিশ্চিতি এমন এক ধ্রুব শিখরে আরোহণ ক'রে আছেন, যেখান থেকে পশ্চাদ্‌বর্তী স্মৃতির গূঢ় গহ্বর আর ইন্দ্রিয়ানুভূতির বন্ধুর সোপান অবলুপ্ত ব'লে বোধ হয়; এমনকি, যেখান থেকে, দৃষ্টি যতই সুদূরে মেলে দেয়া যাক না কেন, উত্তরণও আর সম্ভব নয়। এ-কারণেই অলোকরঞ্জনের কাব্যগ্রন্থে পুনরুক্তি আর পুনরাবৃত্তির দৃষ্টান্ত যত সুলভ, বিবর্তনের লক্ষণ তত স্পষ্ট নয়।

আসলে, ইন্দ্রিয়চেতনা নয়, ইন্দ্রিয়াতীত (নাকি ইন্দ্রিয়বিমুখ?) কোনো

সম্ভাবনার বোধিই তাঁর কাব্যের ভিতরে বাইরে কাজ করে; সেই জন্যেই 'অভিজ্ঞতার বাইরে যাবো না ভিতরে যাবো না আমি,/চৌকাঠে আমি দাঁড়িয়ে কাঁপবো ভবিষ্যতের দিকে'—এই স্পষ্ট স্বীকারোক্তি বিস্ময়কর হ'লেও নিঃসন্দেহেই স্ববিরোধী নয়। আর সেই জন্যেই, তিনি শব্দব্যবহারে যতটা অনুপ্রাস, ধ্বনিগত লালিত্য, সৌকুমার্য আর কোমলতার পক্ষপাতী, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অনুষঙ্গ সম্পর্কে তাঁর সামান্য পরিমাণও নন। যদিও অন্যান্য ক্ষেত্রের মতো এ-ক্ষেত্রেও তিনি যথারীতি তাঁর অনুসৃতব্য আদর্শ সম্পর্কে ঘোষণায় সোচ্চার ('অনুপ্রাসের অরণ্যে আমি হারাবো আমার পথ')। তৎসত্ত্বেও এ-প্রশ্ন হয়তো অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে, তাঁর কবিতায় শ্রবণসুখকর অনুপ্রাসের বাহুল্য, সুশ্রী সমাসবদ্ধ শব্দের প্রাচুর্য এবং স্খলিত, নরম, কোমল শব্দব্যবহারের অত্যধিক প্রবণতা ভাষাব্যবহারে তাঁর এক ধরনের স্খলতার পরিচয় দিলেও, জ্ঞানমাধুর্য ভিন্ন কথনোই কি তাঁদের অন্য কোনো অনিবার্য যৌক্তিকতা, এমনকি, তাঁর নিজের কাছেও স্পষ্ট? তা যদি না হয়, তাহ'লে পাঠকের বিরাগ নিতান্তই যুক্তি-সংগত। অর্থাৎ, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য কোনো ছবি নয়, শব্দ-গন্ধ-স্পর্শের অনন্য সংবেদনক্রিয়া নয়, শুধুমাত্র সুশ্রী শ্রবণমধুর শব্দের যে-অরণ্যে তিনি আত্মহারা, তা পাঠককে ক্রমশই ক্লান্ত, ক্লান্ত করে। শব্দের প্রতীকধর্মী বাঙ্ময় ব্যবহারে তাঁর নিরাসক্তিও বিশেষভাবে লক্ষণীয়। যেহেতু তাঁর কবিতায় স্মৃতি আর অবচেতনার অনুষঙ্গ সর্বতোভাবে অনুপস্থিত, সেহেতু এই নিরাসক্তি একান্তই অনিবার্য। ফলত অলোকরঞ্জনের ভাষা ও শব্দ ব্যবহারে অকারণ কাব্যিকতার প্রাধান্য এত বেশি যে, তাঁর কাব্যকে অধিকাংশ সময়েই তা আড়াল ক'রে রাখে। অথচ, যাঁকে লাবণ্য বলি, যদি ধ'রেও নেয়া যায় যে, কাব্যশরীরে সেই লক্ষণ সঞ্চারিত করা কবিকর্তব্যের অন্তর্ভুক্ত, তাহ'লেও, 'ছিবার দরিয়া', 'বিভোর বিভা' ইত্যাদির ব্যবহার, এমনকি, কোমলতার প্রয়োজনে অনেক-ক্ষেত্রেই ঈ-কার অথবা আ-কার যোগে শব্দকে নারীত্বদান করাই কি তাঁর প্রকৃষ্ট পথ? 'সমস্ত প্রাণ বকুলবেদী'ই তো যথেষ্ট, তারপরেও কেন আবার 'বকুলছাওয়া!' কাব্যিকতা যে সর্বতোভাবে কবিত্ববিরোধী—অলোকরঞ্জনের কবিতায় এই সর্বজনস্বীকৃত প্রস্তাব পুনর্বার প্রমাণিত হ'লো।

প্রসঙ্গত, এই পুরোনো উক্তির পুনরাবৃত্তি করতে আমার সংকোচ হ'লেও

না-ক'রে পারছি না যে শব্দের অর্থ, ধ্বনি, অনুষঙ্গের যে-প্রচলিত বহিরঙ্গ তাকে স্বীকৃতি দিয়েই তাঁর নির্মোকের অন্তরালবর্তী গূঢ় অন্তঃসারটুকু আবিষ্কার করা ভিন্ন শব্দের নতুন অর্থ অর্জন করা একেবারেই অসম্ভব, আর নতুন অর্থ অর্জন ভিন্ন শব্দকে কবির অনন্য মানসপ্রক্রিয়ার ধারক হিশেবে ব্যবহার করার অন্য পথ কই ?

কাব্যাদর্শ সম্পর্কে অলোকরঞ্জন দাশগুপ্তর আরেকটি সিদ্ধান্তও আমাকে বিমূঢ় করেছে। 'সমস্ত তোমার দেশজ ভাণ্ডার, তুমি দয়া ক'রে বাইরে যেয়ো না' এই বোধ যে বস্তুতই তাঁর কাব্যধারণার কেন্দ্রবিন্দু, তাঁর কবিতায় তার অবিরল সমর্থন মেলে। শুধুমাত্র দেহাতি, সাঁওতালি, গ্রামীণ বাংলাই নয়, লোকশিল্প ও সংস্কৃতি সম্পর্কেও তাঁর মুগ্ধ আকর্ষণ তিনি গোপন রাখেননি। শহর-নগর সম্পর্কে তাঁর বিরাগ শুধু এই জন্যেই নয় যে, যা মূর্তিমতী বাংলাদেশ তা কেবল গ্রামবাংলাতেই সীমাবদ্ধ, তিনি তাদের প্রধানত গ্রামীণ ঐতিহ্যের বিরুদ্ধ শক্তি হিশেবেই গণ্য করেন, এই জন্যেও। সুতরাং 'চাষীর জীবনশৈলী'ই তাঁর 'স্বর্গসাধন', তাঁর 'জীবনশিল্প' রূপে গৃহীত। আর সেই জন্যেই মাতৃপ্রেমের (জননী ও জন্মভূমি, দুই অর্থেই) মর্মান্তিক মোহাবেশে আজও তিনি আচ্ছন্ন।

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত সম্পর্কে আমাদের শ্রদ্ধা অপরিসীম। সর্বত্র তিনি আমাদের প্রত্যাশা পূরণে সমর্থ হননি ব'লে তাই ক্ষুব্ধ বোধ না-ক'রে পারিনি। কিন্তু তৎসত্ত্বেও এ-কথাও অনস্বীকার্য যে তাঁর কাব্যগ্রন্থপাঠে আমাদের এ-প্রত্যয় দৃঢ়তর হ'লো : আধুনিক বাংলা কাব্যধারার তিনিই যোগ্যতর তরুণ উত্তরসাধক। ছন্দ, মিল ও আঙ্গিকের বিবিধ প্রকরণে তাঁর অসামান্য দখল রীতিমত আকর্ষণীয়, আকর্ষণীয় তাঁর প্রতিটি কবিতার আভ্যন্তরীণ সংহতি। তাঁর কবিতার গঠনে যে-নৈপুণ্য লক্ষিত হয়, তরুণ কবিগোষ্ঠির মধ্যে তার দৃষ্টান্ত বিরল ; প্রথম পংক্তি থেকে শুরু ক'রে অনিবার্য ক্রমবিকাশের যে-প্রক্রিয়া অবলম্বন ক'রে শেষ পংক্তির নিশ্চিত পরিণতিতে তাঁর কবিতা সম্পূর্ণ হয়, তা তাঁর কবিত্বশক্তির উজ্জ্বল স্বাক্ষর বহন করে। যেহেতু তাঁর মতো পরিণতমানস, সৎ নিষ্ঠাবান কবি বর্তমান বাংলা সাহিত্যে অতি বিরল, সেহেতু তাঁর ত্রুটি সম্পর্কে ক্ষমাহীন হওয়া বাংলা সাহিত্যের প্রতি আমাদের কর্তব্যকর্মের অন্তর্ভুক্ত ব'লেই গণ্য করি।

পরিশেষে, তাঁর দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থের প্রকাশ ত্বরান্বিত হোক এই প্রার্থনা জানাই।

শক্তি চট্টোপাধ্যায় শক্তিমান কবি। তাঁর বিশিষ্ট ও অনন্য কবিচরিত্র সাম্প্রতিক কালের বাংলা কাব্যে একটি স্বতন্ত্র সুর যোজনা করেছে—সৃষ্টি করেছে, হয়তো, এক অর্থে, একটি নতুনতর কাব্যরীতি। উচ্ছ্বাস এবং বিরাগ, নিন্দা এবং প্রশংসার যে-বিচিত্র প্রতিক্রিয়ায় তিনি বাঙালি পাঠক-সাধারণকে উদ্দীপিত করেছেন, তাতে অন্তত এটুকু নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয় যে, ভিন্নতর কাব্যাদর্শের বাহক হিশেবে তাঁর কবিতা বাঙালি পাঠকের মনোযোগকে বেশ প্রবলভাবেই আকর্ষণ করে।

'হে প্রেম হে নৈঃশব্দ্য' কাব্যগ্রন্থটি আকৃতিতে ক্ষুদ্রায়তন হ'লেও তা থেকেই শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কাব্যাদর্শের স্বরূপ সম্পর্কে একটি পূর্ণাঙ্গ ধারণা করা সম্ভব। তাঁর কবিতা সুস্পষ্টরূপে যে-লক্ষণগুলি দ্বারা আক্রান্ত তা যে অলোকরঞ্জনের অনুসৃত আদর্শের বিরোধী সে-কথা আগেই উল্লিখিত হয়েছে ; কাব্যগ্রন্থ দুটি পাশাপাশি রাখলে এ-বৈপরীত্যের সর্বতোমুখিনতা রীতিমত চিত্তাকর্ষক ব'লে বোধ হয়। শুধুমাত্র তাঁর কাব্যমানসই নয়, তাঁর বাক্‌ভঙ্গি, শব্দ ও ভাষাব্যবহারেও যে-প্রবণতা লক্ষণীয়, তা শক্তি চট্টোপাধ্যায়কে সম্পূর্ণরূপে ভিন্ন এক জগতের কবি হিশেবে চিহ্নিত করে। স্মৃতির সংবেদন আর ইন্দ্রিয়চেতনার অনুষঙ্গে সন্তপ্ত সংরক্ত এই জগৎ এমন এক বোধের পরি-মণ্ডল দ্বারা ভারাক্রান্ত, নিশ্চিতরূপে আধুনিক কাল আর তার মানসতাই যার অনিবার্য উপাদান। তাঁর কবিতায় রোষ, ক্ষোভ, ঘৃণা, আক্ষেপ, যন্ত্রণা, বেদনা যে-তীব্র, তীক্ষ্ণ আবেগে স্পন্দমান স্মৃতির অন্ধ অস্পষ্ট পশ্চাদ্‌পটই তার উৎসভূমি। তাই 'আলো' নয়, 'অন্ধকার'ই তাঁর অভিজ্ঞতার স্বরূপকে সূচিত করে। (শুধুমাত্র এই দুটি শব্দের অনলস ব্যবহারের মধ্যেই হয়তো আলোচ্য কবিদ্বয়ের ভিন্ন মানসতার একটি লক্ষণ সুস্পষ্টভাবে চিহ্নিত করা যায়।) বস্তুত, তন্দ্রা আর স্বপ্নের গূঢ় প্রকরণের মধ্যে দিয়ে স্মৃতিই যেহেতু বার-বার হানা দিয়েছে তাঁর কবিতায়, মথিত করেছে তাঁর ইন্দ্রিয়চেতনাকে, (তাঁর কবিতায় 'স্বপ্ন, স্মৃতি' এই শব্দ দুটির অপর্যাপ্ত ব্যবহারও লক্ষণীয়) সেহেতু শব্দ-

নির্বাচনে তাঁর প্রধানতম প্রেরণাই স্মৃতি আর মগ্নচৈতন্যের সেই সব সুতীক্ষ্ণ অনুষঙ্গ, ইন্দ্রিয়কে যা সোজাসুজি আঘাত করে। 'তবু প্রেত এক নিয়েছে আমার শিস্' এই বোধ দ্বারা তাঁর চেতনা এতটাই সমাচ্ছন্ন যে, 'চৌকাঠে দাঁড়িয়ে' ভবিষ্যতের সম্ভাবনার দিকে দৃষ্টি মেলে দেবার সামান্যতম প্রবণতা তাঁর কবিতায় লভ্য নয়। শব্দ-গন্ধ-স্পর্শের বিচিত্র সংবেদনক্রিয়ায় যে-অতীত বারবার তাঁর ইন্দ্রিয়চেতনাকে অনুরণিত করেছে, তা-ই তাঁর কাব্যঅভিজ্ঞতার ধারক। শব্দব্যবহারে তাঁর প্রখর ইন্দ্রিয়ময়তা সেই জন্যেই তাঁর কবিতার অনিবার্য উপাদান হিশেবে প্রতিভাত।

শব্দের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যতাকে পরিস্ফুট করতে গিয়ে আপাত-অব্যবহার্য যে সব নির্ভেজালভাবে অকাব্যিক, দেশজ, কথ্য, কখনো-কখনো নিঃসন্দেহে অশালীন শব্দকে তিনি নির্দ্বিধায় ব্যবহার করেছেন, তা স্পষ্টতই অধিকাংশ তরুণ কবির মতো, তাঁর জীবনানন্দীয় উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত কাব্যধারণাকেই সূচিত করে। শক্তি চট্টোপাধ্যায় তাঁর কাব্যরচনায় এই উত্তরাধিকারকে সুস্পষ্ট স্বীকৃতি দিয়েছেন। এমনকি, প্রয়োজনবোধে, নিঃসন্দেহে যা জীবনানন্দীয় এমন বাগ্‌ভঙ্গি ও শব্দকেও তিনি সোজাসুজি ব্যবহার করেছেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই সচেতন ব্যবহার তাঁর স্বকীয়তাকেই উজ্জ্বলতর করেছে। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ এই কবিতাংশটি লক্ষণীয়,

> 'পরাগের বিষে কাঁপি হৃদুদ্ বিষম করজালে ;
> হৃদীর্ঘ মোহার গন্ধ নেড়ে দেয় মগজের গড়।
> হেমন্ত, যা কিছু পেলে দীর্ঘ প্রেম, বুকে নিয়ে চলো—
> মড়কে, সাহিত্যে মদ-মন্বন্তরে, অনভিনিবেশে।' (তুমি যেন ধর্ম)

কিন্তু, এতৎসত্ত্বেও, কোনো-কোনো ক্ষেত্রে তাঁর কথ্য, অকাব্যিক শব্দ-ব্যবহারের উল্লিখিত প্রবণতা অতিরিক্তও অত্যধিক ব'লে প্রতিভাত হয় এবং পাঠকের বিভ্রান্তির কারণ হয়। কখনো-কখনো এই প্রবণতা দ্বারা তাঁর মানসতা এতটাই অধিকৃত যে, মনে হয় যেন সাহিত্যে সম্পূর্ণরূপে অপ্রচলিত শব্দের দুঃসাহসী ব্যবহারে পাঠককে চমৎকৃত (কিংবা চমকিত) করার তৃপ্তিই তাঁর উদ্দিষ্ট, এই উপভোগস্পৃহার মধ্যেই যেন তাঁর কতগুলি অকাব্যিক, স্থূল, কথ্য (আসলে হয়তো যা, এমনকি, প্রায় অকথ্যই) শব্দব্যবহারের একমাত্র

যৌক্তিকতা খুঁজে পাওয়া যায়। সে-সব ক্ষেত্রে শব্দব্যবহারের অন্যবিধ অনিবার্যতা সম্পর্কে তাঁর অসচেতনতা পাঠককে পীড়িত করে। অর্থাৎ ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্যতাই যেখানে শব্দব্যবহারের উদ্দেশ্য, সে-ক্ষেত্রে শালীনতা বিষয়ে কোনো-রকম শুচিবায়ুগ্রস্ত অভিযোগ আমাদের কাছেও মূঢ়তা ব'লে বোধ হয়। কিন্তু শব্দের এই অকাব্যিক স্থূলত্বই যদি তাদের প্রতি কবির আকৃষ্টই হবার একমাত্র কারণ ব'লে গণ্য হয়, যদি কবিতাটির মধ্যে ঐ শব্দসমষ্টির অন্যবিধ অনিবার্যতার অভাব প্রকট হ'য়ে ওঠে, তাহ'লে পাঠকের বিরক্তিবোধ স্বাভাবিক ও সংগত। অথচ, শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কোনো-কোনো কবিতাপাঠে পাঠকের এ-রকম ধারণা হয় যে, কয়েকটি অপ্রচলিত শব্দের স্পর্শিত ব্যবহারই তাঁর প্রাথমিক উদ্দেশ্য যার ফলস্বরূপ তিনি একটি কবিতারচনায় ব্রতী হয়েছেন। কবিতাটির আভ্যন্তরীণ শৈথিল্য, অসংলগ্ন, অসম্বদ্ধ গঠন, যুক্তি অথবা বোধের কোনো-রকম ক্রমবিকাশ ও পারম্পর্যের অভাব পাঠকের এই সন্দেহকে সমর্থন করে। উদাহরণস্বরূপ 'জন্ম এবং পুরুষ', 'সতীদেহ', 'স্বকৃত আলেখ্য' প্রভৃতি কবিতাগুলিকে তুলে ধরা যায়।

অর্থাৎ, অতিরিক্ত কাব্যিকতা যে কবিত্ববিরোধী, এই প্রস্তাব মর্মে-মর্মে উপলব্ধি ক'রে সে-সম্পর্কে তাঁর প্রতিক্রিয়া এতটাই তীব্র হয়েছে যে, সব ক্ষেত্রে তিনিও ভারসাম্য বজায় রাখতে পারেননি। অকাব্যিক হবার অতিরিক্ত ব্যগ্রতায় কখনো-কখনো তাঁর কবিতা থেকে কাব্যের সমস্ত লক্ষণগুলি এমনভাবে তিনি নির্মূল করেছেন যে শেষপর্যন্ত যা রচিত হয়েছে তাকে কবিতা ব'লে চিহ্নিত করারও আর-কোনো উপায় থাকেনি। অথচ, এই সচেষ্ট ভঙ্গি থেকে যখনি তিনি নিজেকে মুক্ত রাখতে পেরেছেন, তখনি তাঁর স্মৃতিচারণ সার্থক অভিব্যক্তির পথ খুঁজে পেয়েছে। যা-কিছু বিবর্ণ, পুরোনো, পাংশু, ম্লান, ধূসর, ধূলিমলিন, ক্লান্তিকর, বিষণ্ণ, বিমর্ষ, দুঃখী, শোকার্ত, যন্ত্রণাকাতর এবং অন্যদিকে দুঃস্থ, ব্যাধিগ্রস্ত, কীটদষ্ট, ঘৃণ্য, গ্লানিকর, পাপী, তা-ই যেহেতু বেদনাবিদ্ধ প্রেতের মতো তাড়া ক'রে ফেরে তাঁকে ('কে পশ্চাতে বেদনার গান গাও'), যেহেতু এর থেকে উদ্ধারও তাঁর পক্ষে আর সম্ভাব্য ব'লে বোধ হয় না, সেহেতু যাবার আকাঙ্ক্ষা সত্ত্বেও ('এ মূল বনের হরিণ যাবো কোথায়, কেমন দিকে?') বার-বার

নিজের অতীতেই তাঁকে ফিরে আসতে হয় ('যেখান থেকে গিয়েছিলাম সেখানে ফিরে আসি')। তাঁর কৈশোর আর বাল্য আর শৈশব বারে-বারেই তাঁর স্মৃতিকে আক্রান্ত করে; শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কবিতায় এই প্রত্যাবর্তনের বোধ, এই ফিরে-আসা যে কি অজস্রবার উচ্চারিত তা যে-কোনো পাঠকই লক্ষ না ক'রে পারবেন না। তাঁর এই স্মৃতির জগতে সব-কিছুই ম'রে যায়, সব-কিছুই ঝ'রে যায়; ঝ'রে যায় শব্দ-গন্ধ-স্পর্শের বিচিত্র সব উপকরণ, ঝ'রে যায় ফুল, পাতা, নক্ষত্র। যা স্মৃতি, তা-ই তো মৃত; তাই মৃত্যু, আর মৃত্যুর অনিবার্য অনুষঙ্গ ধ্বংস, ক্ষয় আর বিলুপ্তির বোধেও তিনি আক্রান্ত। নিম্নোদ্ধৃত কবিতাংশটি তাঁর এই কাব্যচরিত্রের একটি দৃষ্টান্ত হিশেবে লক্ষণীয়।

> 'আমি বহুদিন হোলো ব'সে আছি। হেমন্তের ব্যাধি
> আমারে দিয়েছে মৃত পরাগের বিলীন সম্পদ।
> ক্ষয়ের অমরাবতী, শুধু ঝরা, ব্যর্থ ধ্বনিপাত—
> একান্ত মুখের স্বপ্ন, হায় চোখ প্রয়াসে নিরত
> খুঁজে পাবে কোনোদিন?'
>
> ('হেমন্তে')

স্বপ্ন আর স্মৃতির মগ্নচেতনাই যেহেতু শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কাব্যের প্রধানতম উপজীব্য, সেহেতু প্রতীকধর্মিতা তাঁর শব্দ এবং ভাষাব্যবহারের অনিবার্য চরিত্রলক্ষণ। দৃষ্টান্তস্বরূপ একটি শব্দের প্রতীকী ব্যাখ্যা বিশেষ প্রাসঙ্গিক মনে করি। তাঁর কাব্যচেতনা যে-কয়েকটি বোধ দ্বারা বিশেষভাবে আক্রান্ত তার মধ্যে সবচেয়ে অবিরলভাবে যা তাঁর কবিতায় বারে-বারে উপস্থিত হয়েছে, তা হ'লো জল। স্বপ্নদৃশ্যে জলের ভূমিকা যে সর্বদাই গর্ভের অন্তরাল অথবা জন্মাবস্থাকে সূচিত করে, এই মনস্তাত্ত্বিক সিদ্ধান্ত আজ প্রায় সর্ববাদীসম্মত একটি গৃহীত ধারণা; স্মৃতির সুড়ঙ্গ ধ'রে শেষপর্যন্ত যেখানে পশ্চাদ্‌গমন সম্ভব, তা গর্ভের অন্তরাল ভিন্ন অন্য কিছু নয়। তাই, 'জল' এই শব্দটি যে-অবচেতন ধারণার প্রতীক, শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কাব্যচেতনার সঙ্গে তা সুস্পষ্টরূপেই সম্পৃক্ত।

তাঁর ভাষায় সাধু অথবা 'বলেছিছু' ইত্যাদি পদ্যে ব্যবহৃত প্রাচীন ক্রিয়াপদের

ব্যবহার এবং বিভিন্ন শব্দের বানানে প্রাচীন রীতির প্রতি পক্ষপাত (পুরানো, ধুলা ইত্যাদি) সম্ভবত এই কারণেই যে, স্মৃতি এবং তৎসম্পর্কিত বোধের অনুজ্জ্বল প্রাচীনত্ব পরিস্ফুট করতে এই বাগ্‌ভঙ্গি বিশেষ সহায়ক। যদিও সব ক্ষেত্রেই তাঁর এই প্রয়াসের প্রয়োজনীয়তা সুস্পষ্ট নয়, (অনেক ক্ষেত্রে তিনি নিজেও মনস্থির করতে পারেননি ব'লে মনে হয়, 'পুরানো' এবং 'পুরোনো'—এই দুই বানানই তিনি সমপরিমাণে ব্যবহার করেছেন) কিন্তু কোনো-কোনো ক্ষেত্রে তাঁর প্রয়াস আমাদের কাছে তাঁর কাব্যচেতনার পরিপ্রেক্ষিতে সমর্থনযোগ্য মনে হয়েছে। প্রথমত একটি দৃষ্টান্তের উল্লেখ প্রয়োজন মনে করি।

'দেবতার গ্রাস' কবিতাটিতে 'নৃত্যে রুগ্ন ব্যথিত জানেলা খুলে দিয়ে কথা বলি' এই পংক্তিটি লক্ষণীয়। এখানে 'জানেলা' এই বানানের ব্যবহার উদ্দেশ্যহীন নয়। শব্দের দৃশ্যরূপের সঙ্গে, শব্দটি যে-বস্তুর প্রতীক, তার একটি দৃশ্যগত সম্পর্ক অনেক ক্ষেত্রেই আমাদের মানসিকতায় অনিবার্যরূপে, যদিও সর্বদা সচেতনভাবে নয়, নির্ণীত হ'য়ে থাকে। জানালা শব্দটিতে আ-কারের যে-বাহুল্য তার ফলে এই শব্দটির দৃশ্যরূপে জানালা নামক একটি উন্মুক্ত বর্গাকার ক্ষেত্রের সাদৃশ্য আরোপিত হয়, কিন্তু এক্ষেত্রে 'রুগ্ন' এবং 'ব্যথিত' এই দুটি বিশেষণে চিহ্নিত জানালাটির ভিন্ন প্রকৃতিই কবির উদ্দিষ্ট, তাই, এ-কারের প্রয়োগে এই বর্গক্ষেত্রটিকে এমনভাবে নুইয়ে দেওয়া হ'লো যা বিশেষণ দুটির যাথার্থ্যকেই অধিকতর পরিস্ফুট ক'রে তোলে।

শব্দব্যবহারে এই সচেতন প্রয়োগই যেহেতু তাঁর কবিতার অন্যতম প্রধান চরিত্রলক্ষণ সেহেতু অনুপ্রাসের অকারণ তরলতা প্রায় কখনোই তাঁর কবিতায় খুঁজে পাওয়া যায় না; বরং সারিবদ্ধ অন্ত্যমিলের নিপুণ ব্যবহারে এমন এক শ্লথ ছন্দোময়তা তিনি কখনো-কখনো রচনা করেন যা তাঁর কবিতার স্মৃতি-সন্তপ্ত বিষণ্ণ পরিমণ্ডলকেই আরো ঘনীভূত করে। 'কি নীল খোলে না দ্বার, হাতে যার অপেক্ষার বিশাল বিফল দুঃখ তার বুকে ভেসে' কিংবা, 'বাতাসে তার চমৎকার ভস্মভার মরীচিভার শূন্য নদীতটে'র মতো পংক্তি যে-দোলা পাঠকের চেতনায় সঞ্চারিত করে, তার অভিঘাত এড়ানো তাঁর পক্ষে প্রায় অসম্ভব। তাছাড়া, তাঁর অধিকাংশ কবিতাতেই শব্দ এবং বাক্যবন্ধ ঘুরে-

ঘুরে এমনভাবে পুনরাবৃত্ত হয় যে, গানের ধুয়োর মতোই পাঠকের ইন্দ্রিয়-চেতনায় ক্রিয়াশীল হ'য়ে ওঠে।

শব্দ এবং ভাষাব্যবহারে তাঁর এবম্বিধ নৈপুণ্য সত্ত্বেও, বিচ্ছিন্নভাবে শব্দ, বাক্যবন্ধ, পংক্তি অথবা অনুচ্ছেদে তাঁর কাব্যমানসের যতটা সচেতন পরিচয় পাওয়া যায়, কবিতার আভ্যন্তরীণ সংহতি তাঁর মনোযোগকে ততটা আকৃষ্ট করে না। ফলত অনেক ক্ষেত্রেই তাঁর কবিতার বিশ্লিষ্ট বিচ্ছিন্ন গঠন পাঠককে পীড়া দেয়। এ-সম্পর্কে তাঁর ঔদাসীন্য তাঁর 'উৎক্ষিপ্ত কররেখা' নামক কবিতাংশগুচ্ছই প্রমাণিত করে; নিজের ছিন্নবিচ্ছিন্ন কবিতাংশকে মুদ্রিতাকারে পাঠকের কাছে তুলে ধ'রে 'অলিখিতের দিকে নির্দেশ' করার অযৌক্তিক প্রলোভন তিনি এড়াতে পারেন না। কিন্তু আমাদের কাছে যেহেতু কোনো কবিতাংশ কাব্যদেহের অনিবার্য অংশ ব'লেই গৃহীত এবং যেহেতু ছিন্ন কবিতাংশের কোনো স্বাতন্ত্র্য নিরস্তিত্ব ব'লে বোধ হয়, সেহেতু অলিখিতের প্রতি তাঁর এই দিক-নির্দেশের অবাস্তবতা আমাদের বিস্ময়োদ্রেক করে। এমনকি, তাঁর এই কবিতাংশগুলির কিছু-কিছু যদি তিনি একত্রীভূত ক'রে একটি পূর্ণাঙ্গ কবিতা রচনার দাবি জানাতেন, তাহ'লে অনেক ক্ষেত্রেই তাঁর কবিতার যে-পারম্পর্যহীনতায় আমরা অভ্যস্ত, তার পরিপ্রেক্ষিতে এই অবিশ্বাস্যতা মেনে নেয়াও হয়তো আমাদের পক্ষে সহজতর হ'তো।

শেষ করার আগে একটি কথা সবিনয়ে নিবেদন করা প্রয়োজন মনে করি। শব্দ ও বাক্যবিন্যাসে, অন্তত ভঙ্গির দিক থেকে, শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের অনুকারকের সংখ্যা যে স্বল্প নয়, এই সত্যের উপলব্ধি হয়তো তাঁর পক্ষে বিশেষ আত্মতৃপ্তিরই সংগত কারণ হ'তে পারে, যদি-না তিনি নিজেও শেষপর্যন্ত নিজেকে অনুকরণ করার দুর্দম মোহাবেশে আবিষ্ট হ'য়ে পড়েন। তাঁর কাব্যগ্রন্থে বিবর্তনের সুস্পষ্ট লক্ষণ সত্ত্বেও এ-সন্দেহ থেকে আমরা সম্পূর্ণ মুক্ত হ'তে পারিনি যে, নিজের অনুসৃত বাগভঙ্গি ও কাব্যরীতি পুনরাবৃত্তির ফলে হয়তো ক্রমশ তাঁকে এমনি এক বদ্ধসংস্কারে আচ্ছন্ন করেছে যখন ভঙ্গির ভূমিকাই প্রবল হ'য়ে ওঠার সম্ভাবনা। যে-কবিতাগুলি তাঁর এই বদ্ধসংস্কারের স্পর্শ-রহিত উজ্জ্বল ব্যতিক্রম হিশেবে আমাদের মুগ্ধ করেছে, 'প্রতিকৃতি',

'কারনেশন', 'চতুরঙ্গ', 'অনিবার্যতা', 'সখ্য', 'পাখি', 'হেমন্তে' এই কবিতা ক'টি তার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

'হে প্রেম হে নৈঃশব্দ্য' শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কবিতা সম্পর্কে আমাদের আকর্ষণকে যে তীব্রতর করেছে, এই স্বীকৃতি জানাচ্ছি। তাঁর কবিত্বশক্তি সম্পর্কে আমাদের আস্থা নিঃসংশয় ব'লেই অতৃপ্তির উল্লেখ প্রয়োজনীয় মনে হয়েছে—হয়তো বলাও বাহুল্য মাত্র।

পরিশেষে, একটি জিজ্ঞাস্য আছে। কবিতাকে 'পদ্য' ব'লে অভিহিত করার কফি-হৌসী কায়দা কেন তাঁকে প্রলুব্ধ করে? মৌলিকতা বা অভিনবত্ব প্রদর্শনের এই শস্তা পথে তাঁর কি কখনোই প্রয়োজন হয়, যাঁর স্বাতন্ত্র্য সন্দেহাতীত?

আলোচনা

সুধীন্দ্রনাথের গদ্য

'কবিতা'-র গত সংখ্যায় শ্রী অমিয় দেবের প্রবন্ধ প'ড়ে গদ্যলেখক সুধীন্দ্রনাথের স্বাতন্ত্র্যের কোনো পরিচয় পাওয়া যায় না; অনেক সুন্দর-সুন্দর বিশেষণ এবং উপমার ফাঁকে এটুকু বোধগম্য যে তাঁর বক্তব্যের যেখানে শুরু, সেখানেই শেষ। সুধীন্দ্রনাথ 'কোবিদ অথচ পণ্ডিত নন,' তাঁর 'বুদ্ধি অনুভূতির অসহযোগে বন্ধীক গড়েনি', তাঁর 'প্রতিটি প্রবন্ধ প'ড়ে মনে হয়, বুঝি শব্দ গেঁথে-গেঁথে যুক্তি এক প্রকাণ্ড ইমারত গ'ড়ে তুলছে,' তাঁর 'গদ্যে চিন্তা কখনো পাল তুলে দিয়ে নিরুদ্দেশের পাড়ি জমায় না, কিংবা ভাব আবেগের পাখায় ভর ক'রে ভেসে বেড়ায় না,' 'তাঁর রচনাবলী হয়তো সর্বত্র অন্তরঙ্গ সুরে বাজেনি, কিন্তু যুক্তি ও চিন্তার তালে-তালে নেচে উঠেছে' ইত্যাদি লাইন যে-কোনো সার্থক এবং চিন্তাশীল লেখকের ক্ষেত্রে প্রয়োজ্য। কথার কথা, ধরুন, কোনো সমালোচক যদি উক্ত মন্তব্যগুলি রামেন্দ্রসুন্দর সম্পর্কে প্রয়োগ করেন, তবে কি তা মেনানান হবে? আসলে এ-জাতীয় প্রবন্ধে পাঠকের প্রত্যাশা থাকে লেখকের ঐতিহাসিক গুরুত্ব এবং সাহিত্যিক কৃতিত্ব নিরূপণ। কিন্তু সে-আলোচনায় শ্রী অমিয় দেব প্রচলিত জনশ্রুতিরই পুনরাবৃত্তি করেছেন। সুধীন্দ্রনাথের গদ্যে তৎসম শব্দের বাহুল্য নিশ্চয়ই আছে, কিন্তু সেটাই কি তাঁর একমাত্র কৃতিত্ব? শ্রী অমিয় দেব মনে করেন, 'আশ্চর্য সংযম তাঁর শব্দপ্রয়োগে। প্রায়শই তিনি পাঁচটি দেশী শব্দের পরিবর্তে একটি তৎসম শব্দে কাজ চালাতেন।' পাঁচটি দেশী শব্দের পরিবর্তে যদি একটি তৎসম শব্দে কাজ চালানো যেতো, তাহ'লে অনেকেই করতেন। আসলে এ-জাতীয় তুলনামূলক আলোচনা সম্ভবই নয়। তৎসম হ'লো বাংলা শব্দভাণ্ডারের মৌলিক পর্যায়ের, আর দেশী শব্দগুলি হ'লো আগন্তুক বা গৃহীত। অধিকাংশ তৎসম শব্দের কোনো 'দেশী' প্রতিশব্দই নেই, পাঁচটার পরিবর্তে একটা ব্যবহারের প্রশ্নই ওঠে না। গেলাশ, বাসন, আলপিন প্রভৃতি কয়েকটি 'বিদেশী' শব্দের মতো ভাব, ডিঙি, ঢোল, ঢিল ইত্যাদি আর্যেতর ভাষার কয়েকটি শব্দ বাংলায় গৃহীত হয়েছে—তাকেই বলে দেশী

শব্দ। শ্রী অমিয় দেব অন্যত্র বলেছেন, 'সন্ধি এবং সমাস তাঁর শব্দাবলীতে যে ঘনসংবদ্ধ ব্যূহ রচনা করেছে, তার তুলনা বাংলা গদ্যসাহিত্যে বিরল।' যে-সব সাহিত্যিকের রচনায় সুধীন্দ্রনাথের অনুরূপ তৎসম শব্দের বাহুল্য রয়েছে, তাঁদের সবারই সন্ধি এবং সমাসের আনুগত্য অসাধারণ। অমিয় বাবু যদি ব্যতিক্রমের দৃষ্টান্ত দেখাতে পারেন তবে খুশি হবো। কিছু পরেই তিনি আবার বলেছেন, 'কেবল যে তাঁর শব্দভাণ্ডার তৎসমপ্রধান তা-ই নয়, অর্থপ্রবাহেও তৎসমমুখী।' মানে কি? তিনি কি বলতে চান যে সুধীন্দ্রনাথের পূর্বসূরিরা তৎসম শব্দের অপপ্রয়োগ করেছিলেন?

সুধীন্দ্রনাথের গদ্যের বৈশিষ্ট্য তাহ'লে কি? এ-আলোচনার পূর্বে বীরবলী স্টাইলের সঙ্গে তাঁর পার্থক্য-নির্দেশ প্রয়োজনীয়। আমরা সবাই জানি বাংলা চলিত ভাষাকে সাহিত্য-মর্যাদা দিলেন প্রমথ চৌধুরী। সাধু-চলিত-ভাষার প্রধান পার্থক্য ক্রিয়াপদ এবং সর্বনামের; সুধীন্দ্রনাথ চলিত ভাষার উক্ত লক্ষণগুলি মেনে নিলেও একটি ব্যাপারে প্রমথ চৌধুরীর চেয়ে এগিয়ে গেছেন। 'যৌগিক ক্রিয়ার' পৌনঃপুনিকতা যে বাংলা গদ্যের দৌর্বল্যের অন্যতম কারণ এ-কথা প্রমথ চৌধুরীও বুঝেছিলেন। 'করিয়াছে,' 'খাইয়াছে' ইত্যাদি দ্বারা বাক্যের সমাপ্তি শুধু শ্রুতিকটুও নয়, শিথিলও। কিন্তু প্রমথ চৌধুরী এ-বিষয়ে সচেতন হ'য়েও অন্য উপায় আবিষ্কারে সফল হননি। সেজন্য যৌগিক ও সমাপিকা ক্রিয়ায় বাক্যান্ত তাঁর বহু রচনায় সুলভ। একটা দৃষ্টান্ত দেয়া যেতে পারে: 'ভাষামাত্রেরই তার আকৃতি ও গঠনের মতো একটা বিশিষ্ট প্রকৃতি আছে, এবং প্রকৃতিস্থ থাকার উপরই তার শক্তি এবং সৌন্দর্য নির্ভর করে। বঙ্গভাষার সেই প্রকৃতির বিশেষ জ্ঞানের অভাব বশতই আমরা সে-ভাষাকে সংস্কৃত করতে গিয়ে বিকৃত করে ফেলি। তাছাড়া প্রতি ভাষারই একটি স্বতন্ত্র সুর আছে। এমন অনেক সংস্কৃত শব্দ আছে যা বাংলার সুরে মেলে না এবং শোনবামাত্র কানে খট্ ক'রে লাগে (বঙ্গভাষা বনাম বাবু-বাংলা ওরফে সাধুভাষা)।'

সুধীন্দ্রনাথ বাংলা গদ্যের এই সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে গোড়া থেকেই সাবধান হয়েছিলেন। তাঁর গদ্যে ক্রিয়াপদের নিপুণ প্রয়োগ বিশেষভাবে লক্ষণীয়। তিনি বিশেষণ, বিশেষ্য, ক্রিয়াবিশেষণ ইত্যাদি পদপ্রকরণকে বাক্যের শেষে

ভাষায় বলা যেতে পারে, '(প্রমথ) চৌধুরী মহাশয় শ্রমলাঘবের লোভেই ক্বচিৎ-কদাচিৎ বিদেশী বাক্যের শরণ নেন বটে, তবু বাঙলার বাচনিক পদ্ধতিতে যে-বিষয়ের আলোচনা অসম্ভব, তার প্রতি সাধারণত তিনি বিমুখ। সুতরাং তাঁর প্রসাদগুণ বিকলনের উপরে প্রতিষ্ঠিত; এবং বাঙালীর কান বাদী-বিবাদীর ঐকতানে অনভ্যস্ত ব'লে তিনি সাধ্যপক্ষে অনেকান্ত ভাবনা এড়িয়ে চলেন। ফলে তাঁর উক্তি সর্বদাই ক্ষুরধার, কিন্তু সর্বত্র সুসংবদ্ধ নয়।' সুধীন্দ্রনাথের গদ্যের প্রাকরণিক বৈশিষ্ট্য ছাড়া আমার মনে হয় তাঁর সম্পর্কে এ-জাতীয় আলোচনা অসম্পূর্ণ।

সুধীন্দ্রনাথের গদ্য সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনার সুযোগ এখানে নেই। তাঁর গদ্যের অনুকারক স্বভাবতই স্বল্প হ'লেও অনুরাগীর সংখ্যা কম নয়। সেজন্য আশা করা যায় ভবিষ্যতে সুধীন্দ্রনাথের গদ্য বিষয়ে আরো পূর্ণাঙ্গ আলোচনা প্রকাশিত হবে।

সুবীর রায়চৌধুরী

কবিতাভবন, ২।২ রাসবিহারী এভিনিউ, কলকাতা ২৯ থেকে প্রকাশিত ও নাভানা প্রিন্টিং ওআর্কস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪৭ গণেশচন্দ্র এভিনিউ, কলকাতা ১৩ থেকে মুদ্রিত।
সম্পাদক, প্রকাশক ও মুদ্রক : বুদ্ধদেব বসু

KAVITA, Vol. 25, No. 3. Serial No. 104
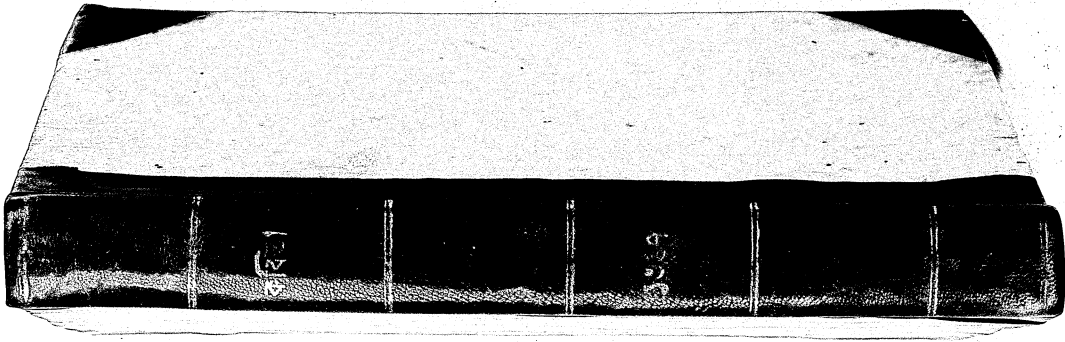
R. N. 5167/57